THE FIRSTHAND ACCOUNT OF THE MISSION THAT KILLED OSAMA BIN LADEN

নেভি সীলের আত্মকথা

NO EASY DAY

THE AUTOBIOGRAPHY OF A NAVY SEAL

মার্ক ওয়েন

ও

কেভিন মোরার-এর

সাম্প্রতিক সময়ের আলোচিত বই

নো ইজি ডে

অনুবাদ: মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন
রবিন জামান খান

বর্তমান সময়ে সবচাইতে আলোচিত একটি বই নো ইজি ডে। সাবেক নেভি সিল কমান্ডো ম্যাট বিসোনেট (এই বইয়ের জন্য মার্ক ওয়েন ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন) সরাসরি অংশ নিয়েছেলেন ওসামা বিন লাদেনের কিলিং মিশনে। সেই অভিযানের একমাত্র নির্ভরযোগ্য বর্ণনার পাশাপাশি এই বইতে উঠে এসেছে আমেরিকান স্পেশাল ফোর্সের অভ্যন্তরের বিশদ চিত্র আর অসংখ্য মিলিটারি অপারেশনের নিখুঁত বিবরণ, সেই সাথে বিন লাদেনকে খুঁজে বের করার সত্যিকারের গল্প। পাঠক মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে এর আস্বাদ নেবেন।

"বিন লাদেনের কিলিং মিশনই নো ইজি ডে বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য কিন্তু লেখক যেভাবে এর কাহিনী এগিয়ে নিয়ে গেছেন সেটা অনেক বেশি মনোমুগ্ধকর...আগের সব ঘটনাকে ভুল প্রমাণ করে দিয়ে লাদেন অভিযানের সত্যিকারের বর্ণনা পাওয়া যাবে এই বইতে...নিঃসন্দেহে উপভোগ করার মতো একটি বই"

-নিউইয়র্ক টাইমস

অ্যাবোটাবাদের ঐতিহাসিক অভিযানের টান উন উত্তেজনার একটি বই . . . পাঠক থ্রিলার উপন্যাস পড়ার স্বাদ পাবে... কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি একটি সত্যি ঘটনারই সহজ সরল প্রকাশ"

- এন্টারটেইনমেন্ট উইকলি

"শ্বাসরুদ্ধকর অভিযানের একটি বই... যদি মনে করে থাকেন এটি কেবল বিন লাদেন অভিযানের উপর লেখা তাহলে ভুল করবেন . . .

-অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস

"বইটি না পড়ে ভুল করবেন না: এটি একটি ঐতিহাসিক দলিল। মার্ক বাউডেনের ব্ল্যাকহক ডাউন-এর পর এরকম বই আর প্রকাশিত হয় নি

- লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস

"সাহসী, বুদ্ধিদীপ্ত এবং মিলিটারি ইতিহাসে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটি বই"

-পিপল ম্যাগাজিন

সাবলীল গতি আর সত্যিকারের ওয়ারফেয়ারের তথ্যসমৃদ্ধ একটি বই মার্ক ওয়েন আর কেভিন মোরার প্রশংসার দাবি রাখে"

—ওয়াশিংটন পোস্ট

"যারা ওসামা বিন লাদেনের হত্যা মিশন সম্পর্কে জানতে বইটি পড়বেন তাদের জন্য বাড়তি কিছু রয়েছে এই বইটিতে অসংখ্য মিলিটারি অপারেশন আর ট্রেনিংয়ের ডিটেইল সমৃদ্ধ....

-মার্ক বাউডেন
ব্ল্যাকহক ডাউন বইয়ের লেখক

মার্ক ওয়েন
কেভিন মোরার-এর

নো ইজি ডে

অনুবাদ
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন
রবিন জামান খান

বাতিঘর প্রকাশনী

নো ইজি ডে
মূল :© মার্ক ওয়েন এবং কেভিন মোরার

অনুবাদ:
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন
রবিন জামান খান

No Easy Day
The Autobiography of a Navy SEAL
The Firsthand Account of the Mission that Killed Osama bin Laden (2012)
Author: Mark Owen and Kevin Maurer

প্রচ্ছদ: দিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত;
মুদ্রণ প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০,
গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; কম্পোজ : অনুবাদক একুশে

মূল্য দুইশত বিশ টাকা মাত্র

সূচী

লেখকের কথা

আমি যখন জুনিয়র হাইস্কুলে পড়ি, আমাদেরকে স্কুল থেকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হয়। নিজের পছন্দমতো একটা বই ঠিক করতে হবে। আমি যে বইটা ঠিক করেছিলাম তার নাম ছিলো 'ম্যান ইন গ্রিন ফেসেস' লেখক একজন প্রাক্তন নেভি সিল জিনি ওয়েন্টেজ। বইটা লেখা হয়েছিলো ভিয়েটনামের মেকঙ ডেল্টা বে'তে চালানো একটি অপারেশন নিয়ে। বইটার পরতে পরতে অ্যাকশান, গোলাগুলি আর ভরপুর উত্তেজনা। বইটার প্রথম পাতা পড়ে আমি ঠিক করেছিলাম, একদিন আমিও সিল হবো। বইটা যতো পড়তে থাকি আমার ইচ্ছো ততো দৃঢ় হতে থাকে।

প্যাসিফিক ওশান সার্ভে ট্রেনিং করার সময়ে আমি ওখানে আমার মতোই আরেকজন মানুষের দেখা পাই, যে কিনা সেরাদের সেরা হবার জন্যে পরীক্ষার প্রতিটি ধাপ পেরিয়ে আজ এইপর্যন্ত এসেছে। এইসব মানুষদের মাঝে ট্রেনিং করে, এদের সাথে থেকে প্রতিদিন আমি নিজেকে একটু একটু করে আরো উন্নত একজন মানুষে পরিণত করেছি।

এই বইতে আমি তুলে ধরেছি আমার সেই সব দিনগুলো। বইটা আমার জীবনেরই প্রতিচ্ছিবি। এখানে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি একজন নেভি সিলের জীবন, তার সিল হয়ে ওঠার পেছনের প্রতিটি ধাপ এবং তার জীবনের চরম সত্য। আমরা কেউই সুপারহিরো নই, কিন্তু আমরা নিজেদেরকে কঠিন থেকে কঠিন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রস্তুত করেছি - এক কঠিনতম জীবনের দিকে ধাবিত হবার জন্যে, যেখানে আজ আমরা সবাই হাতে হাত ধরে একসাথে পথ চলি।

এই বইয়ের কাহিনী এরকমই একদল সাহসী এবং অসাধারণ মানুষের, যাদের অংশ হয়ে ছিলাম সেই ১৯৯৮ সাল থেকে এই ২০১২ পর্যন্ত। এই বইতে আমি আমার নিজের নামসহ প্রতিটি মানুষের নাম বদলে দিয়েছি যাতে আমাদের কারোর আসল পরিচয় ফাঁস হবার মাধ্যমে কাউকে বিপদে পড়তে না হয়। সেইসাথে আমি প্রাণপন চেষ্টা করেছি ফোর্সের বা অন্য যেকোনো কৌশল থেকে শুরু করে গোপন কিছু যেনো সহজে ফাঁস না হয়। আপনি যদি গোপন কিছু জানতে চান আমি বলবো এই বই আপনার জন্যে নয়।

গোপন এবং ক্লাসিফায়েড কিছু যাতে ফাঁস না হয় সেজন্যে আমি আমার প্রকাশকের সহায়তায়, একজন অ্যাটর্নিকে এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি পড়িয়ে নিশ্চিত করেছি, এখানে আমেরিকা বা অন্য কারোর জন্যে ক্ষতিকর কোনো তথ্য ফাঁস হচ্ছে না। আমার বিশ্বাস এই বইতে আমেরিকা এবং আমার সকল টিমমেটদের নিরাপত্তার স্বার্থ বজায় রাখা হয়েছে।

এই বইতে সেনাবাহিনীর কয়েকজন হাই অফিসিয়ালের সত্যিকার নাম ব্যবহার করেছি, এর কারণ তারা প্রত্যেকেই পাবলিকলি পরিচিত, মানে জনগন জানে তারা কে কোন্ পোস্টে আছেন। তাই তাদের সত্যিকার নাম ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া বাকি সবার ক্ষেত্রে আশ্রয় নেয়া হয়েছে ছদ্মনাম বা অন্য পরিচয়ের। এই বইতে এমন কোনো টেকনোলজির কথা বলা হয় নি যাতে করে সরকারের গোপন কোনো প্রযুক্তি সবার সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। কোনো ঘটনার বর্ণনা এমনভাবে দেয়া হয় নি, যে কারণে এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো গোপন ব্যাপার বেরিয়ে আসে এবং কারো ক্ষতি হয়।

নো ইজি ডে'তে বর্ণিত সমস্ত ঘটনাবলি আমার নিজের স্মৃতি থেকে নেওয়া। সমস্ত সংলাপগুলো পুণরায় মনে করে ঠিক করা হয়েছে, ক্ষেত্র বিশেষে আমি আমার সহকর্মীদের সাহায্য নিয়েছি। যুদ্ধের সময়টা থাকে অত্যন্ত অস্থির, কিন্তু তারপরও চেষ্টা করা হয়েছে যাতে সবকিছু যথাসম্ভব ঠিক রাখা যায়। এই বইতে বর্ণিত বিভিন্ন মতামত সম্পূর্ন আমার নিজস্ব, কোনোভাবেই আমেরিকা বা নেভি সিলদের মতামত নয়।

আমি এই বইয়ের জন্যে জাতীয় নিরাপত্তাকে সম্পূর্ন মাথায় রেখে, আমার টিমমেটদের কারো কোনো ক্ষতি না করে, সমস্ত ঘটনা সুন্দর করে বর্ণনা করার এবং আমাদের ভেতরকার সুন্দর সম্পর্ক, মিশনে আমাদের চেষ্টা এবং ত্যাগকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। তবুও আমি জানি এই বই প্রকাশ হলে অনেকেই আমাকে পছন্দ করবে না।

সত্যিকার অর্থে নো ইজি ডে আসলে আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন কমান্ডো অভিযানের সত্যিকারের বয়ান যা জানার অধিকার আমেরিকাসহ সারাবিশ্বের নাগরিকদের রয়েছে, তাই আমার এই প্রচেষ্টা। এই মিশনটাকে সফল করার পেছনে ছিলো আমাদের সবার সমান অংশগ্রহণ। টিমলিডার থেকে শুরু করে চিফ ক্রু পাইলট এবং প্রতিটি টিমমেট, সবার সমান চেষ্টার ফলেই সম্ভব হয়েছিলো এই সফল অপারেশনটি।

আমি আশা করবো হয়তো কোনো একদিন হাইস্কুলের কোনো ছাত্র এই বই পড়ে একজন সিল হবার ইচ্ছে প্রকাশ করবে এবং সাহসিকতায় পরিপূর্ণ সততা এবং নিষ্ঠার একটি জীবন বেছে নেবে। যদি কোনোদিন সেটা সম্ভব হয় তবেই আমি ভাববো আমার এই প্রচেষ্টা সফল হয়েছে।

মার্ক ওয়েন (আসল নাম ম্যাট বিসোনেট)
সাবেক নেভি সিল কমান্ডো জুন ২২, ২০১২,
ভার্জিনিয়া বিচ,
ভার্জিনিয়া

আবেদন

নুক্, কিন্ডেল, কোবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে, পিডিএফ-এ বেশীরভাগ সময় খাকে না।) ইত্যাদি প্রথমদিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।।

ভি-ফ্ল্যাটের(২০২৩ এর আগের ভার্সানে দৈনিক ১০০ পাতা OCR করতে দেয়) সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

‘গতকালকের দিনটিই ছিলো সহজতম দিন।‘

-নেভি সিলদের দর্শন

ভ্রাতৃসংঘ দীর্ঘজীবি হোক

চক-ওয়ান

নীচে নামার সময় হয়েছে। ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টারের চিফ দরজাটা খুলে দিলেন।

আমি তার চোখ দেখতে পেলাম না-তার চোখ দুটো ঢেকে আছে নাইটভিশন গগলসে - একটা আঙুল তুলে ধরলাম। চেয়ে দেখলাম আমার নেভি সিল দলের বন্ধুরা শান্তভাবে একে একে এগিয়ে আসছে।

পুরো কেবিনটা জুড়ে এঞ্জিনের শব্দ। এ অবস্থায় ব্ল্যাকহকের রোটরের আওয়াজ ছাড়া অন্য কিছু শোনা প্রায় অসম্ভব। একটু ঝুঁকে নীচের ভূভাগের দিকে তাকিয়ে অ্যাবোটাবাদ নামক এলাকাটি দেখার চেষ্টা করতেই প্রবল বাতাস আমাকে ধাক্কা দিতে লাগলো।

দেড় ঘণ্টা আগে পূর্ণিমা রাতে দুটো এমএইচ-৬০ ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টারে আমাদেরকে তোলা হয়। আফগানিস্তানের জালালাবাদ থেকে পাকিস্তানের সীমান্তে সংক্ষিপ্ত একটি ভ্রমণের পর সেখান থেকে আমাদের টার্গেট এলাকায় আসতে আরো এক ঘণ্টা সময় লেগেছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে এই টার্গেট এলাকাটির স্যাটেলাইট ইমেজ স্টাডি করা হয়েছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে।

ককপিটের মৃদু আলোর বাল্ব ছাড়া পুরো কেবিনটা ঘন অন্ধকারে ডুবে আছে। বাম দিকের দরজার কাছে সঙ্কীর্ণ জায়গায় বসে ছিলাম এতোক্ষণ। ওজন কমানোর জন্য হেলিকপ্টারের ভেতরের সবগুলো সিট খুলে ফেলা হয়েছে। সুতরাং আমাদের বেশিরভাগ সদস্য মেঝেতে বসেছে। অবশ্য গন্তব্যে যাবার আগে স্থানীয় খেলার সামগ্রীর দোকান থেকে কেনা ছোটো ছোটো কিছু ক্যাম্প চেয়ারেও বসেছে বেশ কয়েকজন।

এখন কেবিনের শেষ মাথায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আড়ষ্ট হাত-পা ছুড়ে নিলাম স্বাভাবিকভাবে রক্ত চলাচল করার জন্য। হাতে-পায়ে ঝিমঝিম ধরে গেছে। আমাদের দুটো হেলিকপ্টারে নেভাল স্পেশাল ওয়ারফেয়ার ডেভেলপমেন্ট গ্রুপের মোট তেইশজন সদস্য রয়েছে। যাকে সংক্ষেপে ডেভগ্রু (DEVGRU) বলে ডাকা হয়। এইসব লোকজনের সাথে এর আগে আমি কয়েক ডজন অপারেশনে অংশ নিয়েছি। এদের অনেককে আমি দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে চিনি। প্রত্যেকের উপরেই আমার পুরোপুরি আস্থা রয়েছে।

পাঁচ মিনিট আগে পুরো কেবিনটা যেনো প্রাণ ফিরে পেয়েছিলো। নিজেদের হেলমেট মাথায় দিয়ে রেডিও আর অস্ত্রগুলো শেষবারের মতো চেক করে নিয়েছি। আমরা বহন করছি ষাট পাউন্ডের মতো জিনিস। এর প্রতিটি পরিমাণ নির্দিষ্ট কাজের জন্য হিসেব করে দেয়া হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় কোনো কিছু বহন করছি না। এরকম জিনিস নিয়ে একই ধরণের বহু অপারেশনে অংশ নিয়েছি বিগত বছরগুলোতে।

এই টিমের প্রতিটি সদস্যকে অনেক বিচার বিশ্লেষণ করে বেছে নেয়া হয়েছে। আমাদের স্কোয়াড্রনে এরাই হলো সবচাইতে অভিজ্ঞ সেনা। আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে থেকেই আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। আমরা আমাদের অস্ত্রশস্ত্র আর গিয়ারগুলো বার বার পরীক্ষা করে দেখেছি। আজকের রাতের জন্য আমরা বেশ ভালোমতোই প্রস্তুত ছিলাম।

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের পর থেকেই এই মিশনের স্বপ্ন দেখেছি। তখন আমি ওকিনাওয়ার ব্যারাকে ছিলাম। টিভিতে সেই ভয়াবহ দৃশ্য অন্য অনেকের মতো আমিও প্রত্যক্ষ করেছি। ট্রেনিং থেকে ফিরে এসে মাত্র টিভি রুমে বসেছি, তখনই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে দ্বিতীয় বিমান হামলাটি সংঘটিত হয়। ভবনের অন্য দিক দিয়ে আগুনের গোলা বের হয়ে যাবার দৃশ্যটি দেখার সময় চোখের পলক ফেলতে পারি নি।

কোটি কোটি আমেরিকানের মতো আমিও অবিশ্বাস্য সেই দৃশ্য দেখেছি। নিজেকে তখন বড্ড অসহায় মনে হয়েছিলো। গুলিয়ে উঠেছিলো আমার পেট। ঐ দিনের বাকি সময়টুকু আমি টিভির থেকে সরি নি। কিভাবে এরকম একটি ঘটনা ঘটলো সেটা ভেবে পাইনি তখন। একটা প্লেন ক্র্যাশ দুর্ঘটনা হিসেবে মেনে নেয়া যায়, কিন্তু দ্বিতীয় প্লেনটা আঘাত হানার পর

বুঝতে বাকি রইলো না এটা সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণ। এটা কোনোভাবেই দুর্ঘটনা হতে পারে না।

সেপ্টেম্বরের সেই সময়টাতে আমি কেবলমাত্র সিল-এ যোগ দিয়েছি।

এ ঘটনায় ওসামা বিন লাদেন জড়িত আছে জানার পর পরই মনে করেছিলাম কালবিলম্ব না করে আমাদের ইউনিটকে আফগানিস্তানে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হবে।

বিগত দেড় বছর ধরে আমাদেরকে এই অপারেশনের জন্য ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। বিগত কয়েক মাস ধরে থাইল্যান্ড, ফিলিপিনস, পূর্ব তিমুর আর অস্ট্রেলিয়ায় ট্রেনিং দেয়া হয়। সেপ্টেম্বরের ঐ আক্রমণটি দেখার পর থেকেই ওকিনাওয়া থেকে আফগানিস্তানে গিয়ে আল-কায়েদার ফাইটারদের নির্মূল করে দেশের হয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্য উদগ্রীব ছিলাম।

কিন্তু আমাদেরকে ডাকা হয় নি।

খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। অবশ্য তখনও ভালোমতো প্রশিক্ষিত একজন সিল হতে পারি নি, কেবল টিভি'তে যুদ্ধ দেখা ছাড়া বাস্তব অভিজ্ঞতা বলতে তেমন কিছু ছিলো না। বন্ধুবান্ধব আর পরিবারের কাছে নিজের এই হতাশা প্রকাশ করি নি কখনও। তারা আমার কাছে চিঠি লিখে জানতে চাইতো আমাকে আফগানিস্তানে পাঠানো হবে কিনা। তারা মনে করতো আমি একজন সিল, সুতরাং খুব দ্রুতই আমাদেরকে আফগানিস্তানে পাঠানো হবে।

আমার মনে আছে, আমি আমার প্রেমিকার কাছে ই-মেইল করে বাজে পরিস্থিতিটাকে হালকা করার চেষ্টা করেছিলাম। এই ডিপ্লয়েমেন্টটা কবে শেষ হবে, কবে বাড়ি ফিরে আসবো এসব নিয়ে পরিকল্পনা করেছিলাম আমরা।

"আর মাত্র এক মাস বাকি," লিখেছিলাম তাকে। "বিন লাদেনকে হত্যা করে খুব জলদি দেশে ফিরে আসবো।" সেই সময় এটা কোনো ঠাট্টার মতোই ছিলো। অনেকেই এ কথা বলতো।

এখন ব্ল্যাকহক দুটো যখন টার্গেটের দিকে ছুটে যাচ্ছে তখন আমি বিগত দশ বছরের কথা মনে করলাম। ১১ই সেপ্টেম্বরের আক্রমণের পর থেকে আমার মতো সৈনিকেরা এরকম একটি মিশনে অংশ নেবার স্বপ্ন দেখে আসছিলো। আমরা যাদের সাথে লড়াই করছি আল-কায়েদার এই নেতা তাদের সবাইকে মদদ দিয়ে আসছে। তাদের জন্য এই লোক অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করছে। প্লেন হাইজ্যাক করে শত শত নিরীহ বেসামরিক লোকজনকে হত্যা করার জন্য প্রেরণা যুগিয়েছে সে। এরকম উগ্রতাবাদী খুবই ভয়ানক। টাওয়ার দুটো ধূলিসাৎ হবার পর পরই ওয়াশিংটন ডিসি আর পেনসিলভানিয়ায় আক্রমণ হবার খবর পাই। আমি তখনই বুঝে গেছিলাম, আমরা না চাইলেও একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লাম। এই যুদ্ধে বিগত বছরগুলোতে আমাদের অসংখ্য সাহসী যোদ্ধা প্রাণ হারিয়েছে। কখনও জানতাম না এরকম একটি মিশনে অংশ নিতে পারবো।

ঐ ঘটনার প্রায় এক দশক পর, আট বছর ধরে আল-কায়েদার নেতাদের পিছু ধাওয়া করে অবশেষে আমরা বিন লাদেনের কম্পাউন্ড থেকে মাত্র কয়েক মিনিট দূরত্বে আছি।

ব্ল্যাকহকের ফিউজলেজের সাথে আটকানো দড়িটা ধরার পর টের পেলাম আমার হাতে-পায়ে স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালন শুরু হয়েছে। আমার ঠিক সামনে এক স্নাইপার এক পা হেলিকপ্টারের বাইরে আর অন্য পা ভেতরে রেখে দিয়েছে। তার অস্ত্রের নল খুঁজে বেড়াচ্ছে নীচের কম্পাউন্ডে থাকা টার্গেট। তার দায়িত্ব হলো, অ্যাসল্ট টিম দড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলে কম্পাউন্ডের দক্ষিণ দিকটা কভার দেয়া।

একদিন আগেও আমরা বিশ্বাস করি নি ওয়াশিংটন এই মিশনের অনুমতি দেবে। কিন্তু এখন আমরা কম্পাউন্ড থেকে মাত্র এক মিনিট ব্যবধানে রয়েছি। গোয়েন্দা রিপোর্ট বলছে, আমাদের টার্গেট এই কম্পাউন্ডেই আছে। আমিও তাই মনে করি, তবে যা-ই ঘটুক না কেন আমি অবাক হবো না। এর আগে বেশ কয়েকবার আমরা তার নাগালের খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম।

একটা গুজবের উপর ভিত্তি করে ২০০৭ সালে এক সপ্তাহ ধরে বিন লাদেনকে খুঁজে

গেছি। আমাদের কাছে রিপোর্ট ছিলো আফগানিস্তান থেকে চূড়ান্ত একটি হামলার জন্য সে পাকিস্তানে আসছে। সে নাকি তাকে পাহাড়ি এলাকায় সাদা আলখেলা ক সোর্স বলেছিলো পরা অবস্থায় দেখেছে। কয়েক সপ্তাহের প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত পণ্ডশ্রম হিসেবে পরিগণিত হয়।

অবশ্য এবার অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছে আমার। এই মিশনের জন্য বের হবার আগে বিন লাদেনের অ্যাবোটাবাদের অবস্থান চিহ্নিত করার কাজে নিয়োজিত সিআইএ'র এক অ্যানালিস্ট জোর দিয়ে বলেছিলেন লাদেন এখানেই আছে। আমিও আশা করি ঐ ভদ্রমহিলা সত্যি বলেছেন। তবে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা বলছিলো, মিশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছুই বলা যায় না।

এখন অবশ্য তাতেও কিছু যায় আসে না। ঐ বাড়ি থেকে আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড দূরে আছি আমরা। ওখানে যে-ই থেকে থাকুক আজ রাতটা তার জন্য ভয়ঙ্কর কিছু হবে।

এর আগেও আমরা এরকম অসংখ্য মিশন সম্পন্ন করেছি। বিগত দশ বছরে আমি ইরাক, আফগানিস্তান আর আফ্রিকার সোমালিয়ায় ডিপ্লয়েড হয়েছি। ২০০৯ সালে তিনজন সোমালিয়ান জলদস্যু মায়েস্র্ক অ্যালাবামা নামের যে কন্টেইনার শিপ ছিনতাই করেছিলো সেটার ক্যাপ্টেন রিচার্ড ফিলিপকে উদ্ধার করার মিশনে আমি অংশ নিয়েছিলাম। তাছাড়া পাকিস্তানের মাটিতে এর আগেও অপারেশন করেছি। ট্যাক্টিক্যালি আর সব অপারেশনের চেয়ে আজকের এই মিশনটা খুব একটা ভিন্ন কিছু নয়, তবে আমি জানতাম ঐতিহাসিকভাবে এটা হবে খুবই তাৎপর্যময়।

দড়িটা ধরার সাথে সাথে এক ধরণের প্রশান্তি বয়ে গেলো আমার মধ্যে। এই মিশনের সবাই এরকম অপারেশনে অংশ নিয়েছে, সেদিক থেকে দেখলে তাদের কাছে আজকের মিশনটা তেমন আলাদা কিছু নয়। হেলিকপ্টারের দরজায় দাঁড়িয়ে নীচের যে ভূ-ভাগটি দেখতে পেলাম সেটা আমাদের ট্রেনিংয়ের সময় দেখা স্যাটেলাইট ইমেজের মতোই। আমার সঙ্গী ওয়াল্ট হেলিকপ্টারের সাথে আমার শরীরে একটা ক্লিপ আটকে দিলো পেছন থেকে। সবাই আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে নীচে নামার জন্য। ডান দিকে, আমার টিমের কিছু সদস্য পেছনে থাকা দ্বিতীয় হেলিকপ্টার 'চক টু' কে দেখতে পাচ্ছে ভালোমতো। ওটা এখন ল্যান্ড করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

দক্ষিণ-পূর্ব দিকের দেয়ালটা ক্লিয়ার করার পর আমাদের হেলিকপ্টার উড়ে গেলো কম্পাউন্ডের যেখানটায় আমরা নামব সেখানে। ত্রিশ ফিট নীচে কম্পাউন্ডের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম ভবনের ছাদে জামাকাপড় শুকাতে দেয়া হয়েছে। হেলিকপ্টারের রোটরের বাতাসে সেইসব কাপড় আর ধূলোবালি উড়ছে। পুরো আঙিনায় ময়লা-আবর্জনা উড়ে বেড়াতে লাগলো। গরু-ছাগল ভয়ে এদিক ওদিক ছোটার চেষ্টা করছে।

নীচের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম আমরা এখনও গেস্টহাউসের উপরে আছি। হেলিকপ্টারটি দুলে উঠলে বুঝতে পারলাম পাইলট হেলিকপ্টারটি পজিশনে রাখতে বেগ পাচ্ছে। গেস্টহাউস আর কম্পাউন্ডের সীমানা প্রাচীরের মাঝখানে আমরা দুলছি। ক্রু চিফের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সে মাইক্রোফোনে পাইলটকে ডিরেকশন দিচ্ছে।

হেলিকপ্টারটি এপাশ ওপাশ কাত হয়ে যাচ্ছে। শূন্যে ভেসে থাকার চেষ্টা করছে সেটা। কিন্তু পর্যাপ্ত বাতাস পাচ্ছে না। এই দুলুনিটা খুব একটা তীব্র না হলেও আমি জানি এটা পরিকল্পনার অংশ নয়। হেলিকপ্টারের পাইলট নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। এই মিশনের পাইলটরা এরকম অসংখ্য মিশনে অংশ নিয়েছে। কোনো ভবনের উপর নিজের হেলিকপ্টার ভাসিয়ে রাখতে তারা যথেষ্ট দক্ষ।

নীচের কম্পাউন্ডের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো এই কপ্টার থেকে দড়ি বেয়ে নেমে যাওয়াই ভালো হবে। জানি এটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ কিন্তু নীচে নামাটা আমাদের জন্য অবধারিত। হেলিকপ্টারের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে আমি কিছুই করতে পারবো না। দড়ি বেয়ে নীচে নেমে যাওয়াটাই বরং ভালো। কিন্তু গ্রাউন্ডটা নিরাপদ কিনা সেটা না বুঝে এ কাজ করা ঠিক হবে না।

তাছাড়া যেখানে নামবো সেই জায়গাটাও নামার উপযোগী হতে হবে। সেরকম জায়গা দেখতে পাচ্ছি না।

"আমরা ঘুরে আসছি, একটু ঘুরে আসছি," শুনতে পেলাম রেডিওতে বলা হচ্ছে। তার মানে আমাদের আসল পরিকল্পনায় যেভাবে দ্রুত দড়ি ফেলে নেমে যাবার কথা ছিলো সেটা আর সম্ভব হচ্ছে না। আমাদেরকে দক্ষিণ দিক দিয়ে ঘুরে এসে দেয়ালের বাইরে নামতে হবে। এতে করে আক্রমণ করার সময় আরেকটু প্রলম্বিত হবে, ভেতরে যারা আছে তারা হাতে অস্ত্র তুলে নেবার মতো সময় পেয়ে যাবে।

আমার মন ভেঙে গেলো।

একটু আগেও আমি ভেবেছিলাম সব কিছুই পরিকল্পনা মতোই হবে। তাই-ই হচ্ছিলো। আমরা পাকিস্তানি রাডার আর অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট ফাঁকি দিয়ে তাদের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়তে পেরেছি। এখন কম্পাউন্ডের ভেতরে ঢোকাটা ভজঘট পাকিয়ে গেলো। আমরা এ রকম সম্ভাব্য পরিস্থিতিটাও রিহার্সাল করেছিলাম। এটা হলো আমাদের প্ল্যান বি। আমাদের টার্গেট যদি সত্যি সত্যি ভেতরে থেকে থাকে তাহলে সে খুব চমকে যাবে। তবে সেটা বেশিক্ষণের জন্য নয়।

হেলিকপ্টারটি শূন্যে ভেসে থাকার চেষ্টা করতে করতেই প্রচণ্ডভাবে দুলে উঠলো। প্রায় নব্বই ডিগ্রী ঘুরে গেলো ওটা। আমি টের পেলাম ওর লেজটা বাম দিকে ধাক্কা খেলো সশব্দে। একেবারে ভড়কে গেলাম আমি। দরজার কাছে থাকা একটি হ্যান্ডেল ধরে নিজেকে পড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করলাম। পেট গুলিয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। বুকটা ধড়ফড় করে উঠলো ভয়ে। দড়িটা ছেড়ে দিয়ে কেবিনের ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার সঙ্গীরা সবাই দরজার সামনে জড়ো হয়ে আছে। ফিরে যাবার জন্য খুব বেশি জায়গা নেই। টের পেলাম হেলিকপ্টার আমাদের ড্রপ করার সময় ওয়াল্ট আমার পিঠের সাথে ক্লিপ আটকে দেয়। আরেক হাতে নিজের স্নাইপার গিয়ারটা ধরে রেখেছে সে। যতোটুকু সম্ভব পিঠ হেলান দিয়ে রইলাম। ওয়াল্ট তার শরীর দিয়ে আমাকে ঠেসে রাখার চেষ্টা করছে যাতে আমি দরজা দিয়ে বাইরে ছিটকে না পড়ি।

"ধ্যাত! আমরা মাত্র নামতে যাচ্ছিলাম," ভাবলাম আমি।

হেলিকপ্টারটি একপাশে কাত হয়ে গেলো। কম্পাউন্ডের সীমানা প্রাচীরটা যেনো আমাদের দরজার কাছে ধেয়ে আসছে। মাথার উপরে থাকা এঞ্জিনটা প্রচণ্ড বেগে চলছে, চেষ্টা করছে শূন্যে ভেসে থাকতে। হেলিকপ্টারটি আরো বাম দিকে সরে গেলে পেছন দিকের লেজের পাখাটি আরেকটুর জন্য গেস্টহাউস◌ের সাথে ধাক্কা খেতো। মিশনের আগে আমরা ঠাট্টা করে বলতাম, আমাদের হেলিকপ্টার ক্র্যাশ হবার সম্ভাবনা খুবই কম কারণ আমাদের অনেকেই অসংখ্যবার হেলিকপ্টার ক্র্যাশ হবার পরও বেঁচে গেছি। আমরা নিশ্চিত ছিলাম, যদি কোনো হেলিকপ্টার ক্র্যাশ করে তাহলে সেটা চক টু-ই হবে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হাজার-লক্ষ শ্রমঘণ্টা ব্যয় হয়েছে এই মিশনের জন্য, অথচ এখন কিনা এভাবে তীরে এসে তরী ডোবার মতো অবস্থা হলো। কম্পাউন্ডে পা ফেলার আগেই এই দুর্ঘটনা! পা টেনে টেনে কেবিনের ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। হেলিকপ্টারটি যদি একপাশে ধাক্কা খায় তাহলে সেটা গড়িয়ে পড়ে যাবে।

আমার পা দুটো আটকা পড়ে যাবে ফিউজলেজে। আমি আমার পা দুটো ভাঁজ করে বুকের কাছে নিয়ে এলাম। আমার পাশে থাকা স্নাইপার দরজার বাইরে রাখা পা টেনে ভেতরে আনার চেষ্টা করছে। কিন্তু ভেতরে লোকজনে ঠাসাঠাসি। আমাদের কিছুই করার নেই, শুধু আশা করতে পারি হেলিকপ্টারটি গড়িয়ে নীচে পড়ে যাবে না।

সব কিছু ধীরগতির হয়ে গেছে। আপ্রাণ চেষ্টা করছি নিজের মনটা যেনো বিপর্যস্ত না হয়ে ওঠে।

প্রতিটি সেকেন্ডে আরো কাছে এগিয়ে আসছে নীচের জমি। টের পেলাম আমার সমস্ত শরীর আসন্ন সঙ্কটের দুশ্চিন্তায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

গ্রীন টিম

মিসিসিপির প্রশিক্ষণ শিবিরেরর কিল হাউস েের ভেতর ধীরে ধীরে এগোবার সময় টের পাই ঘামে আমার শার্ট ভিজে গেছে।

ইতিহাসের সবচাইতে বড় একটি অপারেশনে অংশ নেবার জন্য ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টারে ওঠার সাত বছর আগে, ২০০৪ সালের ঘটনা এটি। এই অপারেশনের জন্য বাছাই করার কাজে আমাদেরকে এখানে নিয়ে আসা হয় সিল টিম সিক্স থেকে। এই টিমের নাম দেয়া হয়েছে ইউনাইটেড স্টেটস ন্যাভাল স্পেশাল ওয়ারফেয়ার ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ, সংক্ষেপে ডেভগ্রু। নয় মাসের এই বাছাই দলের নাম গ্রীন টিম। আর মাত্র একটি ধাপ পরেই আমাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে ডেভগ্রু'র এলিট সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

আমি আমার টিমমেটদের নিয়ে দরজাটার কাছে এগিয়ে যাবার সময় যথেষ্ট নাভার্স ছিলাম। আমর হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছিলো। আজেবাজে চিন্তা মাথা থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। উত্তেজনায় ছটফট করছিলাম। এরকম কাজে মানসিক অস্থিরতার জন্যই বড় বড় ভুল হয়ে যায়। আমাকে মনোসংযোগ করতে হবে, দরজার ওপাশে যা-ই থাকুক না কেন ওটার ভেতরে ঢুকতে হবে। ইন্সট্রাক্টররা ক্যাটওয়াকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছে। .

এসব ইন্সট্রাক্টররা ডেভগ্রু'র সবচাইতে সিনিয়র আর অভিজ্ঞ সেনা। নতুনদের প্রশিক্ষনের কাজ তাদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আমাদের ভাগ্য এখন এইসর লোকজনের হাতে।

“এরপরই লাঞ্চ করবে তুমি।“ নিজেকে বললাম আমি।

আমার উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা দূর করার এটাই একমাত্র উপায়। ১৯৯৮ সালে আমি বেসিক আন্ডারওয়াটার ডেমোলিশন/সিল, অথবা বিইউডি/এসএ ট্রেনিং নেবার সময়ও নিজেকে এ বলে প্রবোধ দিয়েছিলাম যে, আরেকটু পরই আমি লাঞ্চ করতে পারবো।

আমি কোন অবস্থায় আছি, কতোটা ঠাণ্ডার মধ্যে জমে যাচ্ছি তাতে কিছুই যায় আসে না। এ পরিস্থিতিটা তো আর চিরকাল স্থায়ী হচ্ছে না। কথায় আছে না “একটা হাতি কিভাবে সাবাড় করতে পারবে তুমি?” জবাবটা খুব সহজ “একটা একটা করে কামড় দিয়ে।”

২০০৪ সালের মধ্যেই আমি একজন সিল বনে যাই তবে ডেভগ্রু'তে অন্তর্ভূক্ত হওয়াটা আমার ক্যারিয়ারের সবচাইতে বড় প্রাপ্তি। নেভির কাউন্টার টেররিজম ইউনিট হিসেবে ডেভগ্রু অপহৃত উদ্ধারের মিশন আর যুদ্ধাপরাধী ধরার কাজ করেছে। ১১ই সেপ্টেম্বরের পর থেকে এই ইউনিট আফগানিস্তান আর ইরাকে আল-কায়েদার যোদ্ধাদের নির্মূল করার কাজও শুরু করে।

তারপরও গ্রীন টিমের সদস্য হতে গেলে আরো কিছু যোগ্যতার দরকার পড়ে। কেবলমাত্র একজন সিল হলেই হবে না। গ্রীন টিমে নিছক পাস করা মানে ফেল করা। দ্বিতীয় স্থান যে অধিকার করবে সে বাদ পড়বে সবার আগে। এখানে মিনিমাম বলে কিছু নেই। গ্রীন টিমে সফলতার অর্থ মানসিক আর শারিরীকভাবে নিজের সর্বোচ্চ সীমায় পৌছাতে হবে আর সেটা সব সময়ের জন্য।

প্রতিদিন ট্রেনিংয়ের আগে আমাদেরকে শারিরীক শাস্তি দেয়া হতো। দৌড়-ঝাঁপ, পুশ-আপ, পুল-আপ এরকম অনেক কিছু করতে দিতো ইন্সট্রাক্টররা। কতোভাবে আমাদের শারীরকে সহ্যের সীমায় নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্যে বসে বসে পরিকল্পনা করতো তারা। এমনকি গাড়ি-বাসও ধাক্কা দিতে হতো আমাদেরকে। যখন কিল-হাউসে নিয়ে যাওয়া হতো তখন আমরা প্রায় নিঃশেষ অবস্থায় পৌছে যেতাম। বসবাসের বাড়িঘরের অনুরূপ অবস্থায় তৈরি করা এই কিল-হাউসগুলোর ভেতরে চলাচল করতে গিয়ে আমাদের পেশীগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়তো। সত্যিকারের মিশনের চাপ সহ্য করার জন্য এসব করানো।

হলওয়ে দিয়ে এগোবার ট্রেনিংয়ের প্রথম দিন কিল-হাউসের সময় ইন্সট্রাক্টরদের দিকে

তাকানোর ফুরসৎ পেলাম না। সবার নার্ভ উত্তেজনায় ফেটে পড়ছিলো যেনো। আমাদের এই ট্রেনিংটা শুরু হয়েছিলো প্লেন থেকে আরিজোনার রুক্ষ্ম অঞ্চলে প্যারাসুট দিয়ে নামার মাধ্যমে।

সেখানেও অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে কিন্তু মিসিসিপি'তে আসার পর কষ্টের যেনো শেষ রইলো না।

মাথা থেকে সমস্ত চিন্তা আর যন্ত্রণার কথা বাদ দিয়ে সামনের দরজার দিকে মনোযোগ দিলাম। দরজাটায় কোনো হাতল নেই। পাতলা প্লাইউড দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ওটা। আমরা এখানে পৌছানোর আগেই আরেকটি দল এসে দরজাটা ভেঙে দিয়েছে। ফলে আমার এক টিমমেট দস্তানা পরা হাত দিয়ে আলতো করে ধাক্কা মেরেই সেটা খুলে ফেললো। খোলা দরজার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের টার্গেটের অবস্থান বোঝার চেষ্টা করলাম, তারপরই ঢুকে পড়লাম একে একে।

ঘরটা চারকোনা, রেলরোডের পুরনো টাইল্স দিয়ে বানানো হয়েছে এর দেয়াল। আমি আমার রাইফেলটা তাক করে রেখেছি, দেখার চেষ্টা করছি সামনে কোনো টার্গেট আছে কিনা। পেছন থেকে শুনতে পেলাম আমার টিমমেট ঘরে ঢুকছে।

ঘরে কিছুই নেই। একেবারে ফাঁকা।

“বাইরে আসো,” ঘরটা ভালো করে দেখার পর আমার টিমমেট বললো সবাইকে।

আমি তাকে কভার করার পজিশনে চলে এলাম সঙ্গে সঙ্গে।

ঘর থেকে বের হবার সময় মাথার উপর ক্যাটওয়াক থেকে গুঞ্জন শুনতে পেলাম, তবুও আমরা থামলাম না। জানতাম আমাদের মধ্যে কেউ হয়তো কিছু একটা ভুল করে ফেলেছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার মধ্যে জমাট বাধা টেনশন আরো বেড়ে গেলো। তবে খুব দ্রুতই মন থেকে তাড়িয়ে দিলাম সেটা। ভুল করা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই এখন।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পাশের ঘরে ঢুকলাম আমরা। ঢুকতেই দুটো টার্গেট চোখে পড়লো আমার। ডান দিকে একটি অবয়ব দুটো হাতে ছোট্ট একটি রিভলবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে সোয়েটার। দেখতে ৭০ দশকের সিনেমার গুণ্ডাদের মতো লাগছে। বাম দিকে একটি নারী অবয়ব, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ।

ঘরে ঢুকেই দেরি না করে গুণ্ডাটাকে গুলি করে দিলাম। গুলিটা লাগলো ঠিক বুকের কাছে। আরেকটু সামনে এগিয়ে কয়েক রাউন্ড খরচ করলাম আমি।

“ক্লিয়ার,” অস্ত্রটার নল নামিয়ে বললাম।

“ক্লিয়ার,” আমার টিমমেটেরা জবাবে বললো।

“অস্ত্রগুলো নিরাপদ করো, কাঁধে ঝুলিয়ে নাও," একজন ইন্সট্রাক্টর বললো উপর থেকে।

ঘরের উপরে ক্যাটওয়াকে দাঁড়িয়ে কম করে হলেও ছয়জন ইন্সট্রাক্টর আমাদেরকে দেখছে। আমরা কি ভুল করছি, কিভাবে কাজ করছি সব খতিয়ে দেখছে তারা।

রাইফেলটা সেফটি মোডে নিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে নিলাম। জামার হাতা দিয়ে কপাল থেকে মুছে নিলাম ঘাম। অভিযান শেষ হবার পরও আমার হৃদস্পন্দন লাফাচ্ছে। এই প্রশিক্ষনের সিনারিওটা খুবই সোজাসাপ্টা। আমরা সবাই জানি কিভাবে ঘরগুলো ক্লিয়ার করতে হবে। সামান্য ভুলেরও কোনো স্থান নেই। এ মুহূর্তে আমি বুঝতে পারছি না ঠিক কোন ভুলটা আমরা করেছি।

“তোমার ‘মুভ কল’টা কোথায় গেলো?” ক্যাটওয়াক থেকে টম নামের এক ইন্সট্রাক্টর বললো আমাকে।

কোনো জবাব দিলাম না। শুধু মাথা নাড়লাম। খুবই বিব্রত আর হতাশ আমি। আমার টিমমেটকে প্রথম ঘরের দিকে যাবার জন্য বলতে ভুলে গেছিলাম। এটাকে নিরাপত্তা লঙ্ঘন, অর্থাৎ সেফটি ভায়োলেন্স হিসেবে দেখা হয়।

এই কোর্সে টম হলো সবচেয়ে সেরা ইন্সট্রাক্টর। তাকে দূর থেকে কিংবা অন্ধকারেও আমি চিনতে পারি, কারণ তার মাথাটা বেশ বড়সড়। এই একটা বৈশিষ্ট ছাড়া তাকে দেখে হুট

করে চেনা সম্ভব নয়। তার ভাবভঙ্গি খুবই শান্ত প্রকৃতির, দেখে মনে হয় ও জীবনে কখনও হতাশ হয় না। আমরা সবাই তাকে শ্রদ্ধা করি, কারণ সে যেমন দৃঢ়চেতা তেমনি ন্যায়পরায়ণ। কারো প্রতি তার পক্ষপাত কিংবা বিরাগ নেই। টমের সামনে কোনো ভুল করা মানে তাকে বিমুখ করা। আমার কাজে অসন্তোষ হবার চিহ্ন ফুটে উঠেছে তার চোখেমুখে।

তবে কোনো চিৎকার চেঁচামেঁচি করলো না। শুধু চেয়ে রইলো একদৃষ্টিতে।

উপর থেকে সে আমার দিকে এমনভাবে চেয়ে আছে যেনো বলছে, “এটা তুমি কি করলে!”

আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতে চাইলাম কিন্তু ভালো করেই জানি তারা এসব কথা শুনতে চায় না। তারা যখন বলবে তোমার ভুল হয়েছে তখন মেনে নিতে হবে সেটা। তাদের সাথে কোনো রকম তর্কাতর্কি করা কিংবা সাফাই গাইবার উপায় নেই।

“ওকে, চেক,” আত্মপক্ষ সমর্থন না করেই বললাম। এরকম একটা ভুল করার জন্য যারপরনাই রেগে আছি মনে মনে।

“আমরা এর চেয়ে ভালো কিছু চাই,” বললো টম। “যাও এখান থেকে। দড়ি বাও।”

রাইফেলটা শক্ত করে ধরে কিল-হাউস থেকে দৌড়ে বের হয়ে গেলাম। দড়ির তৈরি একটি মই বাইতে শুরু করলাম আমি। একটা গাছের সাথে সেটা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। উচ্চতায় তিনশ' ফুটের মতো হবে। এই দড়ির মই বাওয়াটা সহজ কাজ নয়। যতোই উপরে উঠতে থাকলাম ততোই মনে হচ্ছে আমার ওজন বুঝি বেড়ে যাচ্ছে।

এর কারণ আমার পিঠের ব্যাগ কিংবা সঙ্গে থাকা সরঞ্জামগুলো নয়। কারণ আমি আমার ব্যর্থতার জন্য যারপরনাই হতাশ। নেভি সিলে যোগ দেবার পর কখনও ব্যর্থ হই নি। এটাই আমার প্রথম ব্যর্থতা।

ছয় বছর আগে যখন সান ডিয়েগোর বিইউডি/এস-এ যাই তখন আমার সন্দেহ ছিলো আমি হয়তো সফল হতে পারবো না। আমার সঙ্গে আসা অনেক সঙ্গী-সাথী হয় বাদ পড়ে যায় নয়তো নিজেরাই চলে যায় ট্রেনিংয়ের মাঝপথ থেকে। অনেকেই সমুদ্র তীরে অমানুষিক দৌড়ঝাঁপ কিংবা জলের নীচে স্কুবা ডাইভিং প্রশিক্ষণে নাকাল হয়েছিলো।

অন্যান্য বিইউডি/এস ক্যান্ডিডেটের মতো আমিও মাত্র তেরো বছর বয়স থেকে একজন সিল হতে চাইতাম। সিল সম্পর্কিত প্রায় সব বই পুস্তক পড়ে ফেলেছিলাম। টিভি'তে ডেজার্ট স্টার্মের অপারেশনের খবর দেখতাম মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে। দিবাস্বপ্ন দেখতাম কোন মিশনে গিয়ে এম্বুশ করছি। বেড়ে ওঠার ঐ সময়টাতে আমি সিল হবার জন্য যা যা করা দরকার সবই করেছি।

ক্যালিফোর্নিয়ার একটি কলেজ থেকে ডিগ্রি সমাপ্ত করে চলে যাই বিইউডি/এস-এ, ১৯৯৮ সালে সেখান থেকে সিল হবার ছাড়পত্র পাই।

প্রশান্ত মহাসাগরে ছয় মাসের মিশন শেষ করে ২০০৩-২০০৪ সাল পর্যন্ত ইরাকে ডিপ্লয়েড ছিলাম।

ডেভগ্রু হলো সিলদের মধ্যে সবথেকে সেরাদের একটি সংগ্রহশালা। আমি ভালো করেই জানতাম চেষ্টা না করলে কোনোদিনও ওখানে আমার জায়গা হবে না।

১৯৮০ সালে ইরানের রাজধানী তেহরানে ইউ.এস অ্যাম্বাসির বাহান্নজন মার্কিন নাগরিককে পনবন্দী করে বিপ্লবীরা। 'অপারেশন ঈগল ক্ল' নামের একটি উদ্ধার অভিযান চালানো হয় তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের নির্দেশে। সেই মিশনটি সমাপ্ত হবার পর পরই তৈরি করা হয় নেভির কাউন্টার টেররিজম ইউনিট।

মিশনটি শেষ হবার পর নেভি বুঝতে পারে এরকম পরিস্থিতির জন্য বিশেষ একটি বাহিনীর প্রয়োজন রয়েছে। রিচার্ড মারচিঙ্কো নামের একজনকে দায়িত্ব দেয়া হয় সিল টিম সিক্স নামের নেভির একটি কাউন্টারটেররিজম ইউনিট গঠনের জন্য। এই টিম পনবন্দী উদ্ধারের পাশাপাশি শত্রুদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে তাদেরকে নির্মূল করা, জলদস্যুদের হাত থেকে জাহাজ মুক্ত করা এবং সমুদ্রে ভাসমান অয়েল রিগকে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রক্ষা

করার কাজ করতো। পরবর্তী সময়ে এর মিশন আরো বেড়ে যায়। গণবিধ্বংসী অস্ত্রের তল্লাশী কাজেও তাদেরকে ব্যবহার করা হয়।

মারচিঙ্কো যখন এই কমান্ডটি গঠন করেন তখন কেবলমাত্র দুটো সিল টিম ছিলো। 'সিক্স' সংখ্যাটি জুড়ে দেয়া হয় একটি কৌশলের কারণে-তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন যাতে মনে করে মার্কিন নেভির কাছে এরকম অনেকগুলো টিম রয়েছে। ১৯৮৭ সালে সিল, পরিণত হয় ডেভগ্রু'তে।

পঁচাত্তর জন অপারেটর নিয়ে গঠিত হয় এই ইউনিটটি। মারচিঙ্কো এককভাবে এর সদস্যদের বাছাই করেছিলেন। বর্তমানে এই ইউনিটের সব সদস্য বাছাই করে বাকি সিল টিম এবং এক্সপ্লোসিভ অর্ডান্স ডিসপোজাল ইউনিট। ইউনিটটির আকার বেশ দ্রুত বেড়ে গেছে। অসংখ্য টিম অপারেটর আর সাপোর্ট স্টাফ কাজ করে এখন। তবে এর মূল লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য ঠিক আগের মতোই আছে।

স্পেশাল অপারেশন কমান্ডের এই ইউনিটটি আবার জয়েন্ট স্পেশাল কম্যান্ডের (জেএসওসি) একটি অংশ। ডেল্টা ফোর্সের মতো অন্যসব সামরিক ফোর্সের সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে থাকে ডেভগ্রু।

ডেভগ্রু'র প্রথম মিশনটি ছিলো ১৯৮৩ সালের অপারেশন আর্জেন্ট ফিউরি। ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের ছোট্ট রাষ্ট্র গ্রেনাডাতে কমিউনিস্টরা যখন ক্ষমতা দখল করেছিলো তখন তাদের হাত থেকে গভর্নর জেনারেল পল শুনকে উদ্ধার করার কাজ ছিলো এটি। শুনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলো বামপন্থীরা।

এর ছয় বছর পর ডেভগ্রু ডেল্টা ফোর্সের সাথে যৌথভাবে একটি অপারেশনে অংশ নেয় পানামার স্বৈরশাসক নরিয়েগাকে ধরে আনার জন্য। ১৯৯৩ সালে সোমালিয়ার যুদ্ধবাজ নেতা মোহাম্মদ ফারাহ আইদদিকে ধরার মিশনেও ডেভগ্রু যৌথভাবে কাজ করেছিলো মার্কিন সেনাবাহিনীর সাথে। ঐ মিশনটি সামরিক ইতিহাসে 'ব্যাটল অব মোগাদিসু' নামে পরিচিত। মার্ক বাউডেন-এর বিখ্যাত বই ব্যাকহক ডাউন-এ এই অপারেশনের বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে।

১৯৯৮ সালে বসনিয়ার যুদ্ধপরাধীদেরকেও পাকাড়াও করার কাজ করেছিলো ডেভগ্রু। এরমধ্যে ১৯৯৫ সালে স্রেব্রেনিচার গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত রাদিস্লাভ ক্রিশ্চিকও আছে। এই বসনিয়ান জেনারেল পরবর্তীতে গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হয়।

১১ই সেপ্টেম্বরের পর থেকে ডেভগ্রু'র অপারেটররা বিরামহীনভাবে ইরাক এবং আফগানিস্তানে আল-কায়েদা আর তালিবান জঙ্গিদের নির্মূল করার কাজ করে আসছে। ২০১১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের পর পর সবার আগে এই কমান্ডকেই অভিযান চালাতে বলা হয় আফগানিস্তানের মাটিতে। পরবর্তীতে এরকম অসংখ্য অভিযান পরিচালনা করে তারা। এরমধ্যে ২০০৩ সালে ইরাকের মাটি থেকে জেসিকা লিঞ্চকে উদ্ধারের ঘটনাটি বেশ আলোচিত হয়। স্পেশাল এবং জরুরি কোনো অপারেশনের দরকার পড়লে সবার আগে তাদেরকেই ডাকা হয়, এই ব্যাপারটি আমাকে বেশ উদ্বুদ্ধ করেছিলো এখানে যোগ দেবার জন্য।

গ্রীন টিমে ঢুকতে হলে আপনাকে সিল হতেই হবে। বেশিরভাগ ক্যান্ডিডেটেরই দুটো ডিপ্লয়মেন্ট রয়েছে। ডিপ্লয়মেন্ট-এর অর্থ ক্যান্ডিডেটকে প্রয়োজনীয় দক্ষ এবং অভিজ্ঞ হতে হবে। শুধু এ দুটো যোগ্যতা যাদের আছে তাদেরকেই সিলেকশন কোর্সের জন্য ডাকা হয়।

মিসিসিপির গরমে দড়ির মই বেয়ে ওঠার সময় আমি ভাবছিলাম, গ্রীন টিমে ঢোকার আগেই মাত্র তিনদিনের স্ক্রিনিং টেস্টে ব্যর্থ হয়ে গেলাম।

এই ব্যর্থতার পর ক্যালিফোর্নিয়ার পেন্ডেলটনের ক্যাম্পের এক গাছের নীচে বসে বসে মেরিনদের তৈরি করা বেস ক্যাম্পটা দেখছিলাম। ২০০৩ সালে আমাদেরকে পুণরায় ট্রেনিংয়ের জন্য ডাকা হয়। অন্যদের সাথে আমিও চলে আসি সান ডিয়েগো'তে। এটা ছিলো তিন দিনের একটি বাছাইকরণ। আমি যদি নির্বাচিত হই তাহলে নয় মাসের জন্য গ্রীন টিমের

ট্রেনিং কোর্সে সুযোগ পাবো। সেখান থেকে উত্তীর্ণ হলে আমি ডেভগ্রু'তে অন্তর্ভূক্ত হবো।

আমার প্লাটুনে একমাত্র আমিই গিয়েছিলাম। সিস্টার প্লাটুনে আমার এক বন্ধুও এই বাছাই প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। আমরা একসঙ্গে গাড়িতে করে যাবার সময় আমাদের মুখ থেকে সবুজ রঙ মুছে ফেলি। তখনও আমাদের গায়ে মিলিটারির ক্যামোফ্লেজ পোশাক, ফিল্ডে কয়েক দিন কাটানোর ফলে আমাদের গা থেকে বডি ওডৌর আর মশা-মাছি-ছারপোকা মারার স্প্রের গন্ধ বের হচ্ছে। আমার পেট চো চো করছিলো ক্ষিদের চোটে। জলশূন্যতার হাত থেকে বাঁচার জন্য গাড়িতে বসেই প্রচুর জল খেয়ে নেই। আমার শারিরীক অবস্থা খুব একটা ভালো ছিলো না তখন। আমি ভালো করেই জানতাম বাছাই পরীক্ষার প্রথম শর্তটিই হলো ফিটনেস টেস্ট।

পরের দিন সকালে আমাদেরকে সমুদ্র তীরে নিয়ে যাওয়া হয়। খুব ভোর হতেই আমাদেরকে চার মাইল দৌড়ানোর জন্য বলা হয়েছিলো। একটা ছোট্ট বিরতির পর আরো দুই ডজন ক্যান্ডিডেটের সাথে কংক্রিটের প্যারেড গ্রাউন্ডে নিয়ে যাওয়া হয় আমাকে। আমরা দাঁড়িয়ে থাকি। তখন সবেমাত্র সকাল হচ্ছে। ততোক্ষনে আমি দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তারপরও আমাদেরকে বুকডন, ব্যায়াম আর ওঠবস করতে হয়েছিলো সাঁতার কাটার আগে। বুকডন পরীক্ষায় আমি পাস করে যাই। প্রতিটি এক্সারসাইজ নিখুঁতভাবে করতে হতো, তা না হলে সেটাকে আর গোণা হতো না। চিৎ হয়ে শুয়ে সিট-আপ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হই আমি। প্রথম সিট-আপেই আমি নক আউট হয়ে যাই।

ফিল্ডে থাকার পরও আমার স্ট্যামিনায় সেটা সাহায্য করে নি। প্রথম দিকে আমার ছন্দটা ঠিকই ছিলো কিন্তু আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ইন্সট্রাক্টর একটু ভুল হলেই একই সংখ্যা বার বার বলতো। "দশ, দশ, দশ," বলতো সে। "দশ, এগারো, বারো, বারো।" এরকম আর কি।

আমার টেকনিক অবশ্য টেক্সটবুক মোতাবেক ছিলো না। যখনই নিখুঁতভাবে কসরত হতো না তখনই সে সংখ্যাগুলো বারবার বলতো। যতোবার সে এ কাজ করতো আমি ভীষণ লজ্জা পেতাম। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম কিন্তু টেস্ট স্ট্যান্ডার্ডের কাছাকাছি পৌছাতে পারছিলাম না।

"এক মিনিট।"

আমি একটু পিছিয়ে পড়তেই বলা হয়। তখন খুব দ্রুত সময় চলে যাচ্ছিলো। আমি যদি সিটআপে ফেল করি তাহলে সব শেষ। আমার মনে সন্দেহের দানা বাঁধতে শুরু করলো। নানা রকম টালবাহানা করতে শুরু করলাম তখন। যেমন, যেহেতু আমি টেস্টের জন্য প্রস্তুতি না নিয়ে আমার ইউনিটের সাথে ট্রেনিংয়ে ছিলাম সেজন্যে ভালোমতো প্রস্তুতি নিতে পারি নি।

"ত্রিশ সেকেন্ড।"

আর মাত্র আধ মিনিট বাকি আছে অথচ আমাকে তখনও দশবার সিটআপ করতে হবে। আমার পাশের একজন ততোক্ষণে তার সিটআপ শেষ করে ফেলেছে। আমার মাথা ভন ভন করতে শুরু করলো। বিশ্বাসই হচ্ছিলো না আমি আবারো ব্যর্থ হচ্ছি। আজেবাজে চিন্তা মাথা থেকে বাদ দিয়ে সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দিলাম টেকনিকের দিকে। "দশ সেকেন্ড।"

আমি কাছাকাছি চলে এসেছি। আমার পেট ব্যথা করছে। দম ফুরিয়ে আসছে। ক্লান্তির বদলে আমার মধ্যে ভীতি জেঁকে বসেছে ততোক্ষণে। আসছে। প্রচণ্ড শকের মধ্যে পড়ে গেছি। আমাকে পাস করতেই হবে। ফেল করা যাবে না। ফিজিক্যাল টেস্টে ফেল করে নিজের প্লাটুনে ফিরে যাওয়াটা হবে খুবই লজ্জাজনক। তাদেরকে কী বলবো? আমি সামান্য ফিজিক্যাল পরীক্ষাতেই ব্যর্থ হয়েছি!

"পাঁচ, চার, তিন..."

ইন্সট্রাক্টর তার গণনা শেষ করতেই আমার সিট-আপও শেষ হয়ে গেলো। একেবারে নিঃশেষিত হবার জোগাড়, কিন্তু তখনও আমার পুল-আপ বাকি আছে। প্রায় ব্যর্থ হতে যাচ্ছিলাম আমি, ফলে আমার মধ্যে প্রচণ্ড ভড়কে যাওয়ার একটি ভাব চলে আসে। আর

কোনো চিন্তাভাবনা না করে সোজা বারে গিয়ে পুল-আপ করতে শুরু করি।

শেষ কাজটি ছিলো সান ডিয়েগোর উপসাগরে সাঁতার কাটা। জল ছিলো বরফের মতোই ঠাণ্ডা। আমাদের গায়ে ছিলো ওয়েটসুট, ফলে খুব বেশি ঠাণ্ডা অনুভূত হয় নি। আমার শুরুটা বেশ ভালো হলো। বাছাই পরীক্ষায় ন্যাভাল অ্যাকাডেমির একজন সাঁতারু ছিলো, সে ছিলো আমার থেকেও বেশ খানিকটা এগিয়ে। অবশ্য আমি ছিলাম তার পরই, দ্বিতীয় স্থানে। আপ্রাণ চেষ্টা করার পরও আমার গতি ধীর হয়ে গেলো। মনে হচ্ছিলো পেছন থেকে কেউ আমাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে।

ফিনিশ লাইনে যখন পৌছলাম আমার ইন্সট্রাক্টর আমাকে বললো আমি ফেল করেছি। পরে দেখা গেলো অ্যাকাডেমির ঐ সাঁতারু বাদে বাকি সবাই ফেল করেছে। ব্যাপারটা ইন্সট্রাক্টরদের নজরে এলে তারা জোয়ার-ভাটার সময়সূচীটা চেক করে দেখলো। সবকিছু খতিয়ে দেখা গেলো আমরা আসলে স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কেটেছি।

"আগামীকাল এই পরীক্ষাটি আবার নিতে হবে," আমাকে স্বস্তি দিয়ে তারা বললো।

আসল চ্যালেঞ্জটা হলো প্রতিটি এক্সারসাইজ শেষ করতে করতেই তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তাই সাঁতারের এক্সারসাইজটা আমরা রিপিট করতে পারতাম না। আমি জানতাম আমাকে আবার সিট-আপ করতে হবে। আবার এও জানতাম এক রাতে আমি আমার পেটটা সুগঠিত করতে পারবো না।

এটা ছিলো মানসিক ব্যাপার।

আমি ওখানে গেছিলাম পরীক্ষায় উত্তীর্ন হবার জন্য। ভালো স্কোর করার জন্য। ভালো করেই জানতাম আমার স্কোর খুব একটা ভালো ছিলো না। পরের দিন মৌখিক পরীক্ষায় ইন্সট্রাক্টররা এটাকে কিভাবে নেবে তা নিয়ে ভীষণ চিন্তিত ছিলাম। এই পরীক্ষায় শুধু পাস করাটা কোনো কাজেই লাগবে না। এটা হলো সেরাদের মধ্যে সেরা নির্বাচন করার বাছাই পরীক্ষা।

সমস্যা হলো আমি ইন্সট্রাক্টরদের তখনও নিজের সেরাটা দেখাতে পারি নি। ইন্টারভিউয়ের জন্য একটু আগেভাগেই চলে গেলাম। নীল ইউনিফর্ম আর বিভিন্ন খেতাবের রিবনগুলো তাতে লাগানো ছিলো। ঐদিন চুলও কেটে নিয়েছিলাম। ভালো করে শেভ করেছিলাম যাতে আমাকে পুরোপুরি ফিট দেখায়। আমাকে দেখতে একেবারে ছবিতে দেখা ইউনিফর্ম পরিহিত সেনাদের মতোই লাগছিলো। একজন সিল-এর জন্য ঐ মুহূর্তটি খুবই বিরল। -প্রথমবার বুঝতে পারলাম পরিপাটী পোশাক, চকচকে জুতো, ক্লিনশেভ, সুন্দর করে চুল কাটার ব্যাপারগুলো এই পেশায় সত্যি কোনো মানে রাখে। নিদেনপক্ষে বোর্ডের সামনে কিছুটা সুবিধা হয়তো পাওয়া যায়।

কনফারেন্সরুমে বিশাল আর লম্বা একটি টেবিল। সেই টেবিলে বসে আছে আধ ডজন মাস্টার চিফ, একজন সাইকোলজিস্ট, যিনি বাছাই পরীক্ষার দ্বিতীয় দিন আমাদের সবার টেস্ট নিয়েছিলেন, আর একজন ক্যারিয়ার কাউন্সিলর। বোর্ডে সবার সামনে একটা মাত্র চেয়ার। ঘরের ভেতর ঢুকে বেশ স্বাভাবিকভাবেই আমি চেয়ার টেনে বসে পড়লাম।

পাঁচচল্লিশ মিনিট ধরে তারা আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে গেলো। এ জীবনে কখনও এতোটা তোপের মুখে পড়ি নি। বোর্ডের সামনে হাজির হবার আগে আমি জানতে পারি নি তারা আগেভাগেই আমার সিল টিম ফাইভের কমান্ডার আর প্লাটুন চিফের সাথে কথা বলেছে। আমি কে, কতোটা ভালো এ বিষয়ে তারা ততোক্ষণে বেশ ভালোমতোই জেনে গেছে। এবার শুধু বাগে পেয়ে আমাকে একটু ঝালিয়ে নেবার পালা।

ঐদিন মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে কারা বসেছিলো তা স্মরণ করতে পারছি না। আমার কাছে তারা শুধুই উচ্চপদস্থ অপারেটর, যারা আমার ভাগ্য নির্ধারণ করে দেবে। তারা যেনো আমাকে সিলেট করে সেটা নিশ্চিত করতে হবে আমাকেই। সবই আমার নির্ভর করছে। তাদেরকে কনভিন্স করতে হবে।

কিন্তু আমার শারিরীক ফিটনেসের স্কোর খুব একটা সাহায্য করলো না এক্ষেত্রে।

“তুমি কি জানো কিসের জন্যে তোমাকে বেছে নেয়া হচ্ছে?” একজন চিফ জিজ্ঞেস করলেন। “তুমি কি জানো কি করার চেষ্টা করছো? এটা হলো এন্ট্রি লেভেলের টেস্ট। এখানে তোমাকে বিরাট একটি কাজের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে, আর তুমি কিনা এরকম ফল করলে?”

আমি দ্বিধা করলাম না। জানতাম তারা এভাবেই আক্রমণ করবে। আমার শুধুমাত্র একটা দান মারাই বাকি আছে। সুতরং সেটা আমাকে মারতেই হলো।

“আমি সব দায়দায়িত্ব নিচ্ছি,” বললাম তাদেরকে। “আমি আমার পিটি স্কোর নিয়ে যারপরনাই বিব্রত। আমি শুধু বলতে চাই, আমাকে যদি নির্বাচিত করা হয়, কাজ করবার সুযোগ দেয়া হয় তাহলে এমন স্কোর আর কখনও হবে না। আমি আপনাদের কাছে কোনো অজুহাত দেখাবো না। যা হয়েছে আমার জন্যেই হয়েছে। সব দায়দায়িত্ব আমারই।”

আমি তাদের মুখের দিকে তাকালাম। বোঝার চেষ্টা করলাম তারা আমার কথা বিশ্বাস করেছে কিনা। কিন্তু তাদের অভিব্যক্তি একদম ভাবলেশহীন। খুশি-অখুশি কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। প্রশ্নের বাণ চলতেই লাগলো। ওগুলো এমনভাবে করা হয়েছিলো যেনো আমাকে বিপর্যস্ত করে ফেলা হয়। তারা দেখতে চেয়েছিলো আমি আমার দৃঢ়তা ধরে রাখতে পারি কিনা। আমি যদি এরকম নিরাপদ একটি কক্ষে বসে, পরিচিত পরিবেশে কিছু উচ্চপদস্থ লোকজনের প্রশ্নবাণেই টিকতে না পারি তাহলে সম্মুখ সমরে গিয়ে সত্যিকারের গোলাগুলির মুখে পড়লে কী করবো?

তারা যদি আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়ার পরিকল্পনা করে থাকে তাহলে বলতেই হবে বেশ সফল হয়েছিলো। কিন্তু আমি আসলে যারপরনাই বিব্রত ছিলাম। এইসব লোকজনকে দেখে আমি তাদের মতো হতে চাইতাম। একজন তরুণ সিল হিসেবে সামান্য সিট-আপ টেস্টে ব্যর্থ হওয়াটা একেবারেই হতাশাজনক। অবশেষে তারা তাদের পরীক্ষা শেষ করলো “আমরা ছয়মাসের মধ্যে তোমাকে জানাবো তুমি নির্বাচিত হয়েছো কিনা।”

ঐ ঘর থেকে বের হবার সময় মনে হলো আমার সম্ভাবনা ফিফটিফিফটি।

ক্যাম্প পেনডেলটনে ফিরে গেলাম আমি। মুখে সবুজ রঙ মেখে ফিল্ডে আমার টিমমেটদের সাথে যোগ দিলাম আবার শেষ কয়েকদিনের ট্রেনিং সমাপ্ত করার জন্য।

“টেস্ট কেমন হলো?” আমার চিফ জানতে চাইলেন।

“বুঝতে পারছি না,” বললাম তাকে।

আমি ফিটনেস টেস্টে খারাপ করার কথাটা কাউকে বলি নি। জানতাম ফেল করার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। আমার সিল টিম ফাইভকে যখন ইরাকে পাঠানো হচ্ছিলো তখনই আমি খবরটা পাই। আমার প্লাটুন চিফ আমাকে তার অপারেশন সেন্টারে ডেকে পাঠালেন।

“তোমাকে বাছাই করা হয়েছে,” বললেন তিনি। “আমরা এই মিশন থেকে ফিরে এলেই তোমাকে গ্রীন টিমে যোগ দেবার অর্ডার দেয়া হবে।”

কথাটা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেছিলাম, কারণ ধরেই নিয়েছিলাম আমি ফেল করবো। ভেবেছিলাম আমাকে আবারো বাছাই পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। এখন আমাকে নির্বাচিত করা হয়েছে। মনে মনে প্রতীজ্ঞা করলাম একই ভুল আর দ্বিতীয়বার করবো না। জানতাম গ্রীন টিমের জন্যে আমাকে ভালোমতো প্রস্তুতি নিতে হবে।

টপ ফাইভ/বটম ফাইভ

মিসিসিপির প্রচণ্ড গরম আর গ্রীষ্মের আদ্র আবহাওয়ায় দড়ির মই বেয়ে উঠতে গিয়ে আমার ফুসফুস যেনো পুড়ে যাচ্ছিলো, পা দুটো ব্যথায় আড়ষ্ট। যন্ত্রণাটা যতো না শারিরীক তারচেয়েও বেশি আত্মসম্মানের। আমি ভুল করে ফেলেছিলাম। ইন্সট্রাক্টররা যতোটুকু চেয়েছিলেন আমি তারচেয়েও বেশি চাপ অনুভব করেছিলাম। কিল-হাউসের ভেতরে করা ভুলের কারণ ছিলো আমি মনোযোগী ছিলাম না। জানি এটা অগ্রহণযোগ্য। এরকম শারিরীক মানসিক চাপ যদি সহ্য করতে না পারি, সমস্ত নার্ভাসনেস আর প্রতিকূলতা যদি অগ্রাহ্য করতে না পারি তাহলে এখানে খুব বেশি দিন টিকে থাকতে পারবো না। যেকোনোদিন যে কাউকে কোর্স থেকে বাদ দেয়ার ক্ষমতা রাখে ইন্সট্রাক্টররা।

আমি আবারো দৌড়ে ফিরে এলাম বাড়িটার বাইরে। ভেতর থেকে গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমাদের কোনো টিম রুমগুলো ক্লিয়ার করে ফেলেছে। বুক ভরে দম নিয়ে আবারো নেমে গেলাম অ্যাকশনে।

যখন ফিরে এলাম দেখতে পেলাম টম ক্যাটওয়াক থেকে নেমে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে ডেকে একটু দূরে নিয়ে গেলো সে।

"শোনো ভাই," বললো টম। "তুমি ঠিকভাবেই সব কিছু করেছো, সঙ্গীদের ভালোমতোই কভার করেছো কিন্তু কোনো 'মুভিং' কল দাও নি।

"চেক," বললাম আমি।

"আমি জানি তোমাদের সিল-এ এরকম মুভিং কল দেবার দরকার পড়ে না। কিন্তু এখানে আমরা এটা চাই। ঠিক যেমনটি আমাদের ক্লোজ কোয়ার্টার ব্যাটল অর্থাৎ সিকিউবি'র টেক্সটবুকে আছে তেমনটি। তুমি যদি এই ট্রেনিংটা ভালোমতো শেষ করে অ্যাসল্ট টিমে যোগ দিতে চাও, সেকেন্ড ডেক-এ নিজেকে উন্নীত করতে চাও তাহলে বেসিক সিকিউবি করার দরকার পড়বে না। কিন্তু এখানে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে তোমাকে দেখাতে হবে তুমি বেসিক সিকিউবি'টাও করতে পারো। আমাদের একটি স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে, সুতরাং তুমি মুভিং কল ছাড়া মুভ করতে পারো না।"

'সেকেন্ড ডেক' ভার্জিনিয়া বিচে অবস্থিত কমান্ড সেন্টার, যেখানে অ্যাসল্ট টিমের সবাই একটি কমান্ডের অধীনে কাজ করে। গ্রীন টিমে আমাদের প্রথম দিনেই সবাইকে বলে দেয়া হলো ভবনের সেকেন্ড ফ্লোরে যেনো কেউ না যাই। গ্র্যাজুয়েশন করার আগে সেখানে যাবার অনুমতি মিলবে না। সুতরাং সেকেন্ড ডেক হলো আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য। এটাই হলো প্রমোশন।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে আমি আমার রাইফেলে নতুন ম্যাগাজিন ভরে নিলাম।

সেই রাতে আমি আমার সমস্ত সরঞ্জাম টেবিলে মেলে রেখে ঠাণ্ডা বিয়ার হাতে তুলে নিলাম। আস্ত একটা হাতি খাওয়ার সেই প্রবাদের কয়েকটি কামড় দিতে পেরেছি আর কি। এখনও অনেক বাকি। সেকেন্ড ডেক-এ পা রাখার পথে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলাম বলা চলে।

সিকিউবি ট্রেনিংয়ের সময় আমাদের সবাইকে রাখা হয়েছিলো কিল-হাউস আর শুটিং রেঞ্জের কাছে কতোগুলো বিশাল বাড়িতে। ওগুলো আসলে এক ধরণের ব্যারাক। শত শত সিল আর স্পেশাল ফোর্স সদস্যের ট্রেনিং দেয়ার সময় ওগুলো আবাসন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পুরো ঘর জুড়ে রয়েছে অসংখ্য বাঙ্ক বেড। তবে আমি বেশিরভাগ সময় নীচের লাউঞ্জ এরিয়াতেই কাটাতাম। ওখানে পুল খেলার টেবিল আর বিশাল পর্দার একটি টিভি রয়েছে। সব সময় স্পোর্টস চ্যানেলই চালানো হতো। লোকজনের হৈহল্লা আর কোলাহলে পরিপূর্ণ একটি জায়গা। সিল কমিউনিটিটা খুবই ছোটো। সবাই সবাইকে চেনে। বিইউডি/এস এর

ট্রেনিং নিতে ঢুকলেই তুমি তোমার রেপুটেশন বা সুনাম তৈরি করতে শুরু করবে। প্রথম দিন থেকেই সবাই এই রেপুটেশন নিয়ে কথা বলতে শুরু করে।

"তোমাকে তো আজ মই বেয়ে উঠতে দেখলাম, " পুল খেলতে খেলতে বললো চার্লি। "কোন বালের অকর্মটা করেছিলে?"

চার্লির যেমন বিশাল আকার, তেমনি তার ঠাট্টা তামাশাও। দেখতে দৈত্যদের মতো লাগে। লম্বায় ছয় ফুট চার ইঞ্চি। দুশো ত্রিশ পাউন্ড ওজন। শরীরের মতো তার মুখটাও বেশ বড়। দিন-রাত খিস্তি করা তার স্বভাব। মুখ দিয়ে যেনো কামানের গোলা বের হয়। আমরা তাকে 'মাতব্বর' বলেই ডাকি।

আগে সে ডেক সিম্যান হিসেবে কাজ করতো, বেড়ে উঠেছে মধ্যপশ্চিমে। গ্র্যাজুয়েশনের পর যোগ দেয় নেভিতে। বিইউডি/এস-এ ঢোকার আগে রণতরীতে ক্রুমেটদের সাথে ঝগড়াঝাটি করেই সময় পার করেছে। চার্লি যেভাবে বলে তাতে মনে হয় রণতরীতে থাকাটা যেনো কোনো গ্যাংয়ে থাকার মতো ব্যাপার ছিলো। শিপে থাকার সময় কার সাথে কতোবার মারামারি করেছে, কোন বন্দরে কি দেখেছে এসব গল্প করতো সে। শিপে থাকাটা তার মোটেও পছন্দ ছিলো না। ওখান থেকে বের হবার জন্যই সিল হতে চেয়েছিলো।

আমাদের ক্লাসে চার্লি ছিলো সবার সেরা। যেমন স্মার্ট তেমনি আগ্রাসী স্বভাবের। গ্রীন টিমে ঢোকার আগে ইস্ট কোস্ট সিল-এর একজন ইন্সট্রাক্টর হিসেবে কাজ করেছে সে, সুতরাং তার জন্যে কিল- হাউস ডাল-ভাতের মতো ব্যাপার।

"মুভ কল দেই নি," বললাম তাকে।

"ভালো, সান ডিয়েগো'তে ফিরে গিয়ে রোদে গা পোড়াও," বললো সে। "অন্তত পরের বছরের ক্যালেন্ডারের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবে তাহলে।"

দু'জায়গায় সিল'দের বেস রয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়েগো আর ভার্জিনিয়া বিচে। এই দুই গ্রুপের মধ্যে বেশ ভালো প্রতিদ্বন্দ্বীতা হয়ে থাকে। এর কারণ ভৌগলিক আর জনমিতি। দুটো দলের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। এই দুই উপকূলের দুটো টিমের একই প্রশিক্ষণ আর দক্ষতা রয়েছে। তাদের মিশনগুলোও একই রকম হয়। কিন্তু ওয়েস্ট কোস্ট সিলদের রেপুটেশন হলো তারা একটু আয়েশী, আর ইস্ট কোস্টদের সুনাম হলো তারা কারহার্ট নামের কাপড়ের জন্য বিখ্যাত দক্ষিণাঞ্চলের বাসিন্দা।

আমি ছিলাম ওয়েস্ট কোস্টের সিল, সুতরাং চার্লির সাথে আমার একটু খুনসুটি হওয়াই স্বাভাবিক। আর এটা একটা ক্যালেন্ডার নিয়েই বেশি হতো।

"ঠিক বলেছি না, মি: মে?" নাক সিঁটকে বললো চার্লি।

আমি ওটাতে ছিলাম না, কিন্তু কয়েক বছর আগে আমার কিছু টিমমেট চ্যারিটির জন্য একটা ক্যালেন্ডার বের করে। সান ডিয়েগোর সমুদ্র তীরে দাঁড়িয়ে খালি গায়ের কিছু সিল'দের ছবি ছিলো তাতে। এটা করা হয়েছিলো গরীব মানুষের ক্যান্সার চিকিৎসার তহবিল গঠনের উদ্দেশ্যে, তাদের সেই প্রচেষ্টা হয়তো সফলও হয়েছিলো কিন্তু ইস্ট কোস্টের সিলরা এই ব্যাপারটা নিয়ে তখন থেকেই ঠাট্টা-তামাশা করতো আমাদের সাথে।

"চুনার মতো সাদা ইস্ট কোস্টের ছেলেদের নিয়ে কেউই ক্যালেন্ডার বানাতে চাইবে না," বললাম তাকে। "তুমি যদি সান ডিয়েগোর রোদে দাঁড়িয়ে শার্ট খুলে ফেলাটা খুব বেশি পছন্দ করে থাকো তো আমি খুবই দুঃখিত।"

এটা এমন একটা যুদ্ধ যার কোনো শেষ নেই।

"আমরা এটা আগামীকাল শুটিংরেঞ্জে গিয়ে মীমাংসা করবো," বললাম তাকে।

শুটিং হলো আমার সবচেয়ে শক্তিশালী জায়গা। গ্রীন টিমে চার্লি কিংবা তার মতো বড়মুখের কারো সাথে কথায় পেরে ওঠার ক্ষমতা আমার নেই। আমি সব সময়ই জানি আমার জোকগুলো খুব দূর্বল হয়ে থাকে। কথা না বাড়িয়ে পরের দিন শুটিংয়ে গিয়ে নিজের সেরাটা দেখানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। শুটার হিসেবে আমি ভালোই। আলাস্কায় শৈশব

কাটানোর ফলে বন্দুক ছিলো আমার নিত্যসঙ্গী। আমার বাবা-মা আমাকে কখনও খেলনার বন্দুক কিনে দেন নি কারণ এলিমেন্টারি স্কুল শেষ করার আগেই আমার নিজের একটি পয়েন্ট টু-টু বোরের রাইফেল ছিলো। ওটা সব সময় বহন করতাম। বেশ ছোটো থাকতেই আমি বন্দুক-পিস্তল বহন করার ব্যাপারে বেশ দায়িত্ব সচেতন ছিলাম। আমাদের পরিবারে অস্ত্র ছিলো একটি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম।

"অস্ত্রকে তোমার সম্মান দেখাতে হবে, এটা দিয়ে কি করা যায় সে সম্পর্কেও তোমাকে সচেতন থাকতে হবে," বাবা বলেছিলেন আমাকে।

কিভাবে গুলি করতে হয় এবং কিভাবে রাইফেলটা নিরাপদে রাখতে হয় সেটা তিনিই আমাকে শিখিয়েছিলেন। তার অর্থ এই নয় যে, আমি ভুল থেকে কিংবা কঠিন পরিস্থিতি থেকে কোনো শিক্ষা পাই নি।

বাবার সাথে এক শিকার অভিযানের পর খুব ঠাণ্ডা পড়লো, আমি আমার পরিবারের সাথে বাড়িতেই থেকে গেলাম। মা রান্নাঘরে ডিনার বানাচ্ছিলেন। আমার বোনেরা রান্নাঘরের টেবিলে বসে খেলছিলো। আমি হাতের দস্তানা খুলে আমার রাইফেলটা পরিস্কার করতে ব্যস্ত ছিলাম। কিভাবে রাইফেলের চেম্বার পরিস্কার করতে হয় সেটা বাবা আমাকে অনেকবার দেখিয়ে দিয়েছিলেন। খুব সাবধানে এ কাজ করতে হবে বলেও তিনি বলে দিতেন সব সময়। প্রথমে ম্যাগাজিন খুলে দেখতে হবে চেম্বারে কোনো গুলি আছে কিনা। থাকলে সেটা বের করে নিতে হবে। তারপর নিরাপদ জায়গায় তাক করে টৃগার টিপে টিপে পরীক্ষা করে দেখতে হবে সব ঠিকমতো কাজ করছে কিনা।

ঐ ঘটনায় আমি একটু বেখেয়ালে ছিলাম। চেম্বারে কোনো গুলি আছে কিনা চেক করে দেখি নি। ম্যাগাজিনটা বের করেই মেঝের দিকে তাক করে টৃগার চেপে পরীক্ষা করতে গেলাম। পুরো বাড়িটা কেঁপে উঠলো গুলির শব্দে।

বরফের মতো জমে গেলাম আমি।

আমার হৃদস্পন্দন হাতুড়ি পেটার মতো ধক ধক করে উঠলো। হাত পা কাঁপতে লাগলো। বাবার দিকে তাকালাম। তিনি মেঝের ফুটোর দিকে চেয়েছিলেন। মা আর বোনেরা দৌড়ে চলে এলো কী ঘটেছে তা দেখার জন্য।

"তুমি ঠিক আছো?" জিজ্ঞেস করলেন বাবা।

কোনোরকম হ্যা বলে রাইফেলটা আবার চেক করে দেখলাম ওটাতে তখনও কোনো গুলি রয়ে গেছে কি না। আমার হাত-পা তখনও কাঁপছে, আস্তে করে রাইফেলটা রেখে দিলাম।

"আমি দুঃখিত, বাবা," বললাম তাকে। "চেম্বারটা চেক করে দেখতে ভুলে গেছিলাম।"

আমি যারপরনাই বিব্রত। রাইফেল কিভাবে সামলাতে হয় সেটা আমি ভালো করেই জানতাম, তারপরও বেখেয়ালে ছিলাম বলে একটা ভুল করে বসি। বাবা তার নিজের রাইফেল পরিস্কার করে কোট খুলে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখলেন। তিনি মোটেও রাগ করেন নি। তিনি শুধু চেয়েছিলেন আমি যেনো বুঝি কী ঘটেছে। ভালো করেই জানতাম, তারপরও আমার পাশে এসে হাটু গেড়ে বসলেন তিনি। রাইফেলটা নিয়ে আবারো দেখিয়ে দিলেন কিভাবে পরিস্কার করতে হয়।

"তুমি কি ভুল করেছো সেটা আমাকে খুলে বলো," বললেন বাবা।

"ম্যাগাজিনটা বের করে চেম্বারটা খালি করতে হবে। চেক করে দেখতে হবে ওখানে আর কোনো গুলি আছে কিনা। তারপর নিরাপদ জায়গায় তাক করে টৃিগার টিপে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।"

ঐ একবারই আমি ভুল করেছিলাম। সেই ভুল থেকে আমি শিক্ষা নিয়েছি। এ জীবনে ওরকম ভুল আর করি নি।

ঠিক যেমনটি দ্বিতীয়বারের মতো ভুল করি নি মুভিং কল দিতে। কিল-হাউসে ঐ একবারই ভুলটা করেছিলাম।

গ্রীন টিমে থাকাকালীন ট্রেনিং চলার সময় আমাদের দিন শুরু হতো খুব ভোরে। প্রতি সকালেই আমরা ব্যয়াম করতাম। তারপর বাকি দিনটুকু ক্লাসের ত্রিশজনের মধ্যে অর্ধেক চলে যেতো শুটিং রেঞ্জে, বাকি অর্ধেক কিল-হাউসে। লাঞ্চের সময় আমাদের পালা বদল হতো।

শুটিংরেঞ্জটা ছিলো দুনিয়াসেরা। অন্যসব রেঞ্জের মতো লাইনে দাঁড়িয়ে টার্গেট শুটিং করার মতো নয়। আমাদেরকে দৌড়ে, হামাগুড়ি দিয়ে, ভাঙা গাড়ি, জ্বলন্ত টায়ার এরকম অনেক কিছুর আড়াল নিয়ে বিভিন্ন ধরণের টার্গেটে গুলি করতে হতো। সব সময়ই দৌড়ের উপর গুলি চালাতে হতো, সুস্থির হয়ে শুট করার কোনো সুযোগ নেই। এখানে আসার আগে বেসিক শুটিংয়ের প্র্যাকটিস করেই সবাই এসেছে, সুতরাং আমাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো যুদ্ধের ময়দান কিংবা উদ্ধার অভিযানে কিভাবে শুটিং করতে হয়। ইন্সট্রাক্টররা আমাদের হৃদস্পন্দন জোরালো করার জন্য কাজ করতেন, যাতে করে শুটিংয়ের সময় আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি।

আমদের ট্রেনিং ফ্যাসিলিটিতে দুটো কিল-হাউস ছিলো। একটা অপেক্ষাকৃত ছোটো, অন্যটি আকারে বড়। তবে প্রতিবারই এসব কিল-হাউসের ভেতরকার ডিজাইন বদলে ফেলা হতো। একটা লে-আউটে দু'বার অভিযান চালানো হতো না কখনও। ইন্সট্রাক্টররা দেখতে চাইতেন আমরা নতুন নতুন পরিবেশে কিভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারি।

ট্রেনিংয়ের গতি ছিলো খুবই দ্রুত। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ করতে ব্যর্থ হলে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হতো আগের ইউনিটে। তার মানে এক ধরণের ডিমোশন। রিয়েলিটি শো'য়ের মতোই প্রতি সপ্তাহে আমাদের সংখ্যা কমতে থাকতো। সত্যিকারের পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য আমাদেরকে প্রস্তত করার জন্যই এটা করা হতো। আমাদের মধ্যে একজন 'গ্রে ম্যান' ঢুকিয়ে রাখা হতো, তাকে চিহ্নিত করে নিষ্ক্রিয় করতে হতো আমাদের। দলের মধ্যে সবথেকে সেরাদের গ্রে ম্যান বানানো হতো না। আবার সবথেকে বাজে ফলাফল যে করেছে সেও হতো না। তার পারফর্মেন্স হতো মাঝারি গোছের। এই গ্রে ম্যানকে খুঁজে বের করার জন্য আমাদেরকে মাত্র কয়েক মিনিট সময় দেয়া হতো।

তাবুর নীচে আমরা একটা পিকনিক টেবিলে বসে ছিলাম। ইন্সট্রাক্টররা এসে সবাইকে এক টুকরো কাগজ দিয়ে গেলেন।

"টপ ফাইভ, বটম ফাইভ, জেন্টেলমেন," একজন ইন্সট্রাক্টর বললেন। "তোমাদের হাতে সময় মাত্র পাঁচ মিনিট।"

আমাদেরকে গোপনে দলের মধ্যে পাঁচজন সেরা এবং পাঁচজন বাজে পারফর্মারের নাম লিখে দিতে হবে। এটা করার কারণ, ট্রেনিংয়ের সময় ইন্সট্রাক্টররা আমাদের পারফর্মেন্স প্রত্যক্ষ করলেও বাকি সময়ে তারা আমাদের থেকে দূরে থাকতেন। আমরা নিজেদের মধ্যে কেমন আচরণ করি, কেমন সম্পর্ক বজায় রাখি সেটা তারা জানেন না। এমনও হতে পারে একজন সেরা পারফর্মার সবক্ষেত্রে বেশ ভালো কিন্তু ট্রেনিংয়ের বাইরে সে অন্যদের সাথে হয়তো খাপ খাইয়ে চলতে পারে না, মানিয়ে নিতে পারে না অনেক কিছু। ইন্সট্রাক্টররা আমাদের কাছ থেকে সেরা পাঁচ আর বাজে পাঁচজনের তালিকা নিয়ে নিজেদের করা তালিকার সাথে মিলিয়ে দেখবেন। আমাদের এই বিবেচনা কোনো ক্যান্ডিডেটের জন্য সর্বনাশ হয়ে পারে।

ক্লাসে কে ভালো আর কে খারাপ সেটা শুরুতে খুব পরিস্কার ছিলো। কিন্তু একে একে অনেকের প্রস্থান আর বাদ পড়ে যাবার পর কাজটা মোটেও সহজ থাকলো না।

চার্লি আমার লিস্টে সব সময়ই সেরা পাঁচের মধ্যে ছিলো। একই অবস্থা স্টিভের। চার্লির মতো সেও ইস্ট কোস্টের একজন সিল। উইকেন্ডে আর অবসরে আমি সব সময় ওদের সাথেই সময় কাটাতাম। কাজ না থাকলে স্টিভ সব সময় বই পড়তো। তার বেশিরভাগ বইই ছিলো সাম্প্রতিক বিষয়ের উপর প্রবন্ধ কিংবা রাজনৈতিক বিশ্লেষণধর্মী। তার বেশ ভালো ভালো বইয়ের সংগ্রহ ছিলো। সময় পেলেই ল্যাপটপে সেগুলো দেখতো। সিল হিসেবে

যেমন অসাধারণ, তেমনি রাজনীতি, অর্থনীতি এমনকি খেলাধুলা নিয়েও বেশ ভালো বলতে পারতো।

তার গড়ন ছিলো হালকা পাতলা, তবে সেটা সাঁতারুদের মতো নয়। অনেকটা ফুটবল খেলার ডিফেন্সিভ প্লেয়ারদের মতো। চার্লি সব সময় জোক করে বলতো, স্টিভকে নাকি দেখতে মেটে ইঁদুরের মতো লাগে।

সে হলো হাতেগোণা কয়েকজনের মধ্যে একজন যে আমাকে পিস্তলে হারিয়ে দিতো। প্রতিদিন কাজ শেষে আমি তার পিস্তলের স্কোরটা দেখতাম আমার চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে কিনা। চার্লির মতো স্টিভও গ্রীন টিমে আসার আগে ইস্ট কোস্টে একজন সিকিউবি ইন্সট্রাক্টর ছিলো। তিনটি ডিপ্লয়মেন্টে ছিলো সে। সম্মুখ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে এরকম খুব কম লোকই ছিলো ইস্ট কোস্টে, স্টিভ ছিলো সেই বিরলদের একজন। ঐ সময়টাতে ওয়েস্ট কোস্টের ছেলেদেরকেই কেবলমাত্র ইরাক আর আফগানিস্তানে পাঠানো হতো। ১৯৯০ সালের দিকে স্টিভকে বসনিয়ায় পাঠানো হয়। তার টিম প্রবল যুদ্ধের মুখে পড়েছিলো। ১১ই সেপ্টেম্বরের আগে কোনো সিলের জন্য এটা ছিলো বিরলতম ঘটনা।

চার্লি আর স্টিভ আমার লিস্টে সবার উপরে ছিলো। কিন্তু বাকিদের ব্যাপারে মূল্যায়নের কাজটা সহজ ছিলো না।

"বটম ফাইভ নিয়ে তো মহা ঝামেলায় আছি, " এক রাতে বলেছিলাম স্টিভকে। আমরা দু'জনেই বসে ছিলাম রেঞ্জ হাউস‌ের একটা টেবিলে নিজেদের রাইফেলগুলো পরিস্কার করছিলাম।

"গত সপ্তাহে তুমি কাদেরকে বটম ফাইভ-এ রেখেছিলে?" জানতে চাইলো সে।

কয়েকজনের নাম বললাম আমি, তাদের অনেকে আবার স্টিভের লিস্টেও ছিলো।

"এই সপ্তাহে কাকে ঐ তালিকায় রাখবো বুঝতে পারছি না," বললাম তাকে।

"কখনও কি নিজেকে ওখানে রাখার কথা ভেবেছো?" স্টিভ বললো।

"তিনটি নাম পেয়েছি। কিন্তু শেষের দুটো নিয়ে মনস্থির করতে পারছি না," বললাম তাকে। "মনে হয় আমরা আমাদের নামগুলোই ব্যবহার করতে পারি। অন্য কাউকে আর বাদ দিতে চাইছি না।"

আমি অবশ্য মনে করতাম না আমরা দু'জন ক্লাসে খুব খারাপ করেছি।

"আমি একটু ঝুঁকি নেবো," বললো স্টিভ। "আমাদের দরকার পাঁচটি নাম।"

কয়েক সপ্তাহ আগে আমরা বটম ফাইভের তালিকাটা ফাঁকা রেখে কাগজ জমা দেবার চেষ্টা করেছিলাম। ক্লাসে দাঁড়িয়ে ইন্সট্রাক্টরদের বিরুদ্ধাচারণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলান। সেটা ধোপে টেকে নি। আমাদেরকে সারা রাত শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। গাড়ি আর বাস ধাক্কা দিয়ে দিয়ে রাত শেষ করতে হয়। সারাদিনের ট্রেনিংয়ের পর একটু আরাম করার বদলে কপালে জোটে এই দুর্ভোগ।

ঐ শুক্রবার আমি আমার নিজের নামটাই বটম ফাইভে দিয়ে দিলাম। স্টিভও তাই করলো। সে ছিলো আমাদের ক্লাসের নেতা। সে যা বলতো বাকিরা মন দিয়েই শুনতো।

মিসিসিপিতে সিকিউবি ট্রেনিংয়ের পর আমাদের ক্লাসের এক তৃতীয়াংশ সদস্য বাদ পড়ে গেলো। যারা খুব দ্রুত আর অল্প সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হতো তারাই সবার আগে বাদ পড়তো। তারা যে বাকি পরীক্ষায় খারাপ করেছে তা বলা যাবে না। এদের মধ্যে অনেককেই আবারো বাছাই পরীক্ষায় ডাকা হতো।

নয় মাসের ট্রেনিংয়ের মধ্যে মাত্র তিন মাস অতিক্রান্ত হলো। পরবর্তী ছয়টি মাস খুব একটা সহজ হবে না। ট্রেনিংয়ের পর আমাদেরকে নেয়া হলো বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়করণ, স্থলযুদ্ধ আর যোগাযোগের উপর প্রশিক্ষণ দেবার জন্য।

সিল হিসেবে আমাদের আরেকটি মূল কাজ হলো বিভিন্ন ধরনের জাহাজ এবং রণতরীতে আরোহন করা। এটাকে বলি 'আন্ডারওয়ে'। কয়েক সপ্তাহ ধরে আমরা বিভিন্ন ধরনের জাহাজ, নৌকা আর কার্গোতে ওঠার প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। যদিও আমরা আফগানিস্তান আর

ইরাকেই বেশিরভাগ সময় নিযুক্ত ছিলাম তারপরও জলেতে স্বচ্ছন্দ থাকা দরকার। সমুদ্রে শত্রুপক্ষের বোট আর জাহাজ ফুটো করে ডুবিয়ে দেবার প্রশিক্ষণও আমাদের দেয়া হয়।

শেষ মাসে আমরা ভিআইপি সিকিউরিটির উপর অনুশীলন করেছি। আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইয়ের ফার্স্ট সিকিউরিটির সব কিছু ন্যস্ত ছিলো সিল কমান্ডের উপর। ট্রেনিংয়ে আমরা এসইআরই অর্থাৎ সার্ভাইভাল ইভেশন রেজিসটেন্স অ্যান্ড এস্কেপ-এর উপরেও অ্যাডভান্স কোর্স করেছি।

এই কোর্সের আসল লক্ষ্য হলো প্রচণ্ড শারিরীক আর মানসিক চাপকে সামলে ওঠা।

ইন্সট্রাক্টররা সবাইকে ক্লান্ত আর অধৈর্য করার চেষ্টা করতেন। খুব বাজে পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করতেন। এই একটা মাত্র উপায়েই সত্যিকারের যুদ্ধের অনুকরণ করতেন তারা। প্রতিটি অপারেশনের সফলতা আর ব্যর্থতা নির্ভর করবে আমাদের সিদ্ধান্ত নেবার উপরে। ওরকম সম্মুখযুদ্ধে দ্রুত আর সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে সফলতা প্রায় অসম্ভব। গ্রীন টিম বিইউডি/এস-এর চেয়ে একদমই আলাদা। কারণ এখানে সাঁতার কাটা, ঠাণ্ডার মধ্যে দৌড়ানো কিংবা শারিরীক পরিশ্রমের কাজগুলোতে পাস করাটাও যথেষ্ট নয়।

গ্রীন টিমে আসলে মানসিক দৃঢ়তার ব্যাপারটাই মুখ্য।

এ সময়ে আমরা কমান্ডের সংস্কৃতিটাও শিখে নিয়েছিলাম। কমান্ড করা হলে সঙ্গে সঙ্গে কাজে নেমে পড়তে হতো আমাদের। এক ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তত হয়ে নির্দিষ্ট একটা কাজ করতে হবে- এরকম আদেশ পাওয়ামাত্র আমরা প্রস্তত হয়ে কাজে নেমে পড়তাম। প্রতিদিন ছ'টার সময় একটি করে টেস্ট পেজ পেতাম। এইসব পেজার দিয়ে ইন্সট্রাক্টররা আমাদ্রের উপরে আরো বেশি চাপ তৈরি করতে পারতেন। বেশ কয়েকবার আমরা ভোর হবার আগেই পেজার পেতাম কাজে নেমে যাবার জন্য।

শনিবারের এক রাতে আমার পেজারটা বন্ধ ছিলো। এর শাস্তি হিসেবে আমাকে আমার সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে পিটি করতে হয়েছে। আসলে এটা করা হতো আমাদেরকে অভ্যস্ত করার জন্য। মিশনে থাকার সময় যেকোনো মুহূর্তে পেজ করে আমাদেরকে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্লেনে ওঠার জন্য প্রস্তত থাকতে বলা হবে। তো সেরকম একটি ডাক পাবার পর চলে এলাম পিটি গ্রাউন্ডে।

"তুমি কি মদ খেয়েছো নাকি," আমি শুনতে পেলাম অন্য আরেকজন ছেলেকে এক ইন্সট্রাক্টর বলছেন।

"অবশ্যই না। ব্যারাকে শুধু একটা বিয়ার খেয়েছিলাম," বললো সে।

সময় পেরিয়ে যাচ্ছে অথচ চার্লিকে দেখতে পেলাম না। বিশ মিনিট দেরি করে এলো সে। ইন্সট্রাক্টর তো মহাক্ষাপ্পা। সিদ্ধান্ত নিলেন চার্লিকে এক্ষুণি ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। ভাগ্য ভালো, শেষ পর্যন্ত গালাগালি আর ধমকানির মধ্যেই সেটা সীমাবদ্ধ রইলো। চার্লি রয়ে গেলো আমাদের ক্লাসে।

নয় মাসের ট্রেনিং শেষ হতে যখন মাত্র এক সপ্তাহ বাকি, তখন আমরা ড্রাফট নিয়ে একটা গুজব শুনতে পেলাম। স্কোয়াড্রন পূর্ণ করার জন্য ইন্সট্রাক্টররা পুরো ক্লাসকে বাঙ্ক করবেন। তারপর অ্যাসল্ট স্কোয়াড্রন মাস্টার চিফ গ্রীন টিম থেকে নতুন সদস্য নেবেন ক্লাসের জন্য।

এভাবেই পালাক্রমে নতুনদের ট্রেনিং আর ডিপ্লয়েমেন্ট চলতে থাকে। ড্রাফট করার পর গ্রীন টিমের ইন্সট্রাক্টররা একটি তালিকা পোস্ট করলেন। চার্লি আমি এবং আমার বেশিরভাগ বন্ধুবান্ধবই একই স্কোয়াড্রনে অন্তর্ভূক্ত হলাম।

"কংগ্র্যাটস," তালিকায় আমার নাম দেখে টম বললেন। "এখানে ইন্সট্রাক্টর পদে কাজ শেষ করে এই স্কোয়াড্রনের টিম লিডার হিসেবে যোগ দেবো আমি।"

যেকোনো সময় পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় সিল'দের ডিপ্লয়মেন্ট হয়ে থাকে। স্কোয়াড্রনের মূল প্রাণ হলো টিম, আর প্রতিটি টিমের লিডার হন সিনিয়র সিল অপারেটররা।

এক একটি টিমে আধ ডজনের মতো অপারেটর থাকে।

বেশ কয়েকটি টিম নিয়ে আবার একটি ট্রুপ গঠিত হয়। ট্রুপের নেতৃত্বে থাকেন একজন লেফটেনান্ট কমান্ডার। অনেকগুলো গ্রুপ নিয়ে গঠিত হয় একটি স্কোয়াড্রন। এর নেতৃত্বে থাকেন একজন কমান্ডার। অ্যাসল্ট স্কোয়াড্রনগুলোর সহায়ক শক্তি হিসেবে থাকে ইন্টেলিজেন্স এনালিস্ট আর সাপোর্ট পারসোনেল।

একবার টিমে ঢুকতে পারলে, ঠিকমতো কাজ করতে পারলে ধীরে ধীরে পদোন্নতি পেয়ে উপরের দিকে ওঠা যায়। বেশিরভাগ সময় একজন সদস্যকে একটি টিমেই রাখা হয়, তবে মাঝেমধ্যে গ্রীন টিমের ইন্সট্রাক্টরদের নির্দেশে অন্য টিমের সাথেও কাজ করতে হয় কিংবা যোগ দিতে হয়।

ড্রাফট হবার পরদিন আমি আমার সরঞ্জাম নিয়ে সেকেন্ড ডেকে গিয়ে উঠলাম। চার্লি আর স্টিভের সাথে ঢুকলাম স্কোয়াড্রনের টিম রুমে। রুমটা বিশাল। ছোট্ট একটি বার এবং রান্নাঘরও আছে। আমরা সবাই এক কেস করে বিয়ার কিনেছি। সেকেন্ড ডেকে আসার প্রথম দিনে এটা নাকি সবাই করে। ব্যাপারটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে!

আমাদের স্কোয়াড্রন এখন স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রইলো আফগানিস্তানে ডিপ্লয়েড হবার জন্য। গ্রীন টিমে আমার অনেক সঙ্গী সাথী এরইমধ্যে তাদের নিজেদের স্কোয়াড্রনের সাথে সাজসরঞ্জাম নিয়ে নতুন কোনো জায়গায় ডিপ্লয়েড হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে।

আমাদের পাশের ঘরেই কমান্ডার এবং মাস্টার চিফের অফিস। তাদের ঘরের বেশিরভাগ জায়গা জুড়ে বিশাল একটি টেবিল। বেশ কিছু ছোটো ছোটো কম্পিউটার টেবিলও রয়েছে সেখানে। ব্রিফ করার জন্য রয়েছে বিশাল একটি ফ্ল্যাটস্ক্রিন মনিটর। দেয়ালে রয়েছে আগের মিশনগুলোর অসংখ্য ছবি। সেইসাথে বসনিয়া থেকে জব্দ করা যুদ্ধাপরাধীদের ব্যবহার্য কিছু সামরিক জিনিস আর আফগানিস্তানের তালিবানদের থেকে উদ্ধার করা কিছু গ্রেনেড আর রকেট লাঞ্চার।

টেবিলে বসার পর সিনিয়রদের দিকে তাকিয়ে আমি কিছুটা অবাক। তাদের সবার লম্বা লম্বা চুল আর দাড়ি। হাতে ট্যাটু। খুব কমই ইউনিফর্ম পরা। গ্রীন টিমে শেষ দিকে আমরাও চুল-দাড়ি বড় বড় রেখেছিলাম। বিগত বছরগুলোতে গ্রুমিং স্ট্যান্ডার্ডে অনেক পরিবর্তন এলেও যুদ্ধের ময়দানে চুলদাড়ি নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামানো হয় না। তাদের মাথায় একটা জিনিসই থাকে -যুদ্ধক্ষেত্রে পারফর্মেন্স। আমরা একেকজন একেকরকম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছি, আমাদের জীবনযাপন, আচার, ব্যবহার আর অভ্যেস একরকম নয়। তবে আমাদের সবার এক জায়গায় মিল রয়েছে -দেশের মঙ্গলের জন্য নিজেদেরকে বিলিয়ে দিতে কার্পণ্য করবো না।

টিম রুমে সিনিয়ররা তাদের পরিচয় দিয়ে নিজেদের সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু পরিচিতি তুলে ধরলো। চার্লিই প্রথমে মুখ খুললো আমাদের মধ্যে। সিনিয়ররা একটু ঠাট্টা তামাশাও করলো। শেষে তারা আমাদের সাথে করমর্দন করে আমাদের সাজসরঞ্জাম ব্যাগ থেকে বের করতে সাহায্য করলো। খুব মজার সময় কাটলো আমাদের। সবাই এতোটাই ব্যস্ত ছিলো যে উদ্বিগ্ন হবার সুযোগই ছিলো না। একটা যুদ্ধ চলছে, সুতরাং নতুনদের স্বাগত জানানোর জন্য খুব বেশি সময় নষ্ট করা যায় না।

আমার কাছে মনে হলো আমি আমার নিজের বেসেই আছি।

নেভিতে যোগ দেবার পর এরকম একটি কমান্ডের অংশ হবার স্বপ্নই দেখে আসছিলাম। এখানে ভালো পারফর্মেন্সের কোনো শেষ নেই। কতোটা অবদান করতে পারো তারও কোনো সীমারেখা নেই। আমার সমস্ত ভয় আর উদ্বেগ তিরোহিত হলো পারফর্ম করার সুতীব্র ইচ্ছের কারণে।

এক বছর আগে তিনদিনের বাছাই পরীক্ষার সময় আমি শিখেছি শুধুমাত্র স্ট্যান্ডার্ড লেভেলে পৌঁছানোটাই যথেষ্ট নয়।

সাজসরঞ্জামগুলো বের করতে করতে বুঝতে পারলাম আবারো নিজেকে প্রমাণ করতে

হবে এখানে। গ্রীন টিমে সুযোগ পাওয়াটাই সব নয়। এই ঘরের সবাই একই কোর্স ভালোমতো শেষ করেছে। প্রতীজ্ঞা করলাম আমি আমার টিমের জন্য একটি সম্পদে পরিণত হবো, এরজন্য দিনরাত পরিশ্রম করবো।

সেকেন্ড ডেক

আফগানিস্তানে ডিপ্লয়েড হবার কয়েক সপ্তাহ আগে আমি আমার প্যাকিং লিস্ট প্রিন্ট করে নিলাম। এটা ২০০৫ সালের কথা। এশিয়ার ঐ দেশটিতে ওটাই আমার প্রথম ডিপ্লয়মেন্ট ছিলো। সিল টিম ফাইভ-এ থাকার সময় আমার প্রথম ডিপ্লয়মেন্ট ছিলো ইরাকে। লিস্টে বলা হলো আমাদেরকে কি কি জিনিসপত্র সঙ্গে নিতে হবে।

আমরা 'বিগ বয় রুলস'-এর অধীনে ছিলাম, এর মানে আমাদের বেশিরভাগ কাজ নিজেদেরকেই করতে হতো। টিমে ঢোকার পর আমিও নিজেকে স্বাবলম্বী করে তুলেছিলাম। পরবর্তী তিনমাস কঠোর পরিশ্রম করেছি নিজেকে টিমে একটি সম্পদ হিসেবে প্রমাণ করার জন্য। ওখানে থাকতে শিখলাম, প্রশ্ন করাতে কোনো দোষ নেই, কিন্তু কি ঘটছে না ঘটছে সে সম্পর্কে না জেনে সব সময় শুধু প্রশ্ন করাটা একদম বোকামি। আমি আমার প্রথম ডিপ্লয়মেন্টে কোনো ভুল করতে চাই নি, লিস্টে আছে এরকম কিছু জিনিস বাদ পড়ে যাক তা যেনো না হয়, তাই টিম লিডারের রুমে গিয়ে তাকে প্রশ্ন করলাম প্যাকিং লিস্ট সম্পর্কে।

"লিস্টে যা যা বলা হয়েছে তার সবই ব্যাগে ভরে নিয়েছি, ঠিক আছে না?" কফি মগ হাতে নিয়ে বললাম তাকে।

তিনি বসেছিলেন একটা কাউন্টার টেবিলে। তার হাতেওঁ কফি মগ ছিলো। কিছু কাগজপত্র দেখছিলেন মনোযোগ দিয়ে। দেখতে গাট্টাগোট্টা ধরণের। অন্য সবার মতো চুল-দাড়ি বড় বড় নয়, ক্লিন শেভ। খুব বেশি কথা বলার লোক নন তিনি। 'বিগ বয় রুলস' ব্যাপারটা উনি আবার সিরিয়াসলি নিয়ে নিলেন।

"নেভিতে কতোদিন ধরে আছো?" জিজ্ঞেস করলেন।

"ছয় বছর চলছে।"

"ছয় বছর ধরে সিল-এ আছো অথচ তুমি জানো না ডিপ্লয়মেন্টের সময় কি কি জিনিস সঙ্গে নিতে হয়?"

নিজেকে চরম বোকা মনে হলো।

"ডিপ্লয়মেন্টের সময় কি কি নেবে ব'লে মনে করো তুমি, অ্যা? সবকিছু গোছগাছ করে নাও," বললেন আমাকে। "তোমার যা দরকার বলে মনে করো তা-ই সঙ্গে নেবে।"

"চেক," বললাম আমি।

আমি আমার কেজ-এ ফিরে এলাম। কেজ বলতে লকারের কথা বলছি। প্রতিটি ডেভগ্রু সদস্যের একটি করে কেজ রয়েছে। ওখান থেকে আমার 'কিট'গুলো অর্থাৎ সরঞ্জামগুলো বের করে নিলাম একে একে। একটা ব্যাগে 'ক্লোজ কোয়ার্টার ব্যাটেল' অর্থাৎ সিকিউবি'র জন্য সবকিছুই রাখা আছে। আরেকটা ব্যাগে আছে এইচএএইচও (HAHO হাই অলটিচ্যুড, হাই ওপেনিং) অথবা যাকে আমরা সবাই বলি 'জাম্প গিয়ার'। এছাড়াও আরেকটি সবুজ রঙের ব্যাগে আছে আমার কমব্যাট সুইমার যাকে বলি 'ডাইভ সুট'। সবকিছু সুন্দরমতো গোছগাছ করে নিলাম। তবে গার্বার টুল নামে পরিচিত জিনিসগুলো মিশনে যাবার পর হাতে দেয়া হয়। এতে থাকে চাকু, স্ক্রু ড্রাইভার, কঁাচি আর ক্যান খোলার ওপেনার।

প্রত্যেক কে তার রাইফেলের জন্য একটা স্কোপ, একটা ফিক্সড ব্লেড নাইফ আর একসেট ব্যালেস্টিক প্লেট দেয়া হয়।

এসব জিনিস ঠিক ঠিক ব্যাগে ভরে নেয়াটা সহজ কাজ নয়।

ঐ দিন আমার টিম লিডার আমার কেজ-এ এসে চেক করে দেখলেন আমি সবকিছু ঠিকমতো গোছগাছ করেছি কিনা।

"নীচের সাপ্লাইরুমে গিয়ে প্রতিটি ব্যাগের জন্য একটি করে, গার্বার টুল নিয়ে আসো," বললেন তিনি।

বুঝতে না পেরে আমি তার দিকে চেয়ে রইলাম

“চারটা গার্বার টুল নিয়ে আসবো?”

“হুম। তোমার কাছে চারটা আলাদা আলাদা ব্যাগ আছে, সুতরাং প্রত্যেকটা ব্যাগের জন্য একটা করে গার্বার টুল লাগবে।" আমার টিম লিডার রিকোয়েস্ট ফর্মে সাইন করে দিলে আমি নীচে চলে গেলাম।

“তোমার কি লাগবে?” সাপোর্ট দলের একজন বললো আমাকে।

তাকে লিস্টটা দেখালাম।

“ঠিক আছে,” সঙ্গে সঙ্গে বললো সে। “আমি আসছি।”

কয়েক মিনিট পর একটা প্লাস্টিকের বিনে করে প্রয়োজনীয় সবকিছু নিয়ে ফিরে এলো সে। আমি আমার হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। এটা তো স্বপ্ন পূরণের মতো ব্যাপার। আমার আগের টিমে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্য হাজার হাজার ডলার খরচ করতে হতো।

আর্মোরিটা আরো ভালো। ওটার দরজায় লেখা “তুমি স্বপ্ন দেখবে, আর আমরা সেটা পূরণ করে দেবো।”

আমার মতো অস্ত্রপ্রিয় একজনের জন্য ওই জায়গাটা যেনো স্বর্গ। দুটো এম৪ অ্যাসল্ট রাইফেল পেলাম, একটার ব্যারেল চৌদ্দ ইঞ্চি লম্বা, অন্যটার দশ ইঞ্চি। আরো পেলাম এমপি৭ সাবমেশিনগান আর একসেট পিস্তল। তার মধ্যে একটা ছিলো সিগ সয়্যার পি ২২৬। প্রতিদিন আমি যে অস্ত্রটা ব্যবহার করি সেটা ছিলো হেকলার অ্যান্ড কচ ৪১৬। ওটার উপর 2.5X10 নাইটস্কোপ লাগিয়ে নিয়েছিলাম।

আরো পেলাম ইনফ্রারেড লেজার এবং থার্মাল সাইট। রাতের বেলায় এগুলো খুবই দরকারি জিনিস।

কোনো সন্দেহ নেই ডেভগ্রু’তে যেসব অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে সেগুলো সেরার মধ্যেও সেরা।

কমান্ড এলাকায় চলাফেরা করার সময় আশেপাশের ভবন থেকে গুলি করার শব্দ শোনাটা একেবারে স্বাভাবিক ব্যাপার। সারাক্ষণই ট্রেনিং চলতে থাকে ওখানে। পুরোপুরি সামরিক সাজে সজ্জিত হয়ে লোকজন এদিক ওদিক ছুটে যাচ্ছে-এমন দৃশ্য বিরল নয়। সবই আসল লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করার অংশ হিসেবে করা হয়।

২০০৫ সালে একদিন আমাদের টিমকে প্লেনে ওঠানো হলো আফগানিস্তানে পাঠানোর উদ্দেশ্যে। ঐ সময়টাতে আমাদের টিম আফগানিস্তান নিয়েই ব্যস্ত ছিলো কেননা ইরাকে মোতায়েন করা হয়েছিলো ডেল্টা ফোর্সকে।

ঐ বছর ডেল্টার সময়টা ভালো যাচ্ছিলো না। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাদের বেশ কিছু সদস্য নিহত হয়। তারা বাড়তি কিছু অ্যাসল্ট টিম চেয়ে অনুরোধ করলে ডেভগ্রু তাতে সাড়া দিয়ে আমাদের টিমকে নির্বাচন করে।

তবে আমার স্কোয়াড্রন চায় নি ডেল্টাতে আমার প্রথম ডিপ্লয়মেন্ট হোক। ফলে আফগানিস্তানে আমি আমার টিমের সাথে কিছুদিন এমনি এমনি ঘুরে বেড়িয়েছি। শেষ পর্যন্ত দু’জন সিল সদস্যসহ আফগানিস্তান ছেড়ে ইরাকে পাড়ি দিই ডেল্টাকে সাহায্য করার জন্য।

মাঝরাতের দিকে বাগদাদে পৌছাই আমরা। আমাদের হেলিকপ্টার অবতরণ করে গ্রীন জোন নামে পরিচিত এলাকায়। সময়টা ছিলো গ্রীষ্মকাল, প্রচণ্ড গরমে গায়ের চামড়া পুড়ে যাবার জোগাড় হলো। আদ্রতাও খুব বেশি। তবে পিকআপ ট্রাকে ওঠার পর খুব ভালো লাগলো। বাতাস ছিলো বেশ ঠাণ্ডা। ২০০৩ সালে সিল টিম ফাইভ-এর হয়ে বাগদাদে আমার প্রথম ডিপ্লয়মেন্টের সময় যেমনটি মনে হয়েছিলো ঠিক তেমনই মনে হলো। কোনো পরিবর্তন নেই। সবই যেনো চেনা।।

ইরাক আক্রমণের পর পরই আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। ইরাকের রাজধানী থেকে উত্তর-পূর্ব দিকের মুকাতায়িন জলবিদ্যুৎ বাধ রক্ষা এবং এর নিরাপত্তার কাজে আমাদেরকে নিয়োগ করা হয়। আমাদের চেইন অব কমান্ড আশংকা করছিলো যে, পিছু হটতে থাকা

ইরাকি সেনাবাহিনী হয়তো এই বাধটি ধ্বংস করে দেবে যাতে করে আমেরিকানদের সমস্যা হয়।

পরিকল্পনাটি ছিলো খুবই সহজ সরল। আমরা সরাসরি ওখানে চলে যাবো হেলিকপ্টারে করে, অবতরণ করবো বাধের উপর। তারপর বিভিন্ন পজিশনে অবস্থান নিয়ে সুরক্ষার ব্যাপারটি নিশ্চিত করবো।

প্রথম অপারেশনের আগে আমার মধ্যে খুব উত্তেজনা দেখা দিলো। হয়তো আমি কিছুটা নার্ভার্সও ছিলাম।

কয়েক ঘণ্টার উড়ানে চলে গেলাম সেখানে। আমার দলের কুড়িজন সদস্য একটা হেলিকপ্টারের ভেতর ঠাসাঠাসি করে বসেছিলো। ঘটনাস্থলের কাছাকাছি চলে আসার পর সিগন্যাল দেয়া হলো আমাদেরকে।

"দু' মিনিট বাকি," এঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে ক্রু চিফ চিৎকার করে বললো। হেলিকপ্টারের ভেতরে লাল বাতি জ্বালিয়ে দেয়া হলো সে সময়। সময়টা ছিলো মাঝরাতের দিকে।

দরজার কাছে গিয়ে দড়িটা ধরলাম আমি। এঞ্জিনের প্রচণ্ড শব্দের কারণে আর কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না। দলের অন্য সবার মতো আমার পরনে ছিলো কেমিক্যাল সুট, অস্ত্রশস্ত্র আর সরঞ্জামের ভারি একটি ব্যাগ।

আমাদের সঙ্গে কয়েক দিনের খাবারদাবার আর জলও ছিলো। আমরা জানতাম না ওখানে কতোদিন থাকতে হবে। নিয়মটা ছিলো "নিশ্চিত হতে না পারলে লোড কমিয়ে নাও।" এটা তো ঠিক, যতো বেশি বহন করা হবে ততো বেশি ঝুঁকি বাড়বে। তোমার গতি হয়ে পড়বে ধীর, আক্রমণের সময় দ্রুত পজিশনে যাওয়াটাও সম্ভব হবে না।

হেলিকপ্টারটি শূন্যে ভেসে থাকা শুরু করলে আমি দড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলাম। আমরা প্রায় ত্রিশ ফিট উপরে ছিলাম। যখন জমি স্পর্শ করলাম মনে হলো কয়েক টনের জিনিসপত্র নিয়ে আছাড় খেলাম। আমার পা দুটো ভীষণ ব্যথা করলো। তারপরও আমার থেকে একশ' গজ দূরে গেটের দিকে ছুটে যেতে হলো সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু হেলিকপ্টারের ঘুর্ণায়মান রোটরের কারণে ধুলোবালি উড়তে শুরু করলো, চোখের সামনে গেটটা দেখতে পেলাম না। তারচেয়েও বড় কথা বাতাসের বেগ আমাকে ঠিকমতো দৌড়াতেও বাধা দিচ্ছিলো। অনেক কষ্টে বন্ধ দরজার সামনে চলে এলাম।

বাকিরা সবাই আমার পেছনেই ছিলো। বোল্ট কাটার দিয়ে দরজার তালাটা দ্রুত খুলে ফেললাম, তারপর ভালো করে চারপাশটা দেখে কতোগুলো ভবনের দিকে এগিয়ে চললাম টিমের বাকিদের নিয়ে। মেইন বিল্ডিংটা দোতলা। কংক্রিটের কাঠামো আর লোহার দরজা। আমার টিমমেটরা আমাকে কভার দিলে আমি দরজাটায় হাত দিয়ে দেখলাম সেটাতে তালা মারা নেই। জানতাম না সুদীর্ঘ হলের ভেতর ঢোকার পর কি দেখতে পাবো। এখন যেকেনো সময় গোলাগুলি শুরু হয়ে যেতে পারে।

সামনের দিকে এগিয়ে যাবার সময় অনেকগুলো রুম দেখতে পেলাম দুদিকে। আরেকটু সামনে এগোতেই দূরের একটি থেকে কিছু নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। প্রথমে দুটো হাত দেখা গেলো। এরপর বেশ কয়েকজন ইরাকি গার্ডকে দেখা গেলো আসতে। সবার হাত উপরের দিকে তোলা। সবাই নিরস্ত্র।

আমার টিমের কয়েকজন তাদেরকে ঘিরে ধরে রাখলে আমি হলের সামনের দিকে আরেকটু এগিয়ে গেলাম। ঘরের ভেতরে তাদের একে-৪৭ রাইফেলগুলো দেখতে পেলাম পড়ে আছে। কোনোটার চেম্বারেই গুলি নেই। মনে হয় তারা ঘুমিয়ে ছিলো। হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনে ঘুম থেকে উঠে আর অস্ত্র হাতে নেবার সময় পায় নি।

ভবনের আকার অনেক বড় হওয়াতে সবগুলো ঘর ক্লিয়ার করতে অনেক সময় লেগে গেলো। আমাদের বিশেষ নজর ছিলো বিস্ফোরকের দিকে। বাধটি উড়িয়ে দেবার জন্য কোথাও বিস্ফোরক রাখা আছে কিনা খতিয়ে দেখতে হয়েছিলো। এরকম বিরাট এলাকা এর আগে কখনও ক্লিয়ার করার কাজ করি নি তাই ধারণার চেয়েও সময় একটু বেশি লাগলো।

আমাদের কেউ আহত হয় নি এই অপারেশনে, শুধুমাত্র একজন জিআরওএম কপ্টার থেকে নীচে নামতে গিয়ে গোড়ালি মচকে ফেলে।

মেইন বিল্ডিংটা ক্লিয়ার করার পর আমাদের প্লাটুন চিফ আমার কাছে এলেন।

"এই যে, আমার রেডিওটা একটু চেক করে দেখো তো," বললেন তিনি। "এটা তো কাজ করছে না।"

আমরা এখানে নামার সময় তিনি রেডিওটা কোমরের বেল্টের সাথে আটকে রেখেছিলেন। আমার সামনে আসতেই দেখতে পেলাম ওনার হেডফোনটা কাঁধ থেকে ঝুলছে। আমি তার পেছনে দেখতে পেলাম পুরো সেটটাই নেই। উধাও হয়ে গেছে। শুধু তারগুলো রয়ে গেছে।

"আপনার তো ব্যাকপ্যাকই নেই," বললাম তাকে।

"নেই?! নেই মানে কি?" বললেন তিনি।

"মানে ওটা নেই। কোথাও পড়ে গেছে।"

উনি ব্যাকপ্যাকটা বডি আর্মোরের সাথে ঠিকমতো লাগান নি। সম্ভবত হেলিকপ্টারের রোটরের বাতাসে ওটা ছিটকে পড়ে গেছে বাধের নীচে জলরাশিতে। একই ঘটনা ঘটলো আমাদের ডাক্তারের বেলায়। তার ব্যাকপ্যাক এ অনেকগুলো ওষুধ ছিল। সেই প্যাকেটটাও ওভাবে পড়ে গেছে কোথাও।

ঐ মিশনে আমরা এমন অনেক সরঞ্জাম ব্যবহার করেছিলাম যেগুলো আমাদের কাছে একদম নতুন ছিলো। আমাদের ডিপ্লোময়মেন্টের ঠিক আগমুহূর্তে ওগুলো দেয়া হয়। একটা মন্ত্র ছিলো আমাদের "যে সরঞ্জাম তুমি এর আগে ব্যবহার করো নি, তা নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যেয়ো না। আমরা সেই মন্ত্র পালন করি নি। তবে আমাদের ভাগ্য ভালো, এতে করে বড় কোনো সমস্যায় পড়তে হয় নি। এটা ছিলো আমাদের প্রথম শিক্ষা।

ঐ মিশনে আমরা আরো বেশি ভাগ্যবান ছিলাম অন্য একটা কারণে। বাঁধের খুব কাছে ইরাকিরা অ্যান্টিএয়ারক্রাফট গান স্থাপন করেছিলো। গার্ডরা যদি ওভাবে আত্মসমর্পণ না করে লড়াই করতো তাহলে আমাদের হেলিকপ্টারটাকে খুব সহজেই ভূপাতিত করতে পারতো তারা।

ঐ মিশনে আমরা অনেক শিক্ষা পেয়েছি। কোনো টার্গেট এলাকায় যাওয়ার আগে ভালো ইন্টেলিজেন্স দরকার। যাইহোক, কোনো রকম প্রাণহানি ছাড়াই আমরা এসব শিক্ষা লাভ করি। সচরাচর যেমনটি হয়, কঠিন মুহূর্তেই বড় শিক্ষাটা হয়ে থাকে। তবে ভাগ্যের উপর ভর করে বেঁচে যাওয়াটা আমার একদম পছন্দ না। এটা আমার অহংবোধে আঘাত করে।

তিনদিন পর যখন হেলিকপ্টার আমাদেরকে কুয়েতে নিয়ে গেলো তখন বুঝতে পারলাম, আমার সিল টিম ফাইভ-এর টিমমেটদের যতো অভিজ্ঞতাই থাকুক না কেন এ ধরণের পরিস্থিতির জন্য আমরা একেবারেই আনাড়ি। কুয়েতের মাটিতে ঐ রেইডটা ছিলো আমাদের সবার জন্য প্রথম একটি অভিজ্ঞতা।

ডেল্টা

দুই পর বছর আবার বাগদাদে ফিরে গেলাম। আগের চেয়ে অনেক অভিজ্ঞই বলা যায় আমাকে তবে সেটাও খুব বেশি নয়। আমাকে বাছাই পরীক্ষায় উতরে গ্রীন টিমে ঢুকতে হয়েছে। তারপরও আমি নবীন একজন। অন্তত এরকম জায়গায়।

গ্রীন জোন-এর মধ্যেই ডেল্টার বেইসটা স্থাপিত। ওটা টাইগ্রিস নদী তীরবর্তী এলাকা। শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থল। ওখান থেকে খুব কাছেই দুই তলোয়াড়ের সেই বিখ্যাত ভিক্টোরি প্যারেড গ্রাউন্ডটি। ইরান-ইরাক যুদ্ধে 'বিজয়ী' হবার পর বানানো হয়েছিলো। দিনের বেলায় অনেক সৈনিককে দেখা যেতো ঐ মনুমেন্টটার সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে।

ডেল্টার হেডকোয়ার্টারটি অবস্থিত সাবেক বাথ পার্টির ভবনে। আমি ওখানকার জয়েন্ট অপারেশন সেন্টারে গেলাম। আমার নতুন টিম লিডার জন আমার সাথে দেখা করার জন্যে চলে এলেন একটু পরই। আমি একেবারেই নতুন একজন। কোনো ধারণাই নেই কি দেখবো, বা কি করতে হবে।

ডেল্টায় ঢোকার আগে রেঞ্জারে ছিলেন জন। বেশ বড়সড় বুকের ছাতি আর শক্তিশালী বাহুর অধিকারী তিনি। গালে বাদামী রঙের লম্বা দাড়ি। তাকে দেখে লর্ড অব দি রিঙ-এর বামন গিমলির মতোই লাগে, তবে তার উচ্চতা একটু বেশি, এই যা।

"এই স্বর্গে তোমাকে স্বাগতম," আমাকে দেখেই বললেন তিনি।"গরমটা কি বেশি মনে হচ্ছে তোমার কাছে?"

"আপনাদের তো এসি আছে," বললাম তাকে। "এর আগে যখন এখানে ছিলাম তখন একটা তাবুতে থাকতে হতো আমাদের। বেশ কয়েক সপ্তাহ পরও এসি জোটে নি।"

"এখানে অবশ্য একটু ভালো থাকার ব্যবস্থা আছে," তিনি আমাদের ঘরের দরজা খুলে দিলেন।

ঘরটা আসলে একটি প্রাসাদ ভবন। হলওয়েগুলো বেশ চওড়া, মার্বেলের মেঝে আর উচু ছাদ। তাদের টিমের নতুন কিছু ছেলেদের সাথে আমি আর টিম লিডার এই ঘরেই থাকবো। এককোণে আমার বাঙ্ক খাটটি দেখিয়ে দিলেন তিনি। ব্যাগ আর সরঞ্জাম বিছানার পাশে রেখে ঘরের বাইরে চলে এলাম জনের সাথে। তিনি আমাকে প্রাসাদটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন।

প্রাসাদে নিজস্ব জিম, খাওয়ার ঘর আর সুইমিংপুল রয়েছে। আসলে একটা নয়, বেশ কয়েকটা সুইমিংপুল আছে ওখানে।

প্রতিটি টিমকে দুটো করে রুম দেয়া হয়। একটি টিমে ছিলো পাঁচজন করে। তাদের মধ্যে একজন ছিলো সাবেক ব্রিটিশ রয়্যাল মেরিনের একজন সদস্য, যার ছিলো দ্বৈত নাগরিকত্ব। যুক্তরাষ্ট্রে এসে ডেল্টাতে যোগ দেয় সে। বাকিরা জনের মতো সাবেক রেঞ্জার্স কিংবা স্পেশাল ফোর্সের সদস্য। নতুন একটি ছেলে ছিলো সেখানে, সোমালিয়াতে ব্ল্যাকহক ডাউন-এর ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলো সে। দেখতে একেবারে অ্যামিশ'দের মতো, বৌল-কাট চুল আর লম্বা দাড়ি। সব সময়ই চুপচাপ থাকতো।

দলের সবার সঙ্গে হাই-হ্যালোর পর নিজের সরঞ্জামগুলো ঠিকমতো সাজিয়ে নিলাম আমি। এভাবেই কেটে গেলো বাকি রাতটুকু। বেশিরভাগ সময় আমাদের কাজ করতে হতো রাতের বেলায়। দিনে সাধারণত আমরা ঘুমিয়ে কাটাতাম। অনেকটা ভ্যাম্পায়ারদের মতো! আমাদের ঘরে একটা সোফা আর টিভি সেটও ছিলো। এক কাপ কফি নিয়ে টিভি দেখার সময় জন এলেন আমার কাছে। "তোমাকে আমরা আগামীকাল অ্যাটাচ করছি," বললেন জন। "তোমার কখন কি লাগে আমাকে বোলো।"

"ধন্যাবাদ," বললাম তাকে।

"আমরা খুব ব্যস্ত থাকি," জন বললেন। "আজকে অবশ্য কোনো কাজ নেই। খুবই বিরল

একটি দিন। আমি নিশ্চিত আগামীকাল আমাদেরকে বের হতে হবে।”

সেখানে সময়গুলো কাটতো একঘেয়েমিতে। বেশিরভাগ সময় ঘুম থেকে উঠতাম দুপুরের দিকে, তারপর সুইমিংপুলের আশেপাশে আইপড নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম। রেড হট চিলি পেপার্স কিংবা লিংকিন পার্ক-এর গান শুনতাম হালকা ব্যয়াম করার সময়। কিছুদিন এভাবে কাজহীন ঘুরে বেড়িয়েছি। আমার এক টিমমেট পুলের আশেপাশে ঘাসের যত্ন নিতে শুরু করে। এটা তার শখে পরিণত হয়। বালি আর রুক্ষ্ম একটি দেশ, সবুজ ঘাস খুব একটা চোখে পড়ে না। সুতরাং পুলের পাশে সামান্য কিছু ঘাসের উপর হেটে বেড়াতে ভালোই লাগতো।

এরপর আমি ব্রেকফাস্ট করে জিমে চলে যেতাম। সন্ধ্যার পর শুরু হতো আমাদের ডিউটি। ডিউটি বলতে সন্দেহজনক কিছু জায়গায় টহল দেয়া, টার্গেট খুঁজে বের করা।

আমি ছিলাম “রুফ টিম”-এর অংশ। এর মানে আমরা এমএইচ৬ হেলিকপ্টারে করে টার্গেট করা কোনো ভবনের ছাদে নেমে যেতাম। তারপর প্রতিরোধের মুখোমুখি হলে লড়াই করতে করতে নীচে চলে আসতাম পুরো টিম নিয়ে। বাকি ফোর্সগুলো আর্মারড যানবাহনে করে ঘটনাস্থলে চলে আসতো। তাদের সহযোগীতায় আমরা ঐ এলাকাটি ক্লিয়ার করতাম।

আমি ওখানে পৌছানোর কয়েক দিন পর এক রাতে শুধু এঞ্জিন আর বাতাসের শব্দ শুনতে পেলাম চারপাশে। ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে বাতাস বইছিলো। নিজের সিটে বসে থাকতেও কষ্ট হচ্ছিল। জানতাম, শান্ত মনে ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেয়াটাই হলো আসল কথা। তবে রোলার কোস্টারের মতো পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেয়াটা সহজ নয়।

আমি আমার সেফটি বেল্ট পরীক্ষা করে দেখলাম হেলিকপ্টারের হলে ভেতরে আঙটার সাথে ঠিকমতো লাগানো আছে কিনা। তা না হলে টালমাটাল কপ্টার থেকে যেকোনো সময় ছিটকে বাইরে পড়ে যেতে পারি। নাইটভিশন গগলস পরে বাইরে চেয়ে দেখি, আরেকটা হেলিকপ্টার থেকে কয়েকজন ডেল্টা আমার দিকে চেয়ে আছে। তাদের স্যালুটের জবাব দিলাম তার আমি।

আমার নীচে শহরের বাড়িঘর আর পথঘাটগুলো যেনো হিজিবিজি দাগের মতোই দেখাচ্ছে। আমি বসে ছিলাম ককপিটের খুব কাছেই। আমার পাশেই ছিলেন জন।

“এক মিনিট,” শুনতে পেলাম আমার রেডিও'তে পাইলট বলছে। সে দরজার দিকে আঙুল তুলে আমাকে দেখালো।

দেখতে পেলাম কো-পাইলট তার লেজার বিম নিক্ষেপ করেছে শত শত ভবনের মধ্যে একটি টার্গেট ভবনের উপর। আমার কোনো ধারণাই ছিলো না এ রকম কাজ তারা কিভাবে করতো। উপর থেকে তো সবগুলো ভবন একই রকম দেখায়।

ঐ ভবনের ফাঁকা ছাদের দিকে এগিয়ে গেলো আমাদের কপ্টারটি। এখানে অবশ্য দড়ি বেয়ে নামার দরকার ছিলো না। পাইলট তার কপ্টারটি ছাদের উপর কিছুক্ষনের জন্য ল্যান্ড করতেই আমরা সবাই নেমে যাবো। দশ সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে আমরা চারজন কপ্টার থেকে নেমে গেলাম। কপ্টারটা সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলো সেখান থেকে।

দরজার কাছে গিয়ে একজন বোমা রেখে বিস্ফোরণ ঘটালে দরজাটা উড়ে গেলো। কয়েক সেকেন্ড পর নীচ তলায় আরেকটি বিস্ফোরণের শব্দ হলো, এরপরই গোলাগুলি।

জনের নেতৃত্বে আমরা চারজন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলাম।

“আমরা অন্য বিল্ডিংয়ের ছাদে নেমেছি,” কয়েক ধাপ নীচে নেমে বললেন জন।

পাশের ভবন থেকে গোলাগুলির শব্দ আসছে। বেশ কয়েকটি গ্রেনেড বিস্ফোরণ হলে আমরা দৌড়ে ছাদের এককোণে দৌড়ে চলে এলাম। “একটা বিল্ডিং পরেই আমাদের টার্গেট বিল্ডিংটা,” বললেন জন।

পাশের ভবনে আমাদের টিমমেটদের কিভাবে সাহায্য করা যায় সেটা খতিয়ে দেখতে শুরু করলাম আমরা। দেখা গেলো পাশের ভবনে লাফিয়েই চলে যাওয়া যাবে।

আগেও বলেছি উপর থেকে সবগুলো ভবনকে দেখতে একরকম লাগে।

দিয়েছে। আমরা দক্ষিণ দিক দিয়ে অelattook লাগে। আর প্রথমবারের মতো পাইলট আমাদেরকে ভুল জায়গায় নামিয়ে দিয়েছে। টার্গেট ভবনের উত্তর দিক দিয়ে যাবো বলে পাশের ভবনে ল্যান্ড করলাম সদলবলে।

"আমাদেরকে পাশের ভবনে চলে যেতে হবে," বললেন জন। "এখানে থাকলে ওদের কোনো সাহায্যে আসতে পারবো না।"

পাশের ভবনটি তিনতলা। টার্গেট ভবনের পূর্ব দিকে সেটা অবস্থিত।

এই ভবনের কারণে টার্গেট ভবন থেকে আমাদেরকে দেখা যাচ্ছে না। এটা আমাদের কভার করার কাজ করছে।

"আমাদের একটা ঈগল ঘায়েল হয়েছে," রেডিও'তে বলতে শুনলাম আমি। তার মানে আমাদের মধ্যে কেউ গুলিবিদ্ধ হয়েছে। পরে দেখা গেলো এক ডেল্টার ঊরুতে গুলি লেগেছিলো। বাকিদের শরীরে গ্রেনেডের স্প্রিন্টার লেগেছিলো কমবেশি।

টার্গেট ভবন থেকে সশস্ত্র যোদ্ধারা গ্রেনেড ছুড়ে মারছে সিঁড়ির দিকে, ফলে আমাদের অপারেটররা দ্রুত উপরের দিকে উঠতে পারছে না। গ্রাউন্ড টিম আহতদের মেডিকেল সাপোর্ট পাঠাতে শুরু করেছে, সিঁড়ি থেকে পিছু হটে গেছে তারা। আমরা পুরো ব্লকটি ঘুরে টার্গেট ভবনের পূর্বদিকের একটি তিনতলা ভবন ক্লিয়ার করে ফেললাম। চারপাশে প্রচণ্ড গোলাগুলি আর বিস্ফোরনের শব্দ হচ্ছে। ভবনের ছাদ থেকে আমরা টার্গেটদের চিহ্নিত করতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পর পর ঐ ভবনের তিনতলার জানালা দিয়ে ইরাকি যোদ্ধারা একে৪৭ রাইফেল তাক করে ব্রাশ ফায়ার করে যাচ্ছে।

গুলি করার সময় "আল্লাহু আকবর" চিৎকার করছিল তারা। পরিস্থিতিটা যেনো জট পাকিয়ে গেছে। কোনো অগ্রগতি নেই, অবনতিও নেই। গ্রাউন্ডে থাকা টিমের পক্ষে সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না, আবার আমাদের পক্ষেও ঐ ভবনের ছাদে নামার কোনো উপায় নেই। রেডিওতে শুনতে পেলাম দশ ব্লক দূরে একটি আর্মি মেকানাইজ ইনফ্যান্ট্রি ইউনিটকে ডাকা হচ্ছে। তারা আউটার রিং সিকিউরিটি দিয়ে থাকে।

আমাদের দুই রিংয়ের সিকিউরিটি থাকতো। ঐ রাতে সবচেয়ে কাছে ছিলো রেঞ্জার্সদের একটি স্কোয়াড। টার্গেট এরিয়ার কর্নারগুলোতে তারা অবস্থান নিয়েছিলো। এক মাইল দূরে এম১ ট্যাঙ্ক আর ব্রাডলি ফাইটিং সাজোয়া যান টহল দিচ্ছিলো। তাদের কাছে ছিলো ২০এম এম গান।

"একটা ব্র্যাডলিকে আসতে বলো, "রেডিওতে বলতে শুনলাম।

ভবনের কাছে ব্র্যাডলিটা চলে এলে এঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেলাম আমি।

"ঐ তিনতলাটা গুড়িয়ে দাও," অ্যাসল্ট লিডার ব্র্যাডলির কমান্ডারকে চিৎকার করে বললেন। লোকটা সাজোয়া যানের ছাদের উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলো।

ভবনের পাশের দেয়াল ভেঙে ঢুকে পড়লো সেটা, তারপর ভেতরের প্রাঙ্গনে এসে ২০ মিমি-এর কামান থেকে গুলি ছোড়া শুরু করলো। তিনতলার দেয়ালগুলো ঝাঁঝরা করে ফেলা হলো মুহূর্তে। বড় বড় ফোকর তৈরি হলো দেয়ালে।

আমি দেখতে পেলাম অ্যাসল্ট লিডার দৌড়ে ব্র্যাডলির দিকে যাচ্ছেন।

"ফায়ার করতে থাকো," চিৎকার করে কমান্ডার বললেন।

"কি?" গানার বুঝতে না পেরে বললো।

"পুরো তিনতলাটা গুড়িয়ে দাও," আবারো বললেন লিডার। "মাটির সাথে মিশিয়ে দাও ওটাকে।"

ব্র্যাডলি থেকে আবারো ফায়ার করা হলে এক যোদ্ধা চিৎকার করে বললো, "আল্লাহু আকবর!" সঙ্গে পাল্টা গুলি ছোড়া হলো জানালা দিয়ে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই উইনচেস্টার অবস্থায় পৌছে গেলো সাজোয়া যানটি। মিলিটারি পরিভাষায় এর অর্থ হলো গুলি ফুরিয়ে যাওয়া। আমরা আরেকটি ব্র্যাডলিকে ডেকে আনলাম, সেটাও গুলি ফুরিয়ে যাবার আগ পর্যন্ত ফায়ার করে গেলো।

দ্বিতীয় ব্র্যাডলিটা চলে যেতেই তিনতলা থেকে সমানে গুলি ছুড়তে শুরু করলো যোদ্ধারা। জানালা দিয়ে কালো ধোয়া বের হতে দেখা গেলো। আমরা পাশের ভবনের ছাদ থেকে যোদ্ধাদের চিৎকার শুনতে পারলেও কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না কালো ধোয়ার কারণে।

হঠাৎ একজনের হাত মাথা আর শরীরের অর্ধেকটুকু দেখতে পেলাম জানালার সামনে। .

কোনো কিছু না ভেবে আমি আমার লেজারটা তার দিকে তাক করে গুলি করলাম। বুলেটের আঘাতে সে ঘরের ভেতর মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো, হারিয়ে গেলো ধোয়ার মধ্যে।

গুলি করা শেষ হলে জন আমার পাশে দৌড়ে চলে এলেন। “কিছু পেলে?”

“জানালা দিয়ে একজনকে দেখতেই গুলি করেছি।”

“মারতে পেরেছো?”

“হ্যা, আমি একদম নিশ্চিত,” বললাম তাকে।

“ঠিক আছে। এখানেই থাকো।”

জন তার নিজের জায়গায় ফিরে গেলে আমি নতুন টার্গেট খুঁজতে শুরু করলাম। খুন খারাবি নিয়ে ভাবার মতো বিলাসিতা দেখানো কিংবা সময় ছিলো না আমার। কোনো অনুভূতিই হচ্ছিলো না। ওটাই ছিলো আমার হাতে প্রথম কারোর নিহত হবার ঘটনা। এ নিয়ে আমার মধ্যে অনুতাপও ছিলো না। ভালো করেই জানতাম ভবনের ভেতরে থাকা ঐসব লোকজন আমাকে, আমার দলের লোকজনকে বাগে পেলে ছেড়ে দেবে না। ওদের কাছ থেকে আমরা যেমন কোনো অনুকম্পা পেতাম না তেমনি আমাদের কাছ থেকেও ওরা কোনো ছাড় আশা করতে পারে না। এটা যুদ্ধ। দর্শন আর নীতিবাক্য কপচানোর জায়গা এটা নয়।

দু দুটো ব্র্যাডলি গুলি করার পরও ভবনের ভেতর থেকে আমরা চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পাচ্ছিলাম, সেইসাথে পাল্টা গোলাগুলি। টেকনিক্যালি, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে অ্যাসল্ট করাটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ছিলো।

“তারা বিল্ডিংটা উড়িয়ে দেবে,” বললেন জন।

বিস্ফোরণের হাত থেকে আমাদের সুরক্ষা করার জন্য ভবনের ছাদ থেকে সরিয়ে ফেলতে চাইলেন তিনি। বাকিদের সাথে আমরা গ্রাউন্ডে যোগ দিলাম। দেখলাম ডেল্টার এক্সপ্লোসিভ অর্ডান্স ডিসপোজাল ইউনিটের একজন ভবনের নীচতলায় গিয়ে থামোভারিক বোমা পুঁতে এলো। এই বোমা বিস্ফোরিত হলে প্রচণ্ড শকের সৃষ্টি হয়, ফলে পুরো ভবনটি ধ্বসিয়ে দিতে পারবে।

কয়েক মিনিট পরই কাউন্টডাউন করা শুরু হলো। আমি বিস্ফোরণের জন্য অপেক্ষা করলাম।

কিন্তু কিছুই হলো না।

সবাই ইওডি টেকনিশিয়ানের দিকে তাকালো। আমরা কেউ বুঝতে পারলাম না কী হয়েছে। জনকে দেখলাম তার দিকে এগিয়ে যেতে।

“ঘটনা কি?”

“টাইমিংটা মনে হয় ভুল হয়ে গেছে।”” আমতা আমতা করে সে বললো।

আমি নিশ্চিত সে নিজেও ভেবে যাচ্ছে কেন বিস্ফোরণটা হলো না। “তুমি কি ডুয়াল প্রাইম করেছো?” জানতে চাইলেন জন।

সবাইকে ডুয়াল প্রাইম এক্সপ্লোসিভের ট্রেনিং দেয়া হয়েছিলো। এর মানে বোমার মধ্যে দুটো ডেটোনেটর অ্যাটাচ করতে হবে যাতে করে একটা ব্যর্থ হলে অন্যটা দিয়ে কাজ সারা যায়। নিয়মটা খুব সহজ সরল, একটার চেয়ে দুটো অনেক বেশি নিশ্চিত।

কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা হয় নি। আমাদেরকে এখন নতুন একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা কি আবারো কাউকে পাঠাবো ঐ ভবনের ভেতর, নাকি অপেক্ষা করবো কী ঘটে দেখার

জন্য? আমরা তো জানি না ভেতরের যোদ্ধারা এখন কোন ফ্লোরে অবস্থান করছে। আবার যে বোমাটা ভেতরে আছে সেটা যেকোনো মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে পারে। সুতরাং আমাদের কাউকে ওখানে পাঠানোটা খুবই বিপজ্জনক।

অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো ইওডি টেককে আবারো ভেতরে পাঠানো হবে, নতুন একটি ডেটোনেটর অ্যাটাচ করার জন্য। তাই হলো। আমরা তাকে কভার করার কাজটা করলাম। কয়েক মিনিট পরই ফিরে এলো ইওডি টেক।

"এবার কি কাজ করবে?" একটু রেগেই বললেন জন।

"হ্যা, আমি নিশ্চিত কাজ হবে," বললো সে। "এবার ডুয়াল প্রাইম করেছি।"

ঠিক সময়েই বিস্ফোরণ হলো। পুরো ভবনটি ধ্বসে পড়লো চোখের সামনে। ধোয়া আর ধুলোবালিতে ভরে গেলো চারপাশ। কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোয়া উঠতে লাগলো আকাশের দিকে। কিছুক্ষণের জন্য চোখে কিছুই দেখতে পেলাম না। ততোক্ষণে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে, দিগন্তে উঁকি দিচ্ছে নতুন সূর্য।

একটু পরই আমরা ধুলোবালি আর ধ্বংসস্তুপের মধ্যে তল্লাশি শুরু করলাম। ছয়জন যোদ্ধার লাশ খুঁজে পেলাম। তিনতলার উপরেই ছিলো। তাদের সবার মুখ পুড়ে কালো হয়ে গেছে। জন লক্ষ্য করলেন কিছু যোদ্ধার আশেপাশে বালির বস্তা আছে।

"দেখেছো। তারা পুরো তিনতলায় ব্যারিকেড তৈরি করে রেখেছিলো,' বললেন তিনি। "আমাদের ভাগ্য ভালো পাইলট ভুল করে অন্য একটি বিল্ডিংয়ের ছাদে নামিয়ে দিয়েছে। সম্ভবত এর জন্যে অনেকগুলো প্রাণ বেঁচে গেছে আমাদের।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"আমরা যদি এই ভবনের ছাদে ল্যান্ড করতাম," বললেন জন, "তাহলে আমাদের চারজন তিনতলায় ব্যারিকেড পজিশনের সামনে পড়ে যেতাম। সেটা হলে আমাদের খবরই ছিলো। কয়জন বাঁচতো কে জানে।"

আমি চুপ মেরে গেলাম। আমাদের ভাগ্য ভালো ছিলো। একটা ভুল আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। এভাবে ভাগ্যের জোরে বেঁচে যাওয়াটা আমার পছন্দ নয়, কিন্তু এরকম যুদ্ধের ময়দানে ভাগ্য সব সময়ই বিরাট ভূমিকা পালন করে।

ওখান থেকে ফিরে এলাম আমাদের ঘাঁটিতে। সবাই ভীষণ ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত। চোখেমুখে ধুলোবালি আর ধোয়ার কালি লেগে আছে।

বিশ্রামের সময় পুরো ঘটনাটি নিয়ে ভেবে গেলাম। জনের কথাই ঠিক আমরা যদি ঐ ভবনের ছাদের নামতাম তাহলে তিনতলায় প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়ে যেতো। ওরকম ছোট্ট জায়গায় দু'পক্ষের গানফাইটের ফলাফল মোটেও ভালো কিছু হতো না।

এই মিশন থেকে শিখতে পারলাম কখনও কখনও ভাগ্যও তোমাকে বাঁচিয়ে দিতে পারে আর বোমা বিস্ফোরণ করতে হলে সব সময় ডুয়াল প্রাইম ব্যবহার করতে হবে।

ডিপ্লয়মেন্টের শেষে আমি চলে এলাম ডেল্টার ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত উত্তর ক্যারোলিনার পোপ এয়ারফোর্স বেস এ। প্লেন থেকে নামার পর ডেল্টার লোকজন আমাকে এমনভাবে স্বাগত জানালো যেনো আমি তাদেরই লোক।

ভার্জিনিয়া বিচের উদ্দেশ্যে প্লেনে ওঠার আগে জন আমাকে একটি প্লেক দিলেন। ওটাতে একজন ডেল্টা অপারেটর আর লিটল বার্ড হিসেবে পরিচিত আমাদের মিশনের হেলিকপ্টারের পেন্সিল স্কেচ ছিলো। ছবির ফ্রেমটা ছিলো সবুজ রঙের। ছবির পাশে ডেল্টার একটি কয়েনও ছিলো তাতে। প্লেক ছিলো।

"এটা তোমার জন্য," বলেছিলেন জন, "টিমের সাথে যারাই কাজ করে তাদেরকে এরকম একটি প্লেক দেয়া হয়।" সোমালিয়ায় ব্ল্যাকহক ডাউন ঘটনায় নিহত ডেল্টার স্নাইপার মাস্টার সার্জেন্ট র‍্যান্ডি শুগার্ট এই ছবিটা এঁকেছিলেন। তার মৃত্যুর পর আসল ছবিটা পাওয়া যায়। শুগার্টকে মেডেল অব অনার দেয়া হয় পরবর্তীতে। প্রথম ব্ল্যাকহকটি ভূপাতিত হবার পর তিনি প্রতিরোধ করে যান বাকিদের আসার আগপর্যন্ত। সোমালিয়ার যুদ্ধবাজদের হাতে

নির্মমভাবে নিহত হন এই সাহসী সেনা।

১১ই সেপ্টেম্বরের আগে ডেল্টা আর ডেভগ্রু ছিলো একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী। এ দুটো দলের মধ্যে কে সেরা এ নিয়ে চলতো অবিরাম বিতর্ক। যুদ্ধ শুরু হবার পর এসব ফালতু বিষয় নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামালো না। আমরা একে অন্যকে ভায়ের মতোই দেখতাম।

জনের সাথে হাত মিলিয়ে ভার্জিনিয়া বিচের উদ্দেশ্যে প্রেনে উঠে পড়লাম আমি।

ডেভগ্রু'তে ফিরে এসে চার্লি আর স্টিভের সাথে দেখা হলো আমার। তাদের স্কোয়াড্রনটা সবেমাত্র আফগানিস্তান থেকে ফিরে এসেছে।

"মনে হয় ওখানে বেশ ভালোই ব্যস্ত ছিলে?" বললো চার্লি।

"আবার কখন তোমার আর্মি ভাইদের কাছে ফিরে যাবে?" বললো স্টিভ।

আমি জানি আমি ঠাট্টতামাশা করতে পারি না। তাদের এসব ঠাট্টার জবাব দিলাম না। ফিরে এসে আমার খুবই ভালো লাগছিলো।

"হা হা হা," হেসে ফেললাম আমি। "তোমাদের সাথে দেখা হয়ে খুব ভালো লাগছে।"

মাত্র দু' সপ্তাহের ছুটি ভোগ করে আবারো ট্রেনিংয়ে চলে গেলাম আমরা। প্রায় এক দশক ধরে চলছে এই বিরামহীন ট্রেনিং।

পয়েন্ট ম্যান

ডিসেম্বর ২০০৬ সালে আমরা পশ্চিম-ইরাকে ডিপ্লয়েড হই। ওটা ছিলো আমার তৃতীয় ডিপ্লয়মেন্ট। সেখানে কিছুদিন সিআইএ'র সাথেও কাজ করেছি। আরো অনেক ইউনিটের সাথেই কাজ করতে হয়েছিলো আমাদেরকে, তবে নিজের দলের সাথে কাজ করতেই বেশি সচ্ছন্দ বোধ করতাম। কারণ আমরা সবাই একই ধাঁচের ট্রেনিং করেছি। সবাই সবাইকে চিনি।

আমার ট্রুপ সিরিয়ান সীমান্তে থাকা ইরাকের কিছু জঘন্য শহরে কাজ করতো, তার মধ্যে রামাদি ছিলো অন্যতম। এটা ছিলো ইরাকি আলকায়েদাদের স্বর্গ। যেসব কুরিয়ার বিদেশী যোদ্ধাদের দলে ভেড়াতো, ইরানি অস্ত্রশস্ত্র চালান করতো তাদেরকে খুঁজে বের করার কাজ ছিলো আমাদের উপর।

সিরিয়ান সীমান্তের কিছু গ্রামে অপরেশন চালানোর জন্য আল আনবারে অবস্থিত মেরিন আমাদের অনুরোধ করে। ইরাকি যোদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিলো ওই গ্রামগুলো। তাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতাও ওখানে বসবাস করছিলো তখন। পরিকল্পনাটি ছিলো, রাতের অন্ধকারে বাড়িগুলোতে হামলা চালাবো আমরা তারপর মেরিনরা সেগুলো চারপাশ থেকে ঘিরে ধরবে। সকালের মধ্যেই আমরা কাজ শেষ করে ফিরে যেতে পারব। বাকি কাজটুকু করবে মেরিন টিম।

ব্ল্যাকহকের ভেতরে গাদাগাদি করে বসার পরও প্রচন্ড ঠান্ডা লাগছিল। আমাদের সাথে ছিলো একটি কমব্যাট কুকুর। বোমা আর শত্রুপক্ষের যোদ্ধাদের চিহ্নিত করার কাজ করতো ওটা। কুকুরটাকে কোলের উপর রেখে উষ্ণতা পাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু ওটার হ্যান্ডলার বার বার আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিচ্ছিলো তাকে।

ইরাকি গ্রাম থেকে চার মাইল দূরে আমারা ল্যান্ড করলাম।

ঠান্ডার প্রকোপ যেনো আরো বেড়ে গেলো। হেলিকপ্টার চলে গেলে পূর্ব দিকের আল আসাদ এয়ার বেসের দিকে এগোলাম সবাই।

এর আগে দু'বার ইরাকে ডিপ্লয়েড হলেও তৃতীয়বারের ডিপ্লয়মেন্টটা খুব কঠিন ছিলো। শত্রুপক্ষও বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। তাদের আক্রমণ আর কর্মপদ্ধতিতেও এসেছে বিরাট পরিবর্তন। আমাদের সিলকেও সেই মতো খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছিলো পরিস্থিতি বুঝে। আগে যেখানে সরাসরি টার্গেট ভবনের উপর অবতরণ করতাম, সেখানে এখন টার্গেট এলাকা থেকে কয়েক মাইল দূরে নেমে অগ্রসর হই। এরফলে শত্রুপক্ষ হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনতে পেতো না। তাদেরকে আচমকা আক্রমণ করে ঘাবড়ে দিতে পারতাম। হয়তো তারা নিজেদের বাড়িতে আরাম করে ঘুমাচ্ছে, আমরা চুপিসারে বাড়ির ভেতর ঢুকে তাদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতাম। পাল্টা আঘাত হানা তো দূরের কথা, ঘুম থেকে উঠে আমাদেরকে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যেতো তারা।

তবে টার্গেটের পেছনে ছুটে বেড়ানোটা খুব একটা সহজ ছিলো না, বিশেষ করে শীতের রাতে। গ্রামের দিকে এগিয়ে যাবের সময় আমাদের মোটা ইউনিফর্ম ভেদ করে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকে পড়লো। হাড় কাঁপানো শীতে কাবু হবার দশা। আমি একদম সামনের দিকে ছিলাম, দলের পয়েন্ট ম্যান হিসেবে কাজ করছিলাম সেই অভিযানে।

সিল হিসেবে প্রথম দিকে একটি শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো আমাদের অস্বস্তির মধ্যে স্বস্তি পাওয়া। এই শিক্ষাটা আমি প্রথম পাই ছোটোবেলায় আলাস্কায় বাবার সাথে একটি শিকারে বোরোবার সময়।

সব সময়েই বাবার সাথে শিকারে যেতাম। মনে করতাম এসব কাজ করা খুব পুরুষালি। ঘরে বসে বোনদের সাথে খেলার চেয়ে বাবার সাথে শিকারে যাওয়াটা উঠতি একজন ছেলের জন্য বেশি মানানসই। এক শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়লো। তো বাবা আমাকে

শিকারে নিয়ে যেতে চাইছিলেন না, তবুও আমি জোরাজুরি করি।

"তুমি নিশ্চত শিকারে যেতে চাও?" বলেছিলেন বাবা। "বাইরে কিন্তু অনেক ঠাণ্ডা।"

"আমি যাবো, বাবা," বলেছিলাম তাকে।

ততোদিনে আমি নিজেকে বড় ভাবতে শুরু করেছি। ঘরে থাকার চেয়ে বাইরে বাইরে ঘোরাঘুরি করতেই বেশি ভালো লাগতো।

শিকারে যাবার পথে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কাবু হয়ে গেলাম।

"বাবা," চলন্ত গাড়িতে চিৎকার করে বললাম। "আমার পা ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে।"

আমার বাবার পরনে আমার মতোই স্নোস্যুট আর টুপি। তিনি গাড়ি থামালেন। পেছনে ফিরে দেখতে পেলেন আমার দু পাটী দাঁত ঠক ঠক করে কাঁপছে।

"আমি জমে যাচ্ছি," বললাম তাকে।

"তুমি কি যেতে চাও না?"

আমি না করতে চাইছিলাম না। ফিরে যাওয়াটা আমার কাছে পরাজয়ের মতো মনে হচ্ছিলো। কোনো কিছু না বলে তার দিকে চেয়ে রইলাম। মনে মনে চাচ্ছিলাম আমার হয়ে তিনিই যেনো সিদ্ধান্তটা নিয়ে নেন।

"আমার পা দুটো অসাড় হয়ে গেছে, কোনো কিছু টের পাচ্ছি না," বললাম তাকে।

"গাড়ি থেকে নেমে স্লোমোবিলের পেছন পেছন হাটো। আমার টায়ারের চিহ্ন অনুসরণ করো। আমি সামনের দিকে যাচ্ছি। খুব বেশি দূরে যাবো না। টায়ারের চিহ্ন দেখে দেখে হাটতে থাকো। এরফলে তোমার শরীর কিছুটা গরম হবে।"

গাড়ি থেকে নেমে পয়েন্ট ২২ বোরের রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলাম।

ঠিক আছে?" বললেন বাবা।

মাথা নেড়ে সায় দিলাম আমি। গাড়ি চালিয়ে উনি সামনের দিকে এগিয়ে গেলে হাটতে শুরু করলাম।

"বিইউডি/এস-এর ট্রেনিংয়ের সময় স্থলযুদ্ধে বেশ দক্ষতা দেখাতে পেরেছিলাম। শৈশবে বাবার সাথে শিকারে যাবার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিলো সেটাই আমাকে ভালো ফল করতে সাহায্য করে। আমার কাছে ব্যাপারটা ঠিক ঐ শিকার করার মতোই ছিলো।

সেজন্যে ডেভগ্রু'তে যাবার পর আমি আমার টিমের পয়েন্ট ম্যানের কাজটা স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সেই রাতে ইরাকের একটি গ্রাম থেকে চার মাইল দূরে অবতরণ করে বাকি পথটুকু পাড়ি দিতে আমাদের এক ঘণ্টা সময় লেগেছিলো। রাত যখন ৩টা তখন আমরা সেখানে পৌছাই। কাছে আসতেই ইরাকি গ্রামের বাড়িঘরগুলো থেকে বাতি জ্বলতে দেখলাম। পুরো এলাকাটি ধুলোময় আর জঞ্জালে ভর্তি।

পথেঘাটে হালকা নীলচে পলিথিন ব্যাগ বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে। রাস্তার পাশে ড্রেনগুলো উপচে পড়ছে নোংরা জলে। বিস্কিট রঙের বাড়িগুলো আমার নাইটভিশন গগল্‌সে হালকা সবুজ রঙে দেখালো। হাইওয়ে ধরে সিরিয়ার দিকে চলে যাওয়া ইলেক্ট্রক লাইনগুলোর তার ছিড়ে পড়ে আছে। সবকিছুই যেনো বিধ্বস্ত হয়ে আছে এখানে।

গ্রামে ঢোকার পর এক এক দলে বিভক্ত হয়ে আমরা নির্দিষ্ট টার্গেটের দিকে এগিয়ে চললাম। একটি টিমের নেতৃত্ব দিয়ে আমি চলে এলাম নির্দিষ্ট টার্গেট বিল্ডিংয়ের দরজার কাছে। দরজার হাতল ধরে ধাক্কা দিতেই সেটা খুলে গেলো। একটু ফাঁক করে ভেতরের প্রাঙ্গণে উঁকি দিলাম আমি। একেবারে ফাঁকা।

রাইফেলটা সামনের দিকে তাক করে চারপাশে লক্ষ্য রেখে ভেতরে ঢুকে পড়তে উদ্যত হলাম। আমার এক টিমমেট বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে সিগন্যাল দিলো। বেড়ালের মতো নিঃশব্দে এগিয়ে গেলাম আমি। "ধীরে বন্ধু," নিজেকে বললাম।

ফয়ারটা জিনিসপত্রে ঠাসা। মেঝেতে ছোট্ট একটি জেনারেটর আছে। আমার সামনে একটি দরজা আর ডান দিকে আছে আরেকটি, ডান দিকের দরজাটাকে গুরুত্ব দিলাম না, কেননা ওটার সামনে জেনারেটরটা -আছে বলে। সামনের দরজার দিকে চুপিসারে এগিয়ে

গেলাম।

দরজা খুলে ফাঁকা ঘরের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। কোনো সাড়াশব্দ নেই কোথাও। তবে কেরোসিনের হিটিং স্টোভ থেকে ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে এসে লাগলো।

আমার প্রতিটি পদক্ষেপের মৃদু শব্দও আমার কাছে তীব্র বলে মনে হচ্ছে। দরজার ওপাশে আত্মঘাতি বোমারু কিংবা একে৪৭ রাইফেলধারী থাকতে পারে বলে অনুমাণ করছি। এরকম অনুমাণ করার ট্রেনিংও আমাদের দেয়া হয়েছিলো।

শোবারঘরের দরজার সামনে কাপড়ের পর্দা ঝোলানো। এরকম পর্দা আমি ভীষণ অপছন্দ করি কারণ দরজার চেয়ে এগুলো অনেক কম নিরাপদ। আক্রমণ হলে অন্তত দরজার আড়ালে গিয়ে রক্ষা পাওয়া যায় কিন্তু কাপড়ের পর্দার আড়ালে ওটা সম্ভব নয়। আমি বুঝতে পারলাম না পর্দার আড়ালে কেউ আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে সে আমার উপস্থিতি টের পেয়েই গুলি চালাবে।

এখানকার ঘরগুলো খালি থাকার কথা নয়। এখানে যারা ছিলো তারা আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে কিনা সেটাও বুঝতে পারছি না। এর আগে ডেল্টার অনেক সৈনিক এরকম বাসা বাড়ির ভেতরে রেইড করতে গিয়ে নিহত হয়েছে, ঘাপটি মেরে থাকা ইরাকি যোদ্ধাদের হাতে। সুতরাং আমাদের ভাবনায় এই বিষয়টাও ছিলো। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালাম, পর্দার আড়ালে ঘরের ভেতর যোদ্ধারা থেকে থাকলে তাদেরকে একটু অধৈর্য করার ইচ্ছেয়। পর্দার আড়াল থেকে দেখতে পাচ্ছি ঘরের ভেতর বাতি জ্বলছে। সুতরাং নাইটভিশন গগলসটা খুলে ফেললাম। এরপর আস্তে করে পদার্টা সরিয়ে দিলাম আমি।

ইংরেজি 'এল' অক্ষরের আকারের একটি হলওয়ে। ওটার বাঁকে বিশাল বড় একটি রেফ্রিজারেটর। ভেতরে ঢুকে একটা আধখোলা দরজা দেখতে পেয়ে সেখানে চলে এলাম। আমার পেছনে টিমমেটরা হলওয়ে'তে চলে এসেছে। বাকি রুমগুলো তারা ক্লিয়ার করার কাজ শুরু করে দিয়েছে। আমাদের মধ্যে কোনো কথাবার্তা হচ্ছে না। প্রত্যেকেই জানে কার কি কাজ। আমার এক টিমমেট আমার সাথে যোগ দিলে দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। মেঝেতে তিনটি ম্যাট্রেস বিছানো। ঘরের অন্ধকারাচ্ছন্ন কোন থেকে একজোড়া চোখ চেয়ে আছে আমার দিকে, বয়সে তরুণ একজন। তাকে দেখে নাভার্স মনে হলো। বার বার আশেপাশে চোখ ঘুরাচ্ছে।

লোকটা যে চুপচাপ বসে থেকে আমার দিকে চেয়ে আছে এই ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকলো আমার কাছে।

ওখানে আরো মহিলা ছিলো, তারা ঘুম থেকে জেগে উঠেছে মাত্র। দরজার দিকে তাকিয়ে আছে দু'জনেই। আমার কাছে মনে হলো কিছু একটা ঘাপলা আছে। কারণ এই দেশে পুরুষমানুষ আলাদা রুমে ঘুমায়। সঙ্গে সঙ্গে লোকটার দিকে ছুটে গেলাম। মহিলা দু'জনকে হাত তুলে শান্ত থাকার ইশারা করলাম আমি। লোকটা আমাকে কিছু বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু হাত তুলে তাকে চুপ থাকতে বললাম।

"হিশশশ!" বললাম তাকে। অন্যঘরে যদি লোকজন থেকে থাকে তাহলে তাদেরকে অ্যালার্ট করতে চাইলাম না।

লোকটা স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে। তার ডান হাতটা ধরে দাঁড় করালাম। গা থেকে কম্বল সরিয়ে দেখলাম কোনো অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছে কিনা। দেয়ালের সাথে চেপে ধরলাম তাকে। মহিলাদের উপর থেকেও কম্বল সরিয়ে নিলাম। দু'জন মহিলার মাঝখানে পাঁচ-ছয় বছরের এক মেয়ে ঘুমাচ্ছে। কম্বল সরে যেতেই মেয়েটার মা তাকে বুকে জড়িয়ে নিলো।

লোকটাকে ঘরের মাঝখানে এনে প্লাস্টিকের হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে দিলাম তার হাতে। মাথার উপর পরিয়ে দিলাম হুড়। মহিলাদের লক্ষ্য রাখছিলো আমার টিমমেট, আমি লোকটাকে

তল্লাশী করে দেখলাম। কিছু না পেয়ে হাটু গেড়ে বসে পড়তে বললাম তাকে। কথামতোই কাজ করলো সে তবে বিড়বিড় করে কিছু বলার চেষ্টা করলো আমাকে।আমাদের ট্রুপের চিফ দরজা দিয়ে মাথা বের করে দেখলো আমি কি করছি।

"কি পেলে?"

"একটা এমএএম," বললাম তাকে। আমাদের' মিলিটারি পরিভাষায় অর্থ মিলিটারি-এইজড মেইল।'

"এখন পুরো ঘরটা সার্চ করতে হবে।"

ঘরের অন্য প্রান্তে চলে গেলাম, ম্যাট্রেসের পাশে একটা চেস্ট র‍্যাকের উপর ছোটো ছোটো প্লাস্টিকের ব্যাগ স্তুপ করে রাখা। সেটার উপরে একে৪৭ রাইফেলের বাট বের হয়ে আছে। ব্যাগগুলোতে বাড়তি গুলি আর গ্রেনেড রাখা।

"এখানে একটি একে পেয়েছি," বললাম আমি। "এই শালার কাছে চেস্ট র‍্যাক আর গ্রেনেড ও আছে।" রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছিলো। এসব আমার আরো আগেই দেখা উচিত ছিলো। আমার সাথে আসা আমার টিমমেটের নজরেও এটা পড়ে নি।

আলাস্কা থেকে গ্র্যাজুয়েশন করার পর আমি যখন বাবা মাকে জানালাম এই পেশা বেছে নিতে চাই তখন তাদের হতে পারে নি। আমার মা তো ছেলেবেলায় কখনও আমাকে জিআই জো কিংবা খেলনার বন্দুক-পিস্তল কিনে দেন নি কারণ তিনি মনে করতেন ওগুলো খুব বেশি হিসাংত্মক। এখনও আমি আমার মাকে ঠাট্টা করে বলি, তিনি যদি আমাকে শৈশবে ওসব খেলনা খেলতে দিতেন তাহলে হয়তো আমার মধ্যে থেকে সত্যিকারে৬৭

যে লোকটাকে আমরা ঘর থেকে ধরেছি সে অবশ্যই একজন যোদ্ধা এবং বলাই বাহুল্য বেশ স্মার্টও বটে। তার কাছে অস্ত্র, চেস্ট র‍্যাক আর গ্রেনেড ছিলো। ওগুলো হাতের নাগালের বাইরে রেখেছিলো চালাকি করে। আমার ইচ্ছে করছিলো লোকটাকে তক্ষুণি গুলি করে মেরে ফেলি। সে ভালো করেই জানতো আমরা আমাদের নিয়ম মেনে চলবো। সেটার সদ্ব্যবহার করেছে কোনো হুমকি হিসেবে দেখা না দিলে আমরা তাকে গুলি করবো না। আগেভাগেই বুঝে গেছিলো আমরা তার বাড়িতে ঢুকে পড়েছি। সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের চাদরের নীচে চলে যায়।

পুরো বাড়িটা সিকিউর করার পর অন্য একটা ঘরে নিয়ে গেলাম তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। আমাদের সঙ্গে আসা অনুবাদক আমার পাশেই ছিলো। লোকটার মাথার উপর থেকে হুডটা খুলে ফেললাম আমি।

"তাকে জিজ্ঞেস করো তার কাছে কেন গ্রেনেড আর চেস্ট র‍্যাক আছে," অনুবাদককে বললাম।

"আমি এখানকার অতিথি," লোকটা বললো।

"তাহলে তুমি ঐ দুই মহিলা আর বাচ্চাটার সাথে ঘুমাচ্ছিলে কেন?"

"মহিলাদের একজন আমার স্ত্রী" জবাব দিলো সে।

"কিন্তু এইমাত্র তুমি বলেছো তুমি এখানকার অতিথি," বললাম তাকে। আধঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো কিন্তু কোনো কিছুই সে স্বীকার করলো না। পরদিন সকালে তাকে আমরা মেরিনদের কাছে হস্তান্তর করে দেই।

দিনের পর দিন এরকম মিশনে অংশ নিতে হতো আমাদের। ধরো আর ছাড়ো-এমনই ছিলো সিস্টেমটা। আমরা খুবই হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। তাদেরকে কষ্ট করে ধরতাম, তুলে আনতাম, আর কয়েক সপ্তাহ পর আবার তারা পথেঘাটে অস্ত্র নিয়ে নেমে পড়তো আমাদের বিরুদ্ধে। যে যোদ্ধাকে আমরা ঐ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছিলাম সেও খুব জলদি মুক্তি পেয়ে যাবে বলে নিশ্চিত ছিলাম আমি। তাদেরকে পথেঘাটে যুদ্ধ করা থেকে বিরত রাখতে হলে মেরে ফেলতে হবে। এছাড়া আর কোনো পথ নেই।

সকালবেলা মেরিনদের বিশাল আকারের সিএইচ-৫৩ হেলিকপ্টার এসে নামলো গ্রামের

মধ্যে। সূর্য উঠে গেছে। সিকিউরিটির দায়িত্ব নিয়ে যে যার পজিশনে চলে গেছে চারদিকে।

আমার ট্রুপের চিফ এলেন মেরিনদের সাথে কথা বলার জন্য। তাদের কাছে পুরো গ্রামটার দায়িত্ব তুলে দিয়ে আমাদের চলে যাবার কথা। "তুমি তাদের হেডকোয়ার্টারটা দেখেছো?" বললেন তিনি।

"আমার মনে হয়ে ওটা পথের ধারে," হাত তুলে কতোগুলো রেডিও অ্যান্টেনার দিকে দেখালাম।

চিফ ঘুরে চলে যাবার সময় আমি তার অলক্ষ্যে একটা ব্রা আটকে দিলাম তার পিঠে। গতরাতে ঐ বাড়ি থেকে ব্রাটা পেয়ে পকেটে লুকিয়ে রেখেছিলাম মজা করার জন্য।

আমি দেখতে পেলাম আমার ট্রুপ চিফ কয়েকজন মেরিনকে জিজ্ঞেস করছেন।

"এই যে, তোমাদের হেডকোয়ার্টারটা কোথায়?"

তারাও আমার মতো পথের ধারে জায়গাটা দেখিয়ে দিলো।

"এই যে স্যার, আপনার পিঠে তো একটা ব্রা ঝুলছে," একজন মেরিন বললো তাকে।

"হ্যা জানি," নির্বিকারভাবে বললেন চিফ। পেছন ফিরে আমাদের দিকে তাকালেন। "সব সময় এমনটাই হয় আমার সাথে।"

মরুভূমিতে অবস্থিত ল্যান্ডিং জোনে ফিরে আসার পর টের পেলাম আমার পেছনেও একটা ব্রা আটকে দিয়েছে কেউ। আমাদের টিমে এরকম ঠাট্টা তামাশা সব সময়ই চলতো।

তবে আমাদের মধ্যে এসব কাজে সবচেয়ে পটু ছিল টিম লিডার ফিল। নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখতে পাই আমার জুতোর ফিতা কেটে রেখে দিয়েছে কেউ। কাজটা যে ফিল করেছে বুঝতে পারলেও হাতে কোনো প্রমাণ নেই। তার কাছে একটি শক্তিশালী চুম্বকও থাকতো, সেটা দিয়ে আমাদের পকেটে থাকা ক্রেডিটকার্ডের স্ট্রিপটা ডিম্যাগনেটাইজ করে ফেলতো সে।

নিজেকে আড়াল করার জন্য সে একটা নাটকও তৈরি করতো।

"আমার সাথে কে এই তামাশা করেছে?" ঘরে ঢুকে চিৎকার করে বলতো সে।

আমরা সবাই জানতাম সে নিজেই এসব করে সবার নজর অন্য দিকে ফেরানোর চেষ্টা করছে। খুব বেশি একঘেয়েমীতে থাকলে তার এইসব কর্মকাণ্ড বেড়ে যেতো। তবে তার সাথে সত্যি সত্যি মজাও করা হতো।

এক শুক্রবার ফিল বাইরে এসে দেখতে পেলো ক্রেইন দিয়ে তার গাড়িটা শূন্যে তুলে রেখেছে কেউ। আমরা বুঝতে পারলাম তার হাতে নাস্তানাবুদ হওয়া কোনো 'ভিক্টিম' প্রতিশোধ নিতেই এ কাজ করেছে। তবে সে কে সেটা জানা আর সম্ভব হয় নি।

ফিলকে নিয়ে আরেকটি মজার ঘটনার কথা বলি। আমরা যখন ডিপ্লয়েড থাকতাম না তখন আমেরিকাতে ফিরে গিয়ে ট্রেনিং নিতাম। তো মায়ামিতে এরকম এক আরবান ট্রেনিংয়ের সময় একটি পরিত্যক্ত হোটেলে সিকিউবি করার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।

আমাদের ট্রেনিং শুরু হবার আগে স্থানীয় পুলিশদের নিয়ে ভবঘুরেদের তাড়িয়ে হোটেলটা ক্লিয়ার করার জন্য ফিল সেখানে যায়। আমরা ঐ দিন ট্রেনিং করতে চাইছিলাম না। ফিল তখন কুকুর সামলাতো অর্থাৎ একজন হ্যান্ডলার হিসেবে কাজ করতো।

হোটেলের একটি রুমের ক্লোজেট থেকে বারো ইঞ্চি লম্বা কালো রঙের কৃত্রিম লিঙ্গ খুঁজে পেলো ফিল। সেটা নিয়ে নীচে নেমে এলো সে।

"দেখো কি পেয়েছি," আমার মুখের সামনে জিনিসটা তুলে ধরে বললো।

"এই ফালতু জিনিসটা আমার সামনে থেকে সরাও," একটু পিছু হটে রেগেমেগে বললাম তাকে।

হোটেলে ট্রেনিং শেষ করে আমরা সবাই ক্লান্ত হয়ে যখন বেইসে ফিরে যাচ্ছি তখন লক্ষ্য করলাম আমার গাড়ির স্টিয়ারিংয়ের উপর একটা জিনিস আটকানো।

"ফিল!" গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে বের হয়ে চিৎকার করে বললাম। চারপাশে তাকিয়ে ফিলকে দেখতে পেলাম না। ততোক্ষনে ক্রাইমসিন থেকে সটকে পড়েছে সে!

আমি কৃত্রিম লিঙ্গটা স্টিয়ারিং থেকে সরিয়ে আমার ব্যাগের ভেতরে রেখে দিলাম।

জিনিসটা উধাও হয়ে গেলো। কয়েক মাস পর ভার্জিনিয়া বিচে যাবার আগ পর্যন্ত ওটার কথা ভুলেই গেছিলাম। তো, ভার্জিনিয়া বিচে তখন আমাদেরকে গ্যাস-মাস্ক ট্রেনিং দেয়া হচ্ছিলো। কিল-হাউসে আমাদেরকে কেমিক্যাল সুট পরে অভিযান চালাতে হতো। এরকম এক ট্রেনিং শেষ করে নিজের রুমে ফিরে এসে ফ্রীজ থেকে বিয়ার নিয়ে চলে এলাম কনফারেন্স রুমে। ওখানে এসে দেখি সবাই জড়ো হয়ে কী যেনো দেখছে। "হলি শিট!" একজনকে বলতে শুনলাম।

"এটাই কি ওই জিনিসটা?" অন্য একজন বললো।

আমি কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম পোলারয়েড ক্যামেরায় তোলা একটি ছবি দেখছে সবাই। ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটা গ্যাস মাস্কের ভেতর সেই বিখ্যাত বিস্মৃত কৃত্রিম লিঙ্গটি। গ্যাস মাস্কটি কার চিনতে দেরি হলো না। আমার পেট গুলিয়ে উঠলো। এই মাস্কটি পরেই কিছুক্ষণ আগে ট্রেনিং করেছি। তবে ওটা যে আমারই মাস্ক ছিলো সেটা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব ছিলো না। সুতরাং সবাই মনে করতে শুরু করলো ওটা বুঝি তারই মাস্ক।

আমি সাপ্লাই রুমে গিয়ে নিজের মাস্কটা ফেরত দিয়ে নতুন আরেকটি নিয়ে এলাম। এরপর আবারো বিখ্যাত সেই জিনিসটি উধাও হয়ে গেলো কয়েক মাসের জন্য।

রান্নাঘরে সব সময়ই খাবারদাবার থাকতো। বিভিন্ন ধরণের স্ন্যাক্সের পাশাপাশি থাকতো সুস্বাদু ক্র্যাকার্স। একদিন আমরা সবাই ক্র্যাকার্স খাচ্ছি আর গল্পগুজব করছি। হঠাৎ আবারো পোলারয়েডের একটি ছবি খুঁজে পেলো আমাদের একজন। ছবিতে দেখা গেলো ক্র্যাকার্স রাখার বিনের মাঝখানে সেই বিখ্যাত বারো ইঞ্চির জিনিসটি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

এরপর থেকে আমি আর কখনও ক্র্যাকার্স খেতে পারি নি।

আমি জানি না এসবের পেছনে ফিল ছিলো কি না। কারণ জিনিসটা তো সে-ই খুঁজে পেয়েছিলো। তবে এখন ঐ জিনিসটাকে নিয়ে কেউ ভাবে না।

মায়েস্ক আলাবামা

ঠাট্টা তামাশা ছাড়া আর যে জিনিসটা ফিল বেশি পছন্দ করতো সেটা নিঃসন্দেহে প্যারাসুট জাম্প। প্লেন থেকে জাম্প করার টেইনিং আমাদের সবারই ছিলো, কিন্তু ফিল সুযোগ পেলেই এটা করতো আমাদের নিয়ে। কাজটা মোটেও সহজ কিছু না। ঠিক সময়ে প্লেন থেকে ডাইভ দিয়ে ঠিক সময়ে প্যারাসুট খুলে নির্দিষ্ট জায়গায় ল্যান্ড করতে হলে অনেক দক্ষতার প্রয়োজন পড়ে।

সিল টিম ফাইভ-এ থাকার সময় আমি ফ্রী-ফল কোয়ালিফিকেশন অর্জন করলেও ডেভগ্রু'তে এসে সত্যিকার অর্থে প্যারাসুট জাম্পে মাস্টার হয়ে উঠি।

তবে একটা কথা না বললেই নয়। প্রথম যেদিন প্লেন থেকে জাম্প দিলাম ভয়ে অসাড় হবার জোগাড় হয়েছিলো।

২০০৫ সালে ইরাকে ডিপ্লয়মেন্টের সময়টাতে আমাকে এরকম কোনো কাজ করতে হয় নি। কখনও ভাবি নি সত্যি সত্যি এয়ার অপারেশনে অংশ নেবো। কমান্ডে যোগ দেবার পর পালাক্রমে ইরাক এবং আফগানিস্তানে কাজ করেছি আমি। আমার জীবনটা যেনো ডিপ্লয়মেন্টের পর ডিপ্লয়মেন্ট, চক্রে তারপর ট্রেনিং, স্ট্যান্ডবাই থাকা, আবার ডিপ্লয়মেন্ট-এরকম আবর্তিত হচ্ছিলো।

২০০৯ সালে এই চক্রে একটু ভিন্নতা যোগ হলো অবশেষে একটু অন্য রকমের কাজ পেলাম আমরা।

আমি তখন ছুটি নিয়ে বাড়িতে সময় কাটিয়ে জন্যে প্লেনের অপেক্ষা করছি। এয়ারপোর্টে ভার্জিনিয়া বিচে যাবার নিউজে দেখলাম মায়েস্ক আলাবামা নামের সতেরো হাজার টনের একটি কার্গো শিপ কেনিয়ার মোম্বাসায় যাবার পথে সোমালি জলদস্যুদের কবলে পড়েছে। ওই দিন ছিলো এপ্রিল মাসের ৮ তারিখ, বুধবার। জলদস্যুরা কার্গোর ক্যাপ্টেন রিচার্ড ফিলিপকে পনবন্দী করে একটা বড়সড় লাইফবোটে করে নিয়ে সটকে পড়েছে। তাদের কাছে নয় দিনের খাবারদাবার ছিলো। আমেরিকার নৌবাহিনীর ডেস্ট্রয়ার ইউএসএস বেইনব্রীজ সেই লাইফবোটটাকে অনুসরণ করে। বোটটা সোমালিয়ান উপকূল থেকে ত্রিশ মাইল দূরে চলে যায়। চারজন সশস্ত্র জলদস্যু ছিলো তাতে। সবগুলো অস্ত্রই একে৪৭।

এয়ারপোর্টে বসে বসে ভাবছিলাম হয়তো আমাদেরকে এই মিশনে পাঠানো হতে পারে। যেহেতু আমার স্কোয়াড্রনটা ঐ মুহূর্তে স্ট্যান্ডবাই আছে তাই এরকমটি হবার সম্ভাবনাই বেশি।

প্লেনে ওঠার আগেই ফিল আমাকে ফোন করে "খবরটা দেখেছো?

"হ্যা। এইমাত্র দেখলাম," বললাম তাকে।

"তুমি এখন কোথায়?"

ঐ সময়টায় আমি ছিলাম আমার টিমে সবচাইতে সিনিয়র সদস্য।

"এয়ারপোর্টে," বললাম ফিলকে। "বেসে ফিরে যাবার জন্য প্লেনের অপেক্ষায় আছি।"

"ওকে, ভালোই হলো," ফিল বললো। "যতো দ্রুত সম্ভব চলে আসো।"

আমার মাথা জুড়ে বিভিন্ন চিন্তাভাবনা ঘুরে বেড়াতে লাগলো। আমার প্লেনটা তো আর বললেই দ্রুত চলতে শুরু করবে না। এটা ওয়ান্স-ইন-অ্যা-লাইফটাইম মিশন। কোনোভাবেই এই সুযোগটা আমি হারাতে চাই না। একবার প্লেনে উঠে পড়লে আর যোগাযোগ করা সম্ভব হবে না। আমার সাথে যোগাযোগ করতে না পেরে তারা যদি রওনা দিয়ে দেয় তখন আর কিছুই করার থাকবে না। সুতরাং প্লেনে ওঠার আগে আমি নিজেই ফোন করলাম কিন্তু লাইন পেলাম না। অস্থির হয়ে উঠলাম আমি। তবে প্লেনে থেকে নেমেই ফোনের লাইন পেয়ে গেলাম।

"কি ব্যাপার?" ফিল ফোনটা ধরলে বললাম তাকে। তখন রাত আটটা বাজে।

"এখনও আছি," বললো সে। "আগামীকাল খুব সকাল সকাল চলে এসো। অপারেশনের পরিকল্পনা করা শুরু হয়ে গেছে। আমরা এখন ওয়াশিংটন ডিসি থেকে অর্ডার পাবার জন্যে

অপেক্ষা করছি।”

পরদিন সকালে কনফারেন্স রুমে বসলাম আমরা।

“একজন মাত্র পনবন্দী,” বললো ফিল। “চারজন জলদস্যু। তারা দুই মিলিয়ন ডলার দাবি করছে।”

“মনে হচ্ছে ক্যাপ্টেনের মূল্য ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারে নি তারা,” বললাম তাকে।

“আমি হলে আরো বেশি চাইতাম,” ফিল জানালো। “দুই মিলিয়ন চাওয়াটা কমই মনে হচ্ছে।”

“তারা গেছে কোথায়?”

“নিজেদের লোকজনের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে। ফিলিপস্‌কে কোনো ক্যাম্প কিংবা মাদার শিপে নিয়ে যেতে চাইছে মনে হয়,” বললো ফিল। “সুতরাং আমাদেরকে কোনো জাহাজে অবতরণ করে অপারেশন চালানোর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, নইলে সমুদ্র সৈকতে অবতরণ করে তাদের ক্যাম্পে হামলা চালাতে হবে।”

এরকম মিশনের জন্য আমরা অনেক বছর ধরে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলাম।

“ইউএসএস ড্রেস্টয়ার বেইনব্রীজ-এ কিছু সেনা রয়েছে,” ফিল জানালো। “গতরাতে তারা জলদস্যুদের সাথে আলাপ আলোচনা করেছিলো কিন্তু বৃহস্পতিবার সেই আলোচনায় বিরতি দেয়া হয়।”

“তারা উপকূলে পৌঁছানোর আগে আমাদের হাতে কতোক্ষণ সময় আছে?” জিজ্ঞেস করলাম আমি।

“তারা এখন যেখানে আছে সেখান থেকে কোথাও নামতে পারছে না কারণ গোষ্ঠীগত সমস্যা, ” ফিল বললো। “তাদের গোষ্ঠীটি দক্ষিণ দিকের তাই দু'দিনের আগে ওখানে যেতে পারবে না। আশা করি এই সময়ের মধ্যে আমরা এ নিয়ে কাজ করে ফেলতে পারবো।”

“তাহলে আমরা বসে আছি কেন?”

“তারা ভেবে দেখছে,” বললো ফিল।

“এখন পর্যন্ত ভেবে যাচ্ছে?” একটু ক্ষোভের সাথেই জানালাম। “এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিতে এতো দেরি করার কোনো মানে হয়?”

“আরে বাবা, এটা ওয়াশিংটন,” ফিল বললো। “তাদেরকে তো তুমি চেনো না।”

একদিন পরই আমাদেরকে অর্ডার দেয়া হলো। আমরা সবাই প্রস্তুতি নিয়েই রেখেছিলাম।

কুড়ি ঘণ্টা পর সি-১৭'র র‍্যাম্পটা খুলে গেলে পুরো কেবিনটা আলোয় ভরে উঠলো।

প্লেনের ভেতরে বিশাল আকারের হাই-স্পিড অ্যাসল্ট ক্রাফট (এইচএসএসি) দেখতে পেলাম। ওটার সাথে প্যারাসুট লাগানো। প্লেনের পেছন দিয়ে ওটা নীচে ফেলে দেয়া হবে আমাদেরকে ড্রপ করার সাথে সাথে।

আমরা ইউএসএস বেইনব্রীজ-এর উপর জাম্প করলাম যাতে করে জলদস্যুরা আমাদেরকে দেখতে না পায়। ইউএসএস বক্সার নামের একটি উভচর যানে করে মেরিনদের অপারেশনস্থলে নিয়ে যাওয়া হবে। ওটা যখন বেইনব্রীজ-এর কাছে চলে এলো আমরা সবাই একে একে উঠে পড়লাম।

আমাদের অপারেশন শুরুর আগে জাহাজের বন্দী ক্যাপ্টেন ফিলিপ্‌স পালানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু জলদস্যুদের ফাঁকি দেয়া সম্ভব হয় নি। এরপর তার হাত বেধে ফোন আর ওয়্যারলেস সেটটা জলতে ফেলে দেয় তারা, যাতে জাহাজ থেকে কোনোরকম অর্ডার না পায়।

ততোক্ষণে জলদস্যুদের লাইফবোটের জ্বালানী শেষ হয়ে গেছে, সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে ওটা। ইউএসএস বেইনব্রীজ-এর কমান্ডার ফ্রাঙ্ক কাস্টেলানো জলদস্যুদেরকে রাজি করাতে সক্ষম হন তাদের বোটটা ডেস্ট্রয়ারের সাথে দড়ি দিয়ে বেধে রাখতে। এর বিনিময়ে ডেস্ট্রয়ারের সাথে থাকা একটি বোটে করে খাদ্য আর পানীয় সরবরাহ করেন তিনি। এসব যখন সরবরাহ করা হচ্ছিলো তখন চতুর্থ জলদস্যু আব্দুল ওয়ালি মুসি মেডিকেল সহায়তা

চাইলে তাকে বেইনব্রীজ-এ আনা হয়। ক্যাপ্টেন পালানোর চেষ্টা করেছিলেন যখন তখন ধস্তাধস্তি করার সময় ওর হাত কেটে গেছিলো।

শনিবার দিন ইউএসএস বক্সার-এ ওঠার পর আমাদের একটি ছোট্ট টিমকে পাঠাই বেইনব্রীজ-এ। বাকিরা রয়ে যাই জাহাজে। লাইফবোটটি যদি কোনো উপকূলে ভেড়ার চেষ্টা করে তখন আমরা উদ্ধার অভিযান চালাবো সেখানে।

বেইনব্রীজ-এ পাঠানো টিমটি ছিলো একটি অ্যাসল্ট টিম। কয়েকজন স্নাইপার আর কমান্ডো নিয়ে গঠিত ছিলো সেটি। বেইনব্রীজ-এর সামনের দিকে ডেকের উপর সিল'রা নজরদারি করার মতো পজিশন নিয়ে নেয়। জলদস্যুদের সাথে দরকষাকষি চলার সময় স্নাইপাররা কড়া দৃষ্টি রাখতে শুরু করে। ঘটনা কোন দিকে মোড় নেয় সেটা দেখার জন্যে আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মুসিকে জাহাজে তোলার পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গ্যারি। সে আমার কয়েক বছরের সিনিয়র।

এই যে, আইসক্রিম খাবে নাকি?” বললো সে। “নাকি ঠাণ্ডা কোক?” খাওয়াদাওয়া করতে করতে খুব দ্রুতই মুসির সাথে গ্যারির ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়ে গেলো। মুসিকে সে জাহাজের খোলা ডেকের উপর নিয়ে আসলো যাতে করে দূর থেকে জলদস্যুরা দেখতে পায় সে কোক খাচ্ছে। জলদস্যুরা তখনও লাইফবোটে, দরকষাকষি করার জন্যে চেঁচামেচি করছে।

“আমি শুনতে পাচ্ছি না,” মুসিকে বললো গ্যারি। “তাদেরকে বলো দড়িটা টেনে আরো কাছে চলে আসতে।”

মুসি রাজি হলে তাদের বোটটা আরো কাছে চলে আসে। রাত নেমে এলে গ্যারি আর তার টিমমেটরা দড়ি টেনে ওটাকে আরো কাছে নিয়ে আসে জলদস্যুদের অজান্তেই। ঘন অন্ধকারে জলদস্যুদের পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিলো না তাদেরকে টেনে বেইনব্রীজ-এর খুব কাছে নিয়ে আসা হয়েছে। জাহাজের ডেক থেকে গ্যারি আর তার লোকজন লাইফবোটটা ভালো করে দেখে নেয়। ইনফ্রারেড গগলস পরে থাকার কারণে অন্ধকারে কোনো সমস্যাই হয় নি তাদের।

একজন জলদস্যু সব সময়ই বোটের উপরে বসে কড়া নজরদারি করতো, তাকে নিষ্ক্রিয় করাটা খুব সহজ। বোটের জানালা আরেকজন জলদস্যুকেও তারা দেখতে পায়, সে বোটের স্টিয়ারিং ধরে ছিলো। এটাও খুব সহজ টার্গেট। কিন্তু তৃতীয় জলদস্যুটা সব সময়ই চোখের আড়ালে রয়ে যায়। গ্যারির দরকার তিনজনকে একসঙ্গে ঘায়েল করা। ফিলিপসকে নিরাপদ রেখে গুলি করার জন্য দরকার ঐ তৃতীয় জলদস্যুকে দৃষ্টিসীমার মধ্যে পাওয়া। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর রোববার রাতে তৃতীয় জলদস্যুকে দেখা গেলো বোটের পেছন দিকে হ্যাচ খুলে বাইরে উঁকি দিতে। স্নাইপারদের এটাই দরকার ছিলো। তাদের উপর কড়া আদেশ ছিলো, ফিলিপ্‌সের জীবন হুমকির মুখে পড়লে, তবেই কেবল অ্যাকশনে যাবে। দারুণ উত্তেজনা বিরাজ করছিলো সে সময়। ফিলিপসের জীবন নিয়ে ভীষণ শংকিত ছিলাম আমরা। আমার টিমমেটরা ফায়ার করে বসলো অবশেষে। মুহূর্তে তিনজন জলদস্যু ঘায়েল হলো।

স্নাইপারদের শেষ শট ফায়ার হবার পর পরই বোটের ভেতর থেকে একে৪৭-এর একটা গুলির শব্দ হয়। এটা শোনার পর পরই আমরা সবাই হতভম্ব হয়ে পড়ি কিছুক্ষণের জন্য। ওয়াশিংটন কোনোভাবেই চায় নি ক্যাপ্টেনের কিছু হোক। আকাশের উপর চক্কর দিতে থাকা ড্রোন থেকে ওয়াশিংটনে সব খবর চলে যাচ্ছিলো প্রতি মুহূর্তে। ডেভগ্রু'র কমান্ডিং অফিসার এবং আমাদের স্কোয়াড্রন কমান্ডার দুজনেই ইউএসএস বক্সার-এ তখন।

আমরা বুঝতে পারছিলাম না ফিলিপস বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে। নাকি ভয়াবহভাবে আহত সে। দু’জন স্নাইপার ঝুঁকি নিয়ে দড়ি বেয়ে চলে যেতে থাকে বোটের দিকে। নষ্ট করার মতো সময় আমাদের ছিলো না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা পৌছে যায় সেখানে।

তাদের সাথে কেবল পিস্তল ছিলো। বোটের নীচে প্রবেশ করার দরজা মাত্র একটি, এরফলে আহত একজন জলদস্যুর পক্ষেও তাদেরকে ঘায়েল করা খুব সহজ ছিলো। তবে স্নাইপাররা বোটে উঠেই দ্রুত কাজ করতে শুরু করে। তাদেরকে কেউ প্রতিরোধ করতে আসে নি। ফিলিপকে হাত-পা বাধা অক্ষত অবস্থায় খুঁজে পায় তারা। ক্যাপ্টেনকে নিয়ে আসা হয় বেইনব্রীজ-এ।

গ্যারি এবার একমাত্র জীবিত জলদস্যু মুসিকে ঘুষি মেরে ডেকের উপর ফেলে দেয়।

"তুই জেলে যাচ্ছিস শালা," বলে সে। "তোর সব সঙ্গী সাথী শেষ। এখন আর তোকে আমার কোনো দরকার নেই।"

মুসির হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে মাথায় হুড চাপিয়ে দেয়া হয়।

জাহাজের সামনের ডেকে ফিলিপ্‌সের সাথে দেখা করে গ্যারি। ক্যাপ্টেনের বিপর্যস্ত অবস্থা তখনও কাটে নি।

"আপনারা কেন এটা করলেন?" জানতে চাইলেন তিনি।

আমরা বুঝে গেলাম উনি স্টকহোম সিন্ড্রমে ভুগছেন। গোলাগুলির শব্দ শুনে এতোটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন যে কেন এসব হচ্ছে কিছুই বুঝে উঠতে পারেন নি।

মেডিকেল ট্রিটমেন্ট দেবার পর ফিলিপ্‌সের অবস্থা খুব দ্রুতই ভালো হয়ে যায়। লেজ গুটিয়ে পালায় স্টকহোম সিন্ড্রম। আমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তার পরিবারের সাথে ফোনে কথা বলেন। ইউএসএস বক্সার-এ করে চলে যান ভারমন্টে নিজের বাড়িতে।

আমারা আরো কয়েকটা দিন ইউএসএস বক্সার-এ কাটিয়ে নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে যাই। ইরাক আর আফগানিস্তানের বাইরে এসে একজন মানুষের জীবন বাঁচাতে পেরে খুব ভালো লাগছিলো। তবে খারাপ দিকটা হলো, আমরা ওয়াশিংটনের ধীরগতির সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারটার সাথে পরিচিত হয়ে গেলাম। আরো আগে এই অপারেশনটা করা সম্ভব ছিলো আমাদের পক্ষে। অবশ্য এটাও ঠিক, এই অপারেশনের পর আমাদের টিম ওয়াশিংটনের সুনজরে পড়ে যায়। হাই-প্রোফাইল মিশনের জন্যে আমাদের কথা বিবেচনা করতে শুরু করে তারা।

দীর্ঘ যুদ্ধ

পাহাড় বেয়ে উঠতে গিয়ে আমার পা দুটো ব্যথায় কাতর হয়ে উঠলো, ফুসফুস যেন পুড়ে যাচ্ছে আগুনে।

এটা ২০০৯ সাল। আমরা আছি আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল থেকে দু'ঘণ্টার দূরত্বে দক্ষিণের এক পার্বত্য এলাকার আট হাজার ফিট উপরে। ফিলিপসকে উদ্ধার করার পর আমরা আমাদের ঘাঁটিতে ফিরে আসি, তারপর বেশ কয়েক মাস ট্রেনিংয়ে কাটিয়ে আফগানিস্তানে ডিপ্লয়েড হই আবার।

আকাশের উপরে একটা ড্রোন চক্কর দিচ্ছে। নিক্ষেপ করছে ইনফ্রারেড লেজার রশ্মি। আমরা একটি টার্গেট কম্পাউন্ডে পৌছার আগেই আটজন যোদ্ধা পালিয়ে যায়, তাদেরকে খুঁজে বের করার কাজ চলছে।

"আলফা টিম ওদের ভিজুয়াল পেয়েছে," রেডিও'তে ফিলের কথাটা শুনতে পেলাম আমি।

কম্পাউন্ড থেকে তিনশ' মিটার দূরে পাহাড়ের প্রান্তসীমার দিকে চলে গেছে যোদ্ধারা। তাদের খুব কাছে চলে আসতেই পেছনে ফিরে দেখলাম ফিলসহ আমার টিমের বাকিরাও চলে এসেছে পেছন পেছন। এই ডিপ্লয়মেন্টে এটাই আমাদের প্রথম মিশন। তখনও খুব বেশী উচ্চতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠি নি।

শত্রুপক্ষ আমাদের থেকে দেড়শ' গজ দূরে অবস্থান নিয়েছে। আমরাও যার যার মতো পজিশন নিয়ে ফেললাম। সরঞ্জামের বোঝা নিয়ে পাঁচশ মিটার দৌড়ানোর ফলে খুব ক্লান্ত ছিলাম, রাইফেলের লেজারটা সেজন্যে ঠিকমতো স্থির করতে বেশ বেগ পাচ্ছিলাম। তবে মেশিনগান হাতে এক পিকেএম যোদ্ধার দিকে শেষ পর্যন্ত তাক করতে পারলাম সেটা। পর পর কয়েক রাউন্ড গুলি করার পর দেখলাম সে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। ততোক্ষণে আমার টিমমেটরা ফায়ার করে আরো দু'জন যোদ্ধাকে ঘায়েল করে ফেলে।

বাকিরা পাহাড়ের প্রান্তসীমার দিকে উধাও হয়ে যায়।

নিহত সঙ্গীসাথীদের ফেলে বাকিরা পাহাড়ের পেছন দিককার ঢালু বেয়ে নেমে যাবার চেষ্টা করলো।

"পাঁচজনকে উত্তর দিক দিয়ে নেমে যেতে দেখা যাচ্ছে," রেডিওতে ড্রোন পাইলট বললো। ফিল আমাদের দিকে চেয়ে ইশারা করলে আমরা দ্রুত ছুটে যাই সেখানে।

যাবার পথে তিনজন নিহত যোদ্ধার লাশ পড়ে থাকতে দেখলাম। একজনের সাথে ছিলো মেশিনগান, অন্যজনের সাথে আরপিজি। আমাদের ভাগ্য ভালো আক্রমণের প্রথম দিকেই বড়সড় অস্ত্রগুলো নিষ্ক্রিয় করে ফেলতে পেরেছি।

নিহতদের পরনে ব্যাগি শার্ট আর প্যান্ট, পায়ে কালো চিতা নামে পরিচিত একধরণের শ

স্নিকার। সাধারণত এরকম জুতা তালিবান যোদ্ধারাই ব্যবহার করে থাকে। আমাদের স্কোয়াড্রনে একটা জোক প্রচলিত ছিলো তুমি যদি আফগানিস্তানে কালো চিতা পরে থাকো তাহলে নির্ঘাত সন্দেহের শিকার হবে। তালিবান যোদ্ধা ছাড়া অন্য কাউকে আমি এ জিনিস পরতে দেখি নি।

পাহাড়ের প্রান্তসীমায় এসে দেখতে পেলাম বেঁচে যাওয়া যোদ্ধারা ঢালু বেয়ে নীচে নেমে যাবার চেষ্টা করছে। নিহত যোদ্ধার আরপিজিটা তুলে নিয়ে পলায়নরত যোদ্ধাদের দিকে ফায়ার করলো ফিল।

লাঞ্চারটা ফেলে আমার দিকে ফিরলো সে। রেডিওতে আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম 'ক্লোজ এয়ার সাপোর্ট' টিম অর্থাৎ সিএএস আমাদের খুব কাছে চলে এসেছে। উপরের দিকে চেয়ে দেখলাম, সত্যি একটা এসি-১৩০ গানশিপ চক্কর দিচ্ছে।

"সিএএস স্টেশনে চলে এসেছে," মাত্র দু ফিট দুর থেকে চিৎকার করে বললো আমাকে।

আরপিজির প্রচণ্ড শব্দে তার কানে সাময়িক তালা লেগে গেছে।

“আমি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি, চেঁচানোর দরকার নেই,” বললাম তাকে।

“কি বললে?” আরো জোরে চিৎকার দিয়ে বললো ফিল। বাকি রাতটুকু ফিলের এই চিৎকার করে কথা বলা শুনে যেতে হলো আমাকে। যা-ই বলে চিৎকার করে বলে।

আমরা দেখলাম এসি-১৩০ থেকে সমানে গুলি করা হলো পলায়নরতদের লক্ষ্য করে।

সারাটা রাত কেটে গেলো বাকি যোদ্ধাদের খুঁজে বেড়াতে। আমাদের ধারণা ছিলো হয় তারা সবাই মরে গেছে নয়তো মারাত্মকভাবে আহত হয়ে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে

রাতের এক সময় হাটতে হাটতে আমার পায়ের নীচে কালচে ছায়া দেখতে পেলাম। নাইটভিশন গগলস পরে ছিলাম তখন। মনে করলাম গাছের গুড়ি কিংবা বড়সড় কোনো ডাল হবে। ওটার ওপর পা ফেলতেই ঘোৎ করে একটা শব্দ হলো। শব্দটা কোনো মানুষের! সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে সরে গেলাম আমি। ভড়কে গিয়ে গুলি করা শুরু করলাম।

কয়েক সেকেন্ড পর নিজের নার্ভটাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হলাম আমি। লাশটা তল্লাশী করে দেখলাম অনেক আগেই এটা মরে পড়ে ছিলো। তার বুকে আমার পা পড়তেই ফুসফুস থেকে বাতাস বেরিয়ে গিয়েছিলো মুখ দিয়ে। ২০ মিমি-এর গুলিতে শরীরটা ক্ষতবিক্ষত। তার চেস্ট র‍্যাক থেকে একটা একে৪৭ রাইফেল পেলাম।

জালালাবাদে ফিরে মিশন শেষে আমরা ছবি তুললাম অনেকগুলো। ঐ রাতে আমরা দশজনেরও বেশি তালিবান যোদ্ধা হত্যা করি। আমাদের পক্ষে কোনো হতাহত ছিলো না। যথারীতি এই মিশনটাও ছিলো ভাগ্য আর দক্ষতার একটি মিশ্রণ।

আগেই বলেছি এই ইউনিটে ঢোকার পর থেকে আমার জীবনটা ডিপ্লয়ড আর ট্রেনিংয়ের বৃত্তে বন্দী হয়ে পড়ে। আফগানিস্তান আর ইরাকে পালাক্রমে পাঠানো হতো আমাদের। তুমি বিবাহিত নাকি অবিবাহিত তাতে কিছু যায় আসে না। আমাদের পুরো দুনিয়াটা হলো কাজে ডুবে থাকা। এটাই আমাদের একমাত্র অগ্রাধিকার।

নিরাপত্তার কারণেই পরিবারের সাথে বেশি সময় কাটানোটা বুদ্ধিমানের কাজ হতো না। তবে তার মানে এই নয় যে, আমরা পরিবার-পরিজনকে সম্পূর্ন উপেক্ষা করবো। আমাদেরও স্ত্রী, বাচ্চা-কাচ্চা, প্রেমিকা, সাবেকস্ত্রী আর মা-বাবা আছে। তারা সবাই আমাদের সাথে সময় কাটাতে উদগ্রীব। একজন ভালো বাবা কিংবা সন্তান হওয়ার চেষ্টা আমাদের মাঝেও তীব্রভাবে উপস্থিত। কিন্তু বছরের পর বছর যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করে নিজের ঘরে ফিরে যাওয়ার পর ভালো বাবা হওয়াটা কঠিনই হয়ে যেতো।

বাড়িতে গেলেও আমাদের এক চোখ থাকতো সংবাদের দিকে। ক্যাপ্টেন ফিলিপ্সের মতো কোনো ঘটনা ঘটলো কিনা সে ব্যাপারে সজাগ থাকতাম সব সময়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের পরিবারের লোকজন আমাদের এই জীবনযাপনের ধরণটা বুঝতো কিংবা নিদেনপক্ষে বোঝার চেষ্টা করতো। একটানা আট-নয় মাস ট্রেনিং আর ডিপ্লয়মেন্টের মধ্যে কাটানোর পর স্বাভাবিকভাবেই তারা চাইতো আমরা যেনো বাড়ি ফিরে আসি। আমরা যেনো নিরাপদে থাকি।

আমাদের কর্মজীবনে আসলে কি ঘটতো সে সম্পর্কে তারা কমই জানতো। একজন আল-কায়েদা কিংবা জঙ্গিকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে আমরা যে এই পৃথিবীটাকে আরেকটু বেশি নিরাপদ করে তুলি সেই আত্মতৃপ্তির অভিজ্ঞতা তাদের কখনও হবে না। তারা হয়তো তাত্ত্বিকভাবে এটা বুঝতে পারতো, কিন্তু তাতে করে আমাদের নিয়ে উদ্বিগ্নতা একটুও কমতো না।

পরিবারগুলো এই আশংকায় দিন কাটাতো যে কখন জানি ইউনিফর্ম পরা সৈনিক এসে দুঃসংবাদটি দেয় - আমরা আর কখনও ফিরে আসবো না। সিল'দের অনেক দক্ষ সৈনিক নিহত হয়েছে, ডেভগ্রু'দেরও এই তালিকা মোটেও ছোটো হবে না। এইসব বলিদান খামোখাই দেয়া হয় নি। যে শিক্ষা আমরা পেয়েছি, আমাদের সাহসী ভায়েরা যেরকম বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সেসব তো বিফলে যেতে পারে না।

আমার বাবা অবশ্য চান নি আমি এরকম একটি জীবন বেছে নেই। তাই আমার এই

আত্মতৃপ্তিটা তিনি সব সময় বুঝতে পারতেন না।

আলাস্কা থেকে গ্রাজুয়েশন করার পর আমি যখন বাবা মা'কে জানালাম এই পেশা বেছে নিতে চাই, তখন তাদের কেউই খুশি হতে পারেনি। আমার মা তো কখনোই ছেলেবেলায় জিআইইও বা খেলনার বন্দুক পিস্তল কিনে দেননি, কারণ তিনি মনে করতেন ওগুলো খুব বেশি হিংসাত্মক। এখন আমি মাকে ঠাট্টা করে বলি তিনি যদি শৈশবে এসব খেলনা কিনে দিতেন তাহলে হয়তো আমার মধ্যে থেকে সত্যি কারের অ্যাকশনে যাবার আগ্রহটা তৈরি হতো না। সেনাবাহিনীতেও যোগ দেওয়া হতো না।

যাইহোক, সিল-এ যোগ দেবার পর আমাদের দুটো পরিবার হয়ে গেলো যাদের সাথে কাজ করি, আর যাদেরকে ছেড়ে এসেছি কাজের সুবাদে। তবে কর্মজীবন আর পরিবারের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাটা সহজ কাজ নয়। আমাদের মধ্যে অনেকেই এটা করতে গিয়ে হিমশিম খেতো। কারোর স্ত্রী ডিভোর্স দিয়ে চলে যেতো, কেউ বা হারাতো প্রেমিকা। বন্ধুবান্ধব- আত্মীয় স্বজনদের বিয়ে, শেষকৃত্য, ছুটির দিন, সবই মিস করতাম।

আমরা আমাদের কর্মক্ষেত্র নেভিকে না বলতে পারতাম না, তবে পরিবারকে এটা বলতাম। প্রায়শই এটা করতে হতো আমাদেরকে। তাদের কাছ থেকে দূরে থাকাটা খুবই কঠিন ছিলো। কিন্তু আমাদের কাছে তো আমাদের কাজই আগে। বাকি সব কিছু পরে। আমাদের কাছ থেকে সবই কেড়ে নেয়া হতো, বিনিময়ে পেতাম খুব কম।

তবে একটা গোপন কথা বলি আমরা সবাই, এমনকি আমি নিজেও এটা দারুণ পছন্দ করতাম। সব সময়ই অপেক্ষা করতাম কখন ডাক আসে।

২০০৯ সালে আফগানিস্তানে আমার ডিপ্লয়মেন্টটা ছিলো এগারোতম কম্যবাট মিশন। ২০০১ থেকে বিরামহীনভাবে বিভিন্ন মিশনে কাজ করেছি। ইতিমধ্যে আমার দক্ষতা আর অভিজ্ঞতা অনেক বেড়েছে। তবে নতুন যারা যোগ দিচ্ছে তারাও দ্রুত হাত পাকিয়ে ফেলছে, কারণ ইরাক-আফগান যুদ্ধ তাদেরকে অভিজ্ঞতা লাভ করার অফুরান সুযোগ এনে দিয়েছে। ইরাকের তুলনায় আফগানিস্তানের দিকেই আমাদের মনোযোগ বেশি।

এরইমধ্যে স্টিভের পদোন্নতি হয়েছে। আমাদের ট্রুপে একটি টিমের চার্জ তার উপর ন্যস্ত। চার্লি এখন গ্রীন টিমের একজন ইন্সট্রাক্টর।

এই ডিপ্লয়মেন্টটা হয়েছিলো গ্রীষ্মকালে, তার মানে সেই সময় আমরা খুব ব্যস্ত ছিলাম। সাধারণত গ্রীষ্মকালেই তালিবানরা তাদের লড়াই জোরদার করতো, শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার জন্যে তাঁরা খুব বেশি সুবিধা করতে পারতো না। কোনো আমেরিকান সৈন্য যদি গ্রীষ্মকালে বেপাত্তা হয়ে যেতো আমরা সবাই নিজেদের সব কাজ ফেলে তাক খুঁজতে বেরিয়ে পড়তাম।

বাউয়ি বার্গডাল নামের এক প্রাইভেট ২০০৯ সালের ৩০ শে জুন থেকে নিখোঁজ হয়ে গেলো। একটি তালিবান গ্রুপ তাকে ধরে দ্রুত আফগান-পাক সীমান্তের কাছে নিয়ে যায়, সীমান্ত পাড়ি দেবার উদ্দেশ্যে। আমাদের ইন্টেলিজেন্স অ্যানালিস্ট অনেক খবর দিয়েছিলো। এর ভিত্তিতে আমরা বেশ কয়েকটি উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করলেও ফলাফল শূন্য থেকে যায়। ওকে পাকিস্তানে নিয়ে যাবার আগেই উদ্ধার করতে হবে- এরকম একটি তাড়া ছিলো আমাদের মধ্যে। আমাদের আশংকা ছিলো তাকে হয়তো হাক্কানি গ্রুপের মতো অন্য কোনো গ্রুপের হাতে বিক্রি করে দেয়া হবে চড়া দামে।

নিখোঁজ হবার এক মাস পর তালিবানরা বার্গডালের একটি ভিডিও প্রকাশ করে। সেখানে তাকে খুবই ভীত আর রুগ্ন দেখাচ্ছিলো।

ভিডিওটা প্রকাশের পরদিন রাতেই আমরা জানতে পারলাম তাকে কোথায় রাখা হয়েছে সেই জায়গাটার সন্ধান নাকি পাওয়া গেছে।

"ইন্টেলিজেন্স বলছে তাকে কাবুলের দক্ষিণে এই জায়গাটায় আটকে রেখেছে ওরা," আমাদের ট্রুপ কমান্ডার কাবুলের মানচিত্রে একটি স্থান দেখিয়ে বললো।

"ওখানে অভিযান চালানোর মতো পর্যাপ্ত তথ্য আমাদের কাছে নেই, কিন্তু এটা আমাদের করতেই হবে।"

অপরেশন রুমে আমরা জড়ো হলাম মিশন সম্পর্কে ব্রীফ শোনার জন্য। স্টিভ আর তার টিমও সেখানে ছিলো। পুরো ট্রুপই অভিযানে নামানোর পরিকল্পনা করা হলো। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো ঘটনাস্থল থেকে একটু দূরে অবতরণ করবো আমরা, তারপর বাকি কতটুকু অগ্রসর হব, যাতে করে তালিবানদের আরপিজি'র রেঞ্জ থেকে নিরাপদে থাকি, তারপর বাকি পথটুকু অগ্রসর হবো। এভাবে অগ্রসর হওয়াটা যে খুব বেশি নিরাপদ তা বলা যাবে না, তবে সরাসরি টার্গেট স্থলে অবতরণ করার চাইতে কম ঝুঁকিপূর্ণ। রাতের অন্ধকারেই পুরো অপারেশনটি শেষ করতে হবে। সকালের সূর্য ওঠার ঝুঁকি নেয়া যাবে না।

রাত ততোক্ষণে গাঢ় হতে শুরু করেছে। আমাদের হাতে সময় বেশি নেই। খুব দ্রুত নেমে পড়লাম অপারেশনে।

"আজ রাতটা পূর্ণিমার রাত, সুতরাং আমাদেরকে একটু বেশি সতর্ক থাকতে হবে বন্ধুগণ," ফিল বললো।

সাধারণত পূর্ণিমা রাতে আমরা অপারেশন পরিচালনা করতাম না।

আমাদের নাইটভিশন গগলগুলো যদিও সে সময় আরো ভালো কাজ করে কিন্তু সমস্যা হলো শত্রুপক্ষও আমাদের দেখে ফেলে। ফলে আমাদের বাড়তি সুবিধা অর্ধেকে নেমে আসে। তাছাড়া তালিবানরা বেশ ভালো যোদ্ধা। আমরা জানতাম এই অপারেশনে আমাদের লোকবল ক্ষয়ক্ষতি হবার সম্ভাবনাও যথেষ্ট রয়েছে।

সিএইচ-৪৭ চিনুক হেলিকপ্টারে করে আমরা রওনা দেবো। একটা খোলা ময়দানে অবতরণ করবে আমাদের হেলিকপ্টার। আমার টিমের কাজ হবে টার্গেটের পশ্চিম দিক দিয়ে অগ্রসর হওয়া আর স্টিভের টিম এগিয়ে যাবে দক্ষিণ দিক দিয়ে। এরফলে অ্যাসল্ট প্যাটার্নে আমরা ইংরেজি 'এল' অক্ষরের মতো আকৃতি সৃষ্টি করতে পারবো। সেভাবেই এগিয়ে যাবো সম্ভাব্য টার্গেট কম্পাউন্ডের দিকে।

জালালাবাদে অবস্থিত আমাদের ঘাঁটি থেকে হেলিকপ্টারে করে টার্গেট এলাকায় যেতে দেড় ঘণ্টা সময় লাগলো। ল্যান্ডিং জোনের শেষপ্রান্তে কিছু বাড়িঘর আছে। কপ্টারের র‍্যাম্প দিয়ে স্টিভের টিম মাটিতে পা ফেলতেই ঐসব বাড়িঘর থেকে তালিবানরা বের হয়ে এলো আক্রমণ করার জন্য। একজন তালিবান যোদ্ধার কাছে পিকেএম মেশিনগান ছিলো। দৌড়ে যেতে যেতে কপ্টারের রোটরের শব্দের মধ্যেই আমি অটোমেটিক অস্ত্র থেকে ফায়ারিং করার আওয়াজ শুনতে পেলাম।

পেছন ফিরে দেখতে পেলাম বুলেটের ট্রেসার ছুটে যাচ্ছে হেলিকপ্টারের দিকে। আমি কোনোমতে স্টিভের টিমের জন্য কভার দিতে পারলাম।

মেশিনগানের গুলি বর্ষণের মধ্যেই স্টিভের টিমের একজন - পাইরেট গান হিসেবে পরিচিত ছোট্ট গ্রেনেড জাতীয় লাঞ্চার বের করে ফায়ার করতে সক্ষম হলো। একটা গ্রেনেড গিয়ে পড়লো বাড়িটার মধ্যে। বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেলাম আমি। দরজাসহ বাড়িটার সামনের অংশ উড়ে গেলো। একটু বাদেই সেখানে আগুন লেগে গেলে স্টিভের দল কোনো রকম প্রাণহানি ছাড়াই এগিয়ে গেলো। বাড়িটা ক্লিয়ার করে বাকি যোদ্ধাদের হত্যা করলো তারা।

"উত্তর আর পূর্ব দিকে কিছু লোকজন আছে মনে হচ্ছে," রেডিওতে ফিল বললো।

চাঁদের আলোয় নাইটভিশন গগল্‌সে একেবারে দিনের মতোই সব দেখতে পেলাম আমি। তারা যদি আমাদেরকে খালি চোখে একশ' মিটার দূর থেকে দেখতে পায় তো আমরা দেখতে পাবো তিনশ' মিটার দূর থেকে।

আমাদের সামনে যে ময়দানটা ছিলো সেটা একেবারে সমতল। যোদ্ধার দল যে নিজেদের অস্ত্র নিয়ে পালাচ্ছে সেটা আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে একটা রাস্তা কম্পাউন্ড অতিক্রম করে উপত্যকার বাইরে দিয়ে চলে গেছে। দুজন লোককে দেখলাম মপেড বাইকে করে পালাচ্ছে। ফিলের চোখে পড়লো চারজন যোদ্ধা পশ্চিম দিকে ছোটো ছোটো বাড়িগুলোর দিকে পালাচ্ছে নিজেদের প্রাণ নিয়ে।

“আমি চারজনকে পেয়েছি,” বললো ফিল। “পশ্চিম দিকে যে লোকগুলো যাচ্ছে তাদেরকে আমরা দেখছি। তুমি মপেড বাইকে করে যারা পালাচ্ছে তাদের দেখো।”

স্টিভের টিম টার্গেট কম্পাউন্ডটি ক্লিয়ার করে ফেললো। বার্গডালের কোনো টিকিটাও খুঁজে পেলো না তারা। তবে আমরা অনুমাণ করলাম আশেপাশেই কোথাও আছে সে। এখানে অনেক বেশি যোদ্ধা, আর তাদের কাছে রয়েছে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র। আমার সাথে ছিলো দু'জন স্নাইপার আর একজন ইওডি টেক। ফিল সঙ্গে নিলো ডগ টিম আর একজন অ্যাসল্টার।

খোলা ময়দান দিয়ে দৌড়ে যাবার সময় ঘাসের নীচে লুকিয়ে থাকা এক যোদ্ধার উপর পা দিয়ে ফেলেছিলাম আমরা। তাকে আমি প্রথমে দেখতে পাই নি। আমাদের সঙ্গে থাকা একজন স্নাইপার তাকে দেখতে পেয়েই গুলি করে। ওর লাশটার সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখলাম পায়ের জুতোটা কালো চিতা! নিজেকে ভর্ৎসনা করলাম।

আরেকটু সামনে গিয়ে দেখি মপেড বাইকটা রাস্তার পাশে পড়ে আছে। দু’জন যোদ্ধার মাথা দেখতে পেলাম কাছেই একটা খড়ের গাদার ওপর। উচ্চতায় দশ ফিটের মতো হবে, প্রস্থে আরো বেশি। “আমি দু’জন প্যাক্স-এর ভিজুয়াল পেয়েছি তিনশো মিটার দূরে,” বললাম আমি। মিলিটারির ভাষায় প্যাক্স মানে মানুষ। স্নাইপাররাও তাকে দেখতে পেয়েছিলো, আমরা মাঠের মধ্যে হাটু গেঁড়ে বসে পড়ি। দ্রুত একটি পরিকল্পনা করা দরকার।

আমি রাস্তার উপরে সেটআপ করে দেখি তারা আমাকে গুলি করে কিনা,” একজন স্নাইপার বললো।

কমান্ডে সে-ই হলো সবচাইতে অভিজ্ঞ স্নাইপার। এর আগে ইরাকে কাজ করার সময় সে একজন ইরাকি স্নাইপারকে ঘায়েল করে বেশ আলোচনায় আসে। ঐ স্নাইপার বেশ কয়েকজন মেরিনকে হত্যা করেছিলো। তাকে খুঁজে বের করতে এক সপ্তাহের মতো সময় লাগলেও শেষ পর্যন্ত একটি বাড়িতে গর্তের ভেতর থেকে তাকে আবিষ্কার করে। ইটের দেয়ালে একটি ফুটো দিয়ে ঐ স্নাইপারকে সে গুলি করে হত্যা করে। রাস্তার বাম দিকে খড়ের গাদাটা।

“আমি ডান দিক দিয়ে যাচ্ছি,” বললো ইওডি টেক।

“ঠিক আছে,” বললাম আমি। “আমি মাঝখান দিয়ে এগোই। একটা হ্যান্ড গ্রেনেড খড়েরগাদার উপরে ছুড়ে মারবো।”

এই পরিকল্পনাটি আমার পছন্দ না হলেও এছাড়া আমাদের আর কোনো উপায়ও ছিলো না। হাতে সময় নেই যে ভেবে ভেবে এরচেয়ে ভালো একটি প্ল্যান করবো।

আমি সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম স্নাইপারের ভরসায়। আমার বিশ্বাস সে আমাকে কভার করতে পারবে। দুশ' মিটার দূর থেকে শট নিতে হবে-তাদের জন্য কাজটা মোটেও সহজ ছিলো না। তবে নাইটভিশন গগল্স থাকার কারণে এটা করা অসম্ভব নয়।

আমরা দ্রুত যার যার পজিশনে চলে গেলাম।

“আরইসিসিই সেট করা হয়েছে।”

আমি পিঠে করে ছোট্ট এক্সটেন্ডেবল মই বয়ে নিয়ে গেছিলাম। ঘাসের উপর ওটা রেখে ওটার গায়ে ইনফ্রারেড কেমিক্যাল লাইট অর্থ্যাৎ আইআর দিয়ে মার্ক করলাম।

“ইওডি সেট করা হয়েছে।”

রাইফেলটা বাম হাতে আর ডান হাতে একটা গ্রেনেড নিয়ে দৌড়ে ছুটে গেলাম খড়ের গাদার দিকে। যোদ্ধারা উঁকি মেরে আমাকে দেখার আগেই ছুড়ে মারতে হবে। আমি যখন খড়ের গাদা থেকে মাঝপথের দূরত্বে তখনই আমার ডান দিক থেকে একে৪৭-এর গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। ফিল আর তার দল নিশ্চয় শত্রুপক্ষকে বাগে পেয়ে গেছে।

আমি যখন খড়ের গাদা থেকে একশ ফিট দূরে ঠিক তখনই একটা মাথা উঁকি দিলো ওটার উপর থেকে। আমি একদম খোলা জায়গায়, আমার কোনো কভার নেই। আমার পক্ষে থেমে যাওয়াও সম্ভব নয়। আমাকে ঐ খড়ের গাদার কাছে যেতেই হবে। আমার হাতের

গ্রেনেডটা অতো শক্তিশালী নয় যে একটা দিয়েই খড়ের গাদাটা উড়িয়ে দিতে পারবো এতো দূর থেকে। আমাকে আরো কাছে যেতে হবে। আমার ভাবনায় ছেদ ঘটিয়ে মুহূর্তেই স্নাইপারদের বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি ঝাঁঝড়া করে দিলো ঐ যোদ্ধাকে।

যোদ্ধার পিঠে ঝুলিয়ে রাখা আরপিজি'র একটি রকেটে আগুন ধরে গেলে আতসবাজির মতো তার লাশটা জ্বলতে শুরু করলো খড়ের গাদার উপরে।

খড়েরগাদার নীচে এসে থামলাম আমি। গ্রেনেডটা উপরের দিকে ছুড়ে মেরেই গড়িয়ে সরে গেলাম যতোটা সম্ভব দূরে। বিস্ফোরণের শব্দ কানে আসতেই উঠে দৌড়াতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পর একজন স্নাইপারের কভার নিয়ে আমি আর ইওডি টেক ফিরে গেলাম খড়ের গাদার কাছে। ওখানে গিয়ে একটামাত্র লাশ খুঁজে পেলাম। তার কাঁধে ঝুলিয়ে রাখা আরপিজি রকেটটা তখনও জ্বলছে। কিন্তু অন্য যোদ্ধার কোনো হদিশ নেই।

ঐ যোদ্ধাকে যখন খুঁজছি তখন রেডিওতে একটা মেসেজ এলো।

"আমাদের এক ঈগল আহত হয়েছে, আমাদের এক ঈগল আহত হয়েছে, এক্ষুণি মেডেভ্যাক দরকার।"

আমার সঙ্গে থাকা স্নাইপার একজন মেডিক ও বটে। সঙ্গে সঙ্গে সে চলে গেলো ফিলের টিমটার কাছে। কে আহত হয়েছে সেটা মাথা থেকে ঝেটিয়ে দূর করে ঐ যোদ্ধাকে খুঁজতে শুরু করলাম।

আমি আর ইওডি টেক যোদ্ধার অস্ত্রগুলো জড়ো করলাম। লোকটার কাছে গ্রেনেড আর মরফিনের সরঞ্জাম ছিলো। তারা পেশাদার যোদ্ধা, গ্রামের সাধারণ কৃষক নয় যে ফসলের মরসুম শেষ হতেই হাতে একে৪৭ নিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়েছে।

আমরা বার্গডালকে খুঁজে পাইনি ওই মিশনে। ২০১২ সালের এই গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত সে একজন বন্দী হিসেবেই রয়ে গেছে। তবে আমার কেন জানি মনে হয় ঐ দিন সে ওখানেই ছিলো। হয়তো আমরা আসার কিছুক্ষণ আগে তাকে সরিয়ে ফেলা হয় কিংবা লড়াই চলাকালীন তালিবানরা তাকে নিয়ে সটকে পড়ে।

শত্রুপক্ষের গোলাগুলি আর অস্ত্রশস্ত্র এক জায়গায় জড়ো করে ইওডি টেক সেগুলো বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিলো।

অভিযান শেষ হতে না হতেই সিএইচ-৪৭ চিনুক হেলিকপ্টারের পরিচিত শব্দটা কানে গেলো আমার। আমাদেরকে ঘাঁটিতে নামিয়ে দেবার আগে আহত সেনাকে নিয়ে কাবুলের বাগরাম হাসপাতালে চলে গেলো ওটা।

"আলফা টু, আমি আলফা ওয়ান বলছি," রেডিওতে বললো ফিল। আমি হলাম আলফা টু, ফিল আলফা ওয়ান।

"ছেলেদেরকে একটু দেখে রেখো," ফিল বললো।

আহত ঈগলটি আর কেউ নয় স্বয়ং ফিল। তার পায়ে গুলি লেগেছে। তবে মরফিনের ডোজের কারণে ফিল কোনা ব্যথা টের পায় নি।

পরে জেনেছি যোদ্ধাদের পাকড়াও করতে গিয়ে তাদের মুখোমুখি পড়ে যায় ফিলের দল। তারা প্রথমে কুকুরটাকে গুলি করে, পরে ফিলকে বাগে পেয়ে যায়। কুকুরটা মরে গেছে। পায়ে গুলিবিদ্ধ হলেও রক্তপাতের ফলে ফিলের জীবনহানি হয়ে যেতে পারতো। তবে আমাদের সঙ্গে থাকা দু'জন মেডিকের কারণে এ যাত্রায় সে বেঁচে যায়।

"ঠিক আছে ব্রাদার, এ নিয়ে ভেবো না," বললাম তাকে। "ভালো থেকো।"

ল্যান্ডিং জোনে ফিরে এসে শুনতে পেলাম ইতিমধ্যেই একটা নতুন জোক চালু হয়ে গেছে।

"বেশ, বেশ! ফিলকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই দলের চার্জ নিয়ে নিয়েছ। আমার এক টিমমেট বললো। "আমরা দেখেছি তুমিই ওকে গুলি করেছ। ফিল তখনও হাসপাতালে যেতে পারে নি, এরইমধ্যে এইসব ফালতু জোক শুরু হয়ে গেলো।

গোট ট্রেইল্স

ফিল গুলিবিদ্ধ হবার দু'মাস পরের ঘটনা। বিশ্রামের জন্যে তাকে দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আমাদের ডিপ্লয়মেন্টের আর মাত্র তিন সপ্তাহ বাকি। ফিলকে মেডিকদের সেবা দেবার সময় থেকেই আমি টিম লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে শুরু করি। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি ফরোয়ার্ড অপারেটিং বেস অর্থাৎ এফওবি-এর অংশ হিসেবে পূর্ব আফগানিস্তানের সবচেয়ে অপলকা একটি অঞ্চলে। সেখানকার পার্বত্য এলাকায় আমাদেরকে অপারেশন চালাতে হবে।

রাতের অন্ধকারে চিনুক হেলিকপ্টারে করে আমরা ল্যান্ডিং জোনে অবতরণ করলাম। অন্ধকার হলেও নাইটভিশন গগলস পরে চারপাশে তাকিয়ে পাহাড়ি অঞ্চলটার সৌন্দর্য টের পেলাম আমি। কেমন জানি প্রশান্তিময় একটি পরিবেশ। তারপরই আকাশে কিছু একটা আমার চোখে পড়লো। কয়েক মুহূর্তের জন্যে ভাবলাম ওটা বোধহয় তারা খসা হবে। কিন্তু আমার দিকে ছুটে আসতেই ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে গেলো।

ধূ..ম..ম..ম!

ল্যান্ড করা হেলিকপ্টার থেকে মাত্র দশ ফিট দূরে একটি রকেট-প্রপেল্ড গ্রেনেড এসে আঘাত হানলো। আমার টিমমেটদেরকে শার্পনেইলের বৃষ্টিতে স্নান করিয়ে দিল ওটা। আমি কোনো রকম প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগেই অসংখ্য বুলেট আর রকেট ছুটে আসতে লাগলো আমাদের চারপাশে। ল্যান্ডিং জোনের কাছেই একটা বাঙ্কারের দিকে ছুটে গেলাম। সবাই হতভম্ব হয়ে গেছে। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম এটা আমাদের নিরাপদ অবতরণ করার জায়গা। এখানে এরকম কিছু হবে তা কারো কল্পনাতেও ছিলো না। আমাদের টার্গেট কম্পাউন্ডটি আরো দূরে অবস্থিত। সেখানে যাবার আগেই এরকম কিছু হবে কে জানতো। সাঙ্কারের

শুনতে পেলাম হেলিকপ্টারটা টেকঅফ করছে। দ্বিতীয় হেলিকপ্টারটি ওড়ার সময় ফ্লেয়ার জ্বালিয়ে দিলো ভুলক্রমে। এটা করা হয় বেসকে আক্রমণের ব্যাপারে সতর্ক করে দেবার জন্য। কিন্তু ফ্লেয়ারের উজ্জ্বল আলোয় আমাদের অবস্থান শত্রুপক্ষের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেলো। ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে আলো থেকে যতোটা সম্ভব দূরে সরিয়ে নিলাম নিজেদেরকে। যোদ্ধারা এবার বেসের দিকে তাক করে ফায়ার করতে শুরু করলো।

বাঙ্কার থেকে শুনতে পেলাম বেসের সেনারা পয়েন্ট ৫০ ক্যালিবারের মেশিনগান দিয়ে পাল্টা আক্রমণ করছে। চারপাশ থেকে গর্জে উঠছে সেগুলো। মুহূর্তেই রণক্ষেত্রে পরিণত হলো আমাদের বেসটা। পাহাড়ের প্রান্তসীমা লক্ষ্য করে অসংখ্য মেশিনগান গুলি ছুড়তে লাগলো একসাথে।

ফ্লেয়ারের আলো নিভে যেতেই অন্ধকারে মধ্যে আমরা দৌড়ে চলে গেলাম কংক্রিটের দেয়াল ঘেরা মেনপোস্টের দিকে।

ভেতরে ঢোকার পর পরই আমাদের মেডিকরা আহতদের চিকিৎসা দিতে শুরু করলো। কারোর আঘাতই মারাত্মক নয়। তবে আরপিজির শার্পনেইলের আঘাতে এক আর্মি রেঞ্জার, আমাদের দোভাষী, সঙ্গে থাকা এক আফগান সেনা আর একটি অ্যাসল্ট কুকুর আহত হয়েছে। হেলিকপ্টার দুটো আকাশের উপর চক্কর খাচ্ছিলো এতোক্ষণ, গোলাগুলি থেমে গেলে তারা উপত্যকায় নেমে আসে, সঙ্গে করে নিয়ে যায় আহতদের।

হেলিকপ্টার চলে যাবার পর ট্রুপ চিফ, টিম লিডার আর আমরা সবাই কমান্ড বাঙ্কারে মিলিত হলাম।

চার্লি এবং ট্রুপের বাকিরা বাইরের একটি ঘরে অপেক্ষা করছিলো। ডিপ্লয়মেন্টের শেষ দিকে চার্লি স্বেচ্ছায় যোগ দেয় আমাদের সঙ্গে। ফিল যেহেতু আহত তাই আমাদের একজন লোক দরকার ছিলো। চার্লি সবেমাত্র গ্রীন টিমের ইন্সট্রাক্টর হিসেবে তার দায়িত্ব শেষ

করেছে।

"শুনলাম দলের লিডার হবার জন্য নাকি তুমি ফিলকে গুলি করেছ?" আফগানিস্তানে নেমেই আমাকে বলেছিলো চার্লি, "এভাবেই কি তুমি একটা টিমের লিডার হয়েছো? আমার কাছ থেকে সাবধানে থেকো বন্ধু।" চার্লির এরকম কথাবার্তা খুব মিস করছিলাম এতোদিন। তাকে দলে পেয়ে খুব ভালো লাগলো।

ফিলের অনুপস্থিতিতে ঠাট্টা-তামাশাও বন্ধ হয়ে গেলো। তবে ফিলের অভিজ্ঞতা খুব মিস করলাম দলের মধ্যে। যদিও আমরা সবাই ভালো করেই জানি এসব কাজ কিভাবে করতে হয় কিন্তু অভিজ্ঞতার তো কোনো বিকল্প নেই।

অপারেশনের গতি এতোটাই বেশি ছিলো যে অতীত নিয়ে মাথা ঘামানোটা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়লো। চার্লির আগমণে ফিলের অভাব কিছুটা হলেও পূরণ হয়েছিলো সে সময়। গোলাগুলির সময় তার সাহস, অভিজ্ঞতা আর মাথা ঠাণ্ডা রাখার গুণাবলী আমাদের যথেষ্ট কাজে দেয়।

স্টিভের পাশে দাঁড়িয়ে আমি মানচিত্রের দিকে তাকালাম।

"ওয়েলকাম পার্টির জন্যে আমরা সত্যি দুঃখিত," আউটপোস্টের দায়িত্বে থাকা আর্মি চিফ বললো। প্রতি সপ্তাহে এরকম দু'একবার হয়ে থাকে। তোমরা শুধু বাটে পড়ে গেছো, এই যা।"

কুনার-এ অপারেশন চালানো খুবই কঠিন ছিলো। পুরো আফগানিস্তানের মধ্যে এই জায়গাতেই শত্রুপক্ষের সাথে মোকাবেলা করতে গিয়ে বেশি ঝামেলা পোহাতে হয়েছে বলে মনে করি আমি। কোনো রকম লড়াই ছাড়া ঐ অঞ্চলের ভেতরে ঢোকাটা বিরল ব্যাপার ছিলো। হিন্দুকুশ পর্বতের নীচে অবস্থিত এই অঞ্চলটি প্রাকৃতিকভাবেই প্রতিকূল। পাহাড়ের গা বেয় খুবই সরু একটি জায়গা দিয়ে যেতে হয় পার্বত্য অঞ্চলে এ রকম পথকে বলা হয় 'গোট ট্রেইলস'। আফগান যোদ্ধাদের জন্য এই অঞ্চলটি খুবই নিরাপদ। এখানে তারা বেশ সমর্থন পেয়ে থাকে। অঞ্চলটি আবার পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমের আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশের সীমান্তে অবস্থিত। ফলে যোদ্ধাদের স্বর্গভূমিতে পরিণত হয়েছে। ওখান থেকেও - তারা ব্যাপক সাহায্য পেয়ে থাকে।

২০০৬ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১০ সালের মার্চ পর্যন্ত আফগানিস্তানে যতো লড়াই হয়েছে তার পয়ষাট্টি শতাংশই কুনারে। স্থানীয় তালিবান যোদ্ধারা বিদেশী আল-কায়দা সদস্যদের সাথে যৌথভাবে কাজ করতো সেখানে। তাদের সাথে আবার যোগ দিয়েছিলো পর্যন্ত মুজাহেদিনরা।

ঐ এলাকার মানচিত্রের উপর আমরা সবাই ঝুঁকে আছি। আমাদের আউটপোস্ট থেকে দক্ষিণ দিকে, উপত্যকার আরেকটু ভেতরে আলকায়েদার কিছু উচ্চ পর্যায়ের নেতা মিটিং করছে, আমাদের পরিকল্পনা হলো সেখানে হামলা চালিয়ে সবাইকে গ্রেফতার কিংবা হত্যা করা।

আমরা আমাদের ডিপ্লয়মেন্টের একেবারে শেষপ্রান্তে চলে এসেছি। আল-কায়েদার জঙ্গিদের আক্রমণ করার এটাই শেষ সুযোগ। এই ডিপ্লয়মেন্টে আমাদের অনেকে আহত-নিহত হয়েছে। সুতরাং আমরা যদি ঠিকমতো অপারেশনটা চালাতে পারি তাহলে প্রতিশোধটাও নেয়া হবে ভালোমতো।

আকাশে ভেসে বেড়ানো ড্রোন থেকে যথেষ্ট তথ্য পেয়েছি আমরা। নির্দিষ্টস্থানে আক্রমণ করার ব্যাপারে অনেকটাই নিশ্চিত। আমরা ভ্রাম্যমান টহলদল দেখেছি আকাশ থেকে তোলা ছবিতে। বিগত কয়েক বছরে স্টিভ আর আমি সন্দেহভাজনদের চিহ্নিত করার ব্যাপারে বেশ পটু হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা জঙ্গি আর যোদ্ধাদের কর্মকাণ্ডকে বলতাম 'নেফারিয়াস অ্যাক্টিভিটি।' ড্রোন থেকে যে ফিডব্যাক পেতাম সেখানে লোকজনকে খুবই ছোটো দেখাতো, অনেকটা পিপড়ার মতো। তবে স্টিভ আর আমি এসব লোকজনের চলাচল দেখে ঠিকই বুঝে যেতাম কোনটা সাধারণ মেষপালকের দল আর কোনটা যোদ্ধাদের বহর।

বেশিরভাগ কম্পাউন্ডেরই ভ্রাম্যমান রক্ষী ছিলো না। সুতরাং এরকম কর্মকাণ্ড দেখে, ড্রোন থেকে পাঠানো ছবি আর ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট একত্র করে আমরা বুঝে গেলাম এটা নেফারিয়াস অ্যাক্টিভিটি।

আরো জানতাম আমাদেরকে এখন যুদ্ধে নেমে যেতে হবে।

প্ল্যান করা হলো আমার আটসদস্য বিশিষ্ট টিম পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে উপরে উঠে যাবে টার্গেট কম্পাউন্ডের দিকে। আমরা পাহাড়ের উপরে একটি ব্লকিং পজিশন তৈরি করবো যাতে করে যোদ্ধারা পালিয়ে যেতে না পারে। তারা আমাদেরকে এতো উপর থেকে নেমে আসার প্রত্যাশা করবে না, কারণ তাদের কম্পাউন্ডটাই উপত্যকার অনেক উপরে অবস্থিত।

বাকি দুটো টিম উপত্যকার মেইন রোডে টহল দেওয়ার কাজ করবে, পাশপাশি তালিবান যোদ্ধাদের ঠেলে দেবে আমাদের অ্যাম্বুশের দিকে। ঐ দুটো টিম যদি যোদ্ধাদের অলক্ষ্যে তাদের কাজ করে ফেলতে পারে তাহলে আমরা পাহাড় থেকে নেমে এসে কম্পাউন্ডটা ক্লিয়ার করে ফেলতে পারবো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যোদ্ধারা আমাদেরকে দেখার পর আর লড়াই করতো না, তারা বরং পালানোর চেষ্টা করতো, আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে চাইতো। তারা যাতে পালাতে না পারে সেজন্যে আমরা পাহাড়ের উপরে একটি টিম রাখলাম। ঐ টিমের কাজ হবে তাদেরকে কিলিং জোনের দিকে ঠেলে দেয়া।

অনুপ্রবেশের রুটটা সাত কিলোমিটারের হলেও পার্বত্য অঞ্চল বলে এটা খুব একটা সহজসাধ্য কাজ ছিলো না। আমার টিমকেই পাহাড় বেয়ে ওঠার কাজটা করতে হবে। আমি জানতাম এটা খুব কঠিন, তাই শরীর থেকে বুলেটপ্রুফ প্লেট, বাড়তি হ্যান্ড গ্রেনেড আর কিছু ম্যাগাজিন বাদ দিয়ে দিলাম ওজন কমানোর উদ্দেশ্যে। মিলিটারিতে একটা কথা প্রচলিত আছে : যতো হালকা ততো ভালো।

তবে বুলেটপ্রুফ প্লেট খুলে রাখার মানে তোমাকে এর পরিণাম কী হতে পারে সেটাও মনে রাখতে হবে। এখানে ল্যান্ড করার পর যে আক্রমণের মুখে পড়েছিলাম সেটা মনে পড়তেই দ্বিতীয়বারের মতো ভেবে দেখেছিলাম ওটা বাদ দেবো কিনা।

আর্মি ক্যাপ্টেনের সাথে প্ল্যান করার সময় সৈনিকেরা আমাদের দিকে বার বার তাকাচ্ছিলো। ক্লিন শেভ আর ছোটো করে চুল কাটা পরিস্কার ইউনিফর্ম পরা সৈনিকদের কাছে আমাদেরকে বোধহয় ভবঘুরে বাইকার কিংবা ভাইকিংদের মতোই লাগছিলো।

আমাদের বেশিরভাগ সদস্যেরই লম্বা চুল ছিলো। আমাদের কারো গায়েই এক রকম ইউনিফর্ম ছিলো না। একেকজনের একেক রকম ইউনিফর্ম। আমাদের চোখের উপর নাইটভিশন গগল্স, রাইফেলের উপর বসানো থামাল স্কোপ আর সাপ্রেসর।

ট্রুপের আরইসিসিই টিমের লিডার ক্যাপ্টেনকে গোট ট্রেইলস দেখালেন মানচিত্রে। আমার টিমের জন্যে রুটের নেভিগেশনের কাজটা করবেন তিনি।

রুটটা একেবারে সোজা, বললেন তিনি " আপনাদের টাইমলাইনটা কি?"

"ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগে আক্রমণ করে ফিরে আসতে চাই," বললেন আরইসিসিই টিম লিডার।

"এতো অল্প সময়ের মধ্যে এটা করতে পারবেন না," আর্মির ক্যাপ্টেন বললেন। "ঐ অঞ্চলটা খুবই দুর্গম। আলো ফোটার আগে কোনোভাবেই কাজ সারতে পারবেন না।"

আমরা এ নিয়ে তর্ক করলাম না। আমাদের চেয়ে তারা এই জায়গাটা অনেক ভালো চেনে, জানে। দিনের আলোয় এই এলাকাটি তারা ভালোমতো দেখে থাকে।

"আপনারা কি ওখানে কখনও গেছেন?" ট্রুপ চিফ জিজ্ঞেস করলেন। মানচিত্রে টার্গেট কম্পাউন্ডটা দেখিয়ে দিলেন তিনি।

"এরচেয়ে বেশি ভেতরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের নেই," টার্গেটের চেয়ে অর্ধেক দূরত্বে একটি স্থান দেখিয়ে বললেন। "ওখানে যেতেই আমাদের ছ'ঘণ্টা সময় লেগেছিলো। তারপর প্রচণ্ড লড়াইয়ের সম্মুখীন হই। বাধ্য হয়ে উপত্যকায় ফিরে আসতে হয়েছিলো।"

আমরা প্ল্যান নিয়ে আরো কয়েক মিনিট আলোচনা করে যাই। ট্রুপের চিফ আমাদের

দিকে তাকালেন। আমি, স্টিভ আর বাকিরা উন্মুখ হয়ে রইলাম তার কাছ থেকে কিছু শোনার জন্যে।

"তোমরা কি মনে করো?"

এই টার্গেটটা কোনোভাবেই বাদ দিতে চাইছিলাম না আমরা। কিছু অ্যাসল্টার আর কুকুর ছাড়াও আমাদের যে লোকবল রয়েছে তাতে এরকম একটি অপারেশন করা খুবই সম্ভব। ড্রোন থেকে টার্গেটের উপর নজরদারি করা হচ্ছে, তাদের কোনো নড়নচড়ন নেই। এক জায়গাতেই আছে। সুতরাং তাদেরকে আচম্বিত হামলা করার সুযোগ রয়ে গেছে।

"আসুন, কাজটা করে ফেলি," ট্রুপ চিফ আমার দিকে তাকালে বললাম। স্টিভও আমার কথায় সায় দিলো।

তোমরা কি তাহলে যাচ্ছো?" ক্যাপ্টেন বললেন।

"হ্যা।" ট্রুপ চিফের জবাব।

"আজরাতে আমাদের ঘাঁটিতে ওদের আক্রমণটা আমাদের অপারেশনের জন্য বিরাট সুবিধা হতে পারে," আর্মির ক্যাপ্টেন বললেন। "তোমাদের সাথে একটা পেট্রল টিম দিয়ে দিলে কেমন হয়?" তিনি আমাদের সাথে ২০ জন সৈনিকের একটি পেট্রল টিম, পাঠিয়ে দিতে চাইলেন উপত্যকার নিচে গ্রামটির কাছে। "আমরা তার পেট্রল টিমের পেছন পেছন অনুসরণ করে ওখানে চলে যাবো, টার্গেট উপত্যকায় আক্রমণ চালানোর আগে। যোদ্ধাদের লোকজন যদি পাহারায় থাকে তাহলে তাদের নজরে পড়বে পেট্রল দলটি। বাজি ধরে বলতে পারি, তারা তখন ওদের পেছনেই লাগবে।

"যাবার আগে আমরা কি কিছু গোলাবারুদ নিয়ে নিতে পারবো আপনাদের কাছ থেকে?" ট্রুপ চিফ বললেন।

"অবশ্যই, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

আমাদের টিমে আরেকজন পুরনো বন্ধু ওয়াল্ট যোগ দিয়েছিলো তখন। আমরা একই সাথে ট্রেনিং করেছিলাম, তবে ইন্সট্রাক্টরদের সাথে কী এক ঝামেলা করার কারণে তাকে একটু পিছিয়ে পড়তে হয়। আমার পরে সে গ্রীন টিমে সুযোগ পায়। ওয়াল্টের লম্বা চুল আর শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব চোখে পড়ার মতো। আকারে ছোটোখাটো হলেও ব্যক্তিত্বের দিক থেকে সে দৈত্যতুল্য। আমার মতো সেও অস্ত্র আর শুটিং পছন্দ করতো।

আমাদের টিমটা দ্রুত একত্রিত হলে আমি তাদেরকে জানালাম আমাদের পরিকল্পনায় কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। আমরা এখন একটি পেট্রলের সাথে যাচ্ছি।

"মেইন ট্রেইল পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে যাবো তারপর টার্গেটের খুব কাছে গিয়ে ঠিক করে নেবো বাকিটা," বললাম আমি। "কারোর কি কিছু বলার আছে?"

সবাই একসাথে মাথা দুলিয়ে না করলো।

"না," বললো চার্লি। "সব ঠিক আছে।"

কি করা দরকার সেটা আমরা সবাই জানতাম, আমাদেরকে শুধু বেসিক প্ল্যানটার প্রয়োজন ছিলো। আপনি যদি জানেন 'কিভাবে গুলি করতে হয়,। মুভ করতে হয় আর যোগাযোগ করতে হয়' তাহলে বাকিটুকু আপনা আপনিই হয়ে যাবে। তাছাড়া যতো সূক্ষ্ম পরিকল্পনাই করা হোক না কেন সেটা একটু না একটু বদল হবেই। সুতরাং সব কিছু সহজভাবে নিলেই ভালো। এরকম কাজ তো আমরা আগেও করেছি। আমাদের টিমের উপর পুরোপুরি আস্থা রয়েছে সবার।

পেট্রল টিম গেট দিয়ে বের হয়ে গ্রামের দিকে এগিয়ে গেলো একটি পাকা রাস্তা ধরে। রাস্তাটা খুবই ভালো, সম্ভবত আমেরিকানদের করের টাকায় বানানো। পেট্রল টিম থেকে এক কিলোমিটার দূরত্ব বজায় রেখে আমরা এগোতে শুরু করলাম। এভাবে দু'ঘণ্টা ধরে তাদেরকে অনুসরণ করে গেলাম আমরা। একটা সময় অনেকগুলো গাড়ি দেখতে পেলাম। রাস্তার পাশে একটি হাইলাক্স ট্রাক আর দুটো স্টেশন ওয়াগনকে পার্ক করে থাকতে দেখলাম আমি। স্টেশন ওয়াগনের ছাদে র‍্যাক আছে। সবগুলো গাড়িই ফাঁকা। ভেতরে কেউ নেই।

এ পর্যন্তই তারা যেতে পেরেছে।

জায়গাটা পথের শেষ। এখান থেকে মাটির তৈরি রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে উপত্যকার দিকে চলে গেছে এঁকেবেঁকে। প্রতিটি পদক্ষেপে টের পেলাম বেশি উঁচুতে ওঠার ঝক্কিটা। সঙ্গে থাকা সাজসরঞ্জামগুলো যেনো আরো ভারি হয়ে গেছে। কমে এসেছে চলার গতি। মনে মনে আশা করলাম এসব কষ্ট যেনো স্বার্থক হয়।

আরো এক ঘণ্টা এভাবে চলার পর আমাদের টার্গেট কম্পাউন্ডটা চোখে পড়লো আমার। ওটার কাছে একটি ভবন থেকে দুটো মৃদু আলো জ্বলতে দেখলাম। গাছপালার জন্য ভবনগুলো অনেকটাই ঢাকা পড়ে গেছে। ভবনগুলো পাথর আর কাদামাটি দিয়ে তৈরি, উপত্যকার দেয়াল ফুড়ে যেনো মাথা উঁচু করে বের হয়ে আছে।

ওখানে যাবার যে মেইন রোডটা আছে সেটা দিয়ে গেলে খুব সহজেই পৌঁছানো যাবে কিন্তু আমরা জানি ওখান থেকে কিছু রক্ষী পথের উপর কড়া নজর রাখছে। এরকম ঝুঁকি কোনোভাবেই নিতে পারি না। বিরামহীনভাবে ড্রোন থেকে রিপোর্ট পাচ্ছি মেইন রোড আর কম্পাউন্ডের আশেপাশে গাছগাছালির ভেতরে ভ্রাম্যমান টহল দল রয়েছে।

চমকে দেয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কুনারের দুটো পয়েন্টের মাঝখানে একটি গোট ট্রেইল আছে। অন্য পথ দিয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় ছিলো না। সূর্য ওঠার পর ঐ উপত্যকায় থাকতে চাইবে না কেউ।

“আমরা সরাসরি পাহাড়ের প্রান্তসীমা ধরে এগিয়ে গিয়ে একটু ঘুরে ওখানে যাবো,” রেডিও'তে আরইসিসিই লিডারকে বলতে শুনলাম আমি।

আমার পা দুটো আর চলতে চাইলো না। কিন্তু আমরা সবাই জানি সঠিক জায়গাতেই এসেছি আমরা।

রাস্তা থেকে আক্ষরিক অর্থেই আমরা পাহাড় চড়তে শুরু করলাম গোট ট্রেইলের খোঁজে। আমরা কেউ কোনো কথা বলছিলাম না তারপরও শুনতে পেলাম আমার টিমমেটেরা হাঁসফাঁস করছে।

আমরা সবাই এই টার্গেটটাকে খুব আকর্ষণীয় বলে মনে করেছিলাম। কাজটা করার জন্য উদগ্রীব ছিলাম সবাই। প্রতিটি পদক্ষেপে আমার মধ্যে শুধু একটাই চিন্তা কাজ করছিলো—টার্গেটটা খুবই মূল্যবান কিছু হবে।

কয়েক ঘণ্টা পাহাড় চড়ার পর অবশেষে আমরা গোট ট্রেইল পেয়ে গেলাম। আমি যারপরনাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। পা দুটো আর চলতেই চাইছিলো না। দম ফুরিয়ে হাঁপাতে লাগলাম। তবে ট্রেইল পর্যন্ত পৌছাতে পেরে নতুন করে আশাবাদী হয়ে উঠলাম। আমাদের আরইসিসিই'র লোকগুলো সন্দেহাতীতভাবেই নিজেদের কাজে সেরা। তাদের নিখুঁত হিসেব আর পরিকল্পনা ছাড়া এ রকম একটি অপারেশন সফলভাবে সম্পন্ন করা অসম্ভব ছিলো।

গোট ট্রেইল'টা এক ফুটের বেশি চওড়া হবে না, সেটার অবস্থান পাহাড়ের প্রান্তসীমায়। ওটার একদিকে পাহাড়ের খাড়া চড়াই চলে গেছে বহু উঁচুতে, আর অন্যদিকটায় সোজা নেমে গেছে নীচের উপত্যকায়। ভুল পদক্ষেপের ফলে কতোটা নীচে পড়ে যাবো এ নিয়ে খুব বেশি ভাবার সময় আমাদের হাতে ছিলো না। ট্রেইলটা খুঁজে বের করতেই ঘণ্টাখানেক সময় লেগে গেছিলো আমাদের। এদিকে ভোর হতেও খুব বেশি দেরি নেই। সুতরাং সময় খুবই মূল্যবান ছিলো।

আমাদেরকে এগিয়ে যেতেই হলো।

ট্রেইলের পাথুরে জমিন কেটে সিঁড়ির মতো ধাপ তৈরি করা। বৃষ্টির সময় ছিলো বলে জায়গায় জায়গায় কাদামাটিও পাওয়া গেলো। একটু উঁচুমতো জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার টিম মেইন কম্পাউন্ডটা দেখতে পেলো। ওটাই আমাদের টার্গেট।

“আলফা সেট করা হয়েছে,” রেডিওতে বললাম।

স্টিভের টিম আমার টিমের আগেভাগে ডান দিক দিয়ে এগিয়ে গেলো।

“চার্লিও সেট,” রেডিওতে বললো স্টিভ।

"ব্রাভো সেট।"

ব্রাভো টিম কম্পাউন্ডের দক্ষিণ দিক দিয়ে ঢুকবে বলে এগিয়ে যেতে যেতে বললো।

প্রবল উত্তেজনা দেখা দিলো আমার মধ্যে। কোনোরকম ক্লান্তি অনুভব করলম না আর। আমরা সবাই সতর্ক, কড়া দৃষ্টি কম্পাউন্ড আর তার আশেপাশে। সবকিছু যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী করতে পারি তাহলে আমাদের শত্রু একদম চমকে যাবে। কিন্তু উল্টাপাল্টা কিছু ঘটে গেলে আমরা ছোট্ট একটি এলাকার মধ্যে গানফাইটের শিকার হবো। সেটা মোটেও ভালো হবে না।

"এগিয়ে যেতে থাকো," রেডিওতে চিফ বললেন। "আস্তে আস্তে।"

সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে গেলাম আমরা। কম্পাউন্ডের খুব কাছে এসে বুঝতে পারলাম ভেতরে আমাদের শত্রুরা হয়তো ঘুমাচ্ছে। আমাদের ইউনিটটা অন্য সব ইউনিটের মতো নয় যে রাস্তার পাশে আচমকা বোমা হামলা কিংবা অ্যাম্বুশের শিকার হবো। আমরা হিসেব করে সব কিছু বুঝেশুনে কাজ করি। আমাদের কৌশল একেবারেই অনন্য। ঠিক কখন আক্রমণ করতে হবে, ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে শত্রুর উপর সেটা যেমন জানি তেমনি জানি কখন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে সঠিক সময়ের জন্য।

নিজের হৃদস্পন্দনটা কানে গেলো। মনে হলো চারপাশের সব শব্দই যেনো বহুগুন বেড়ে গেছে। চার-পাঁচ পা এগিয়ে এগিয়ে থেমে যেতে লাগলাম। আমাদের সবার অস্ত্র সামনের দিকে তাক করা। কম্পাউন্ডের দরজা আর জানালার দিকে আমার রাইফেলের লেজার তাক করা আছে। কাউকে দেখামাত্রই অ্যাকশন শুরু হয়ে যাবে। আমার টিমমেটদের লেজার রশ্মিগুলোও চোখে পড়লো।

আস্তে আস্তে এগোও, মনে মনে বললাম আমি। একেবারে চুপিসারে। প্রথম বিল্ডিংটার কাছে পৌছে কাঠের একটি দরজার নবে হাত রাখলাম। দরজাটা লক করা।

ডান দিকের আরেকটি বিল্ডিংয়ের দরজার নব ধরে দেখলো চার্লি, সেটাও লক। আমদের মধ্যে কোনো কথা হচ্ছে না, নেভি সিল'দের মতো চমকপ্রদ হাতের ইশারা ব্যবহার করি না আমরা। চার্লির দিকে তাকিয়ে শুধু মাথা নেড়ে সায় দিলাম। এরপর ঘুরে বিল্ডিংয়ের অন্যপাশটায় চলে এলাম। এটা কম্পাউন্ডের দেয়াল ঘেরা প্রাঙ্গণ।

ছোট্ট একটা দরজা দিয়ে সেখানে ঢোকার ব্যবস্থা আছে। ওয়াল্ট সেই দরজাটার তালা কেটে ফেললো।

ভেতরে ঢুকে আমি, স্টিভ আর ওয়াল্টসহ টিমের সবাই দেখতে পেলাম প্রাঙ্গনের অপরপ্রান্তে সারি সারি ঘরের দরজা। আরো দেখতে পেলাম একজন আরইসিসিই স্নাইপার ঘরের ছাদে উঠে আশেপাশের উঁচু জায়গায় কোনো রক্ষী আছে কিনা দেখতে শুরু করে দিয়েছে।

আমার টিমের পয়েন্ট ম্যানের নেতৃত্বে বিল্ডিংয়ের সামনের দরজার কাছে চলে এলাম আমরা।

ওয়াল্ট দরজার নব ধরেই বুঝতে পারলো ওটা লক করা নেই। আস্তে করে দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিয়েই সে দেখতে পেলো একটা লোক অন্ধকারে ফ্লাশলাইট হাতরাচ্ছে। লোকটাকে পরাস্ত করার জন্য ভেতরে ঢুকতেই কম্বলের নীচ থেকে অন্য একজন লোক উঠে বসলো। তার পরনে চেস্ট র‍্যাক, বালিশের পাশে একটি একে৪৭ রাইফেল। ওয়াল্ট এবং তার পেছনে থাকা একজন সিল সদস্য গুলি চালিয়ে দুজনকেই মেরে ফেললো। ওয়াল্ট যে ঘরে ঢুকেছিলো তার বিপরীত দিকের আরেকটি ঘরে ঢুকে স্টিভ দেখতে পেলো একদল নারী আর শিশু রয়েছে সেখানে।

সেই ঘরে টিমের একজনকে রেখে বাকিদের নিয়ে স্টিভ বের হয়ে গেলো পাশের ঘরটায় তল্লাশী চালানোর জন্য।

স্টিভের টিমের একজন আরইসিসিই স্নাইপার বিল্ডিংয়ের পেছন দিকে ছিলো, উপত্যকার দিকে চলে যাওয়া রাস্তার দিকে তাকাতেই জানালার ভেতর দিয়ে সে দেখতে পায় ছয়-

সাতজন তালিবান যোদ্ধা নিজেদের অস্ত্র হাতে তুলে নিচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার করা শুরু করে সে, আর একই সঙ্গে স্টিভও তার দলবল নিয়ে ঐ ঘরের দরজার কাছে পৌছে যায়।

ধাক্কা মেরে দরজা খুলে ফেলতেই স্টিভ দেখতে পায় যোদ্ধারা পড়িমরি করে কভার নেয়ার চেষ্টা করছে।

"গ্রেনেড মারো।"

স্টিভের টিমের একজন দরজার ভেতরে একটি গ্রেনেড ছুঁড়ে মারলে, ওটার বিস্ফোরণেই ঘরের সব যোদ্ধা নিহত হয়।

আমি যে বিল্ডিংয়ের সামনে ছিলাম, সেখানকার দরজার সামনে পৌছাতেই স্নাইপারের সাপ্রেস রাইফেলের ফায়ারের শব্দ শুনতে পেলাম। পাহাড়ের উপর বসে এক সশস্ত্র রক্ষী মেইন রোডটা পাহারা দিচ্ছিলো। তার কাছে ছিলো একটি একে৪৭ আর আরপিজি।

আমার পয়েন্ট ম্যান ধাক্কা মেরে দরজা খুলে প্রথম ঘরটা ক্লিয়ার করে ফেললো। বাড়িটার মেঝে খুবই নোংরা, এখানে সেখানে উচ্ছিষ্ট খাবার, জামা-কাপড় আর তেলের ক্যান পড়ে আছে। আমার পয়েন্ট ম্যান আচমকা গুলি করা শুরু করলো। সশস্ত্র এক যোদ্ধা পেছন দিককার জানালা দিয়ে লাফিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিলো। গুলি খেয়ে জানালা থেকে মুখ থুবড়ে নীচে পড়ে গেলো সে।

শুনতে পেলাম বাইরে ব্রাভো টিম তাদের অটোমেটিক অস্ত্র দিয়ে গুলি করতে শুরু করে দিয়েছে।

ধূ..ম..ম..ম..ম!

প্রচণ্ড শব্দে আমরা হকচকিয়ে গেলাম। আমরা যেসব অস্ত্র ব্যবহার করি সেগুলোতে সাপ্রেসর লাগানো থাকে ফলে গুলির শব্দ খুব ভোতা শোনায়।

"উত্তর দিক থেকে একদল আসছে," রেডিও'তে আমার কমান্ড নেট থেকে বলা হলো। আরেকদল যোদ্ধা উপত্যকা থেকে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ইতিমধ্যেই এই টার্গেটে তিন তিনটি ফায়ারফাইট চলছে, এখন আবার বাড়তি কিছু যোদ্ধা এসে যোগ দিতে যাচ্ছে তাদের সাথে।

ব্রাভো টিম এক এক করে এগিয়ে আসতে থাকা পাঁচজন যোদ্ধাকে ঘায়েল করতে পারলো। তাদের সঙ্গে ছিলো আরপিজি আর ভারি মেশিনগান। পাহাড়ের উপরে বিশাল একটি পাথর খণ্ডের আড়াল থেকে এক রক্ষী গুলি করে যাচ্ছিলো বৃষ্টির মতো, ব্রাভো টিমের একজন তাকেও ঘায়েল করতে সক্ষম হলো।

কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি এসি-১৩০'র গুঞ্জন কানে এলো আমার। রেডিওতে শুনতে পেলাম ট্রুপ কমান্ডার বলছে এসি-১৩০ উত্তর দিক থেকে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকা যোদ্ধাদের নির্মূল করছে।

"তুমি এখানে থাকো," আমার টিমমেটকে বললাম।

একজন সিল আর তাকে রেখে বিল্ডিং থেকে আমি বের হয়ে এলাম। তারপর চার্লি আর আমি মিলে এই বিল্ডিং আর নীচের আরেকটি বিল্ডিংয়ের মাঝখানে যে গলিটা চলে গেছে সেটা ক্লিয়ার করে ফেললাম।

সবগুলো বিল্ডিংয়ের একই ধরণের সিঁড়ি আর দেখতেও প্রায় একই রকম।

গলিটা খুবই সরু, ওটার শেষ মাথা দেখা যায় না কারণ দু'পাশের দেয়ালগুলো চলে গেছে বহু দূর পর্যন্ত। তাছাড়া ময়লা আবর্জনা আর মালপত্র রেখে দেয়া হয়েছে সেসব দেয়াল ঘেষে। দেখতে পেলাম দুটো বিল্ডিংয়ের মাঝখানে দড়ি দিয়ে কাপড় টাঙিয়ে রাখা হয়েছে।

এরকম সরু গলি বলে আমি আর চার্লি একে অন্যের বিপরীতে দেয়ালে পিঠ দিয়ে এগোতে শুরু করলাম। আমি কভার করলাম তার দিকটা আর সে আমারটা। এটা অ্যাঙ্গেলের খেলা।

যতোটুকু সম্ভব নিঃশব্দে এগিয়ে চললাম সেই গলি দিয়ে। কখনও একটু দ্রুত, কখনও বা

ধীরে ধীরে। গলির মাঝামাঝি আসতেই চার্লি গুলি করে বসলো।

ঠাস ঠাস ঠাস!

আমি থেমে গেলাম। আমার সামনে কি আছে সেটা দেখতে পেলাম না। গুলি থামিয়ে আবার সামনের দিকে এগোতে শুরু করলো চার্লি। কয়েক সেকেন্ডের জন্য আমার থেকে মাত্র তিন কদম দূরে এক যোদ্ধাকে দেখতে পেলাম দেয়ালে পিঠ দিয়ে ঢলে পড়ছে। মেঝেতে লুটিয়ে পড়লে দেখা গেলো তার কাছে একটি শটগান ছিলো।

সব সময় আমরা বুলেটপ্রুফ প্লেট পরে থাকি, ফলে এরকম অস্ত্রের গুলি আমাদেরকে কাবু করতে পারে না। আমার মতো আজকে চার্লিও সেটা পরে নি। এ দিক থেকে আমরা অনেকটাই অরক্ষিত। গলিটা ক্লিয়ার করে শেষ মাথায় চলে এলাম।

"আজ রাতে যদি আমি গুলি খাই, তাহলে কেউ যেনো আমার মাকে না বলে যে আমি প্লেট পরি নি," ফিসফিসিয়ে বললাম চার্লিকে।

"ওকে, তাই হবে," বললো চার্লি। "আমার মাকেও বোলো না।"

একটু পরই রেডিওতে শুনতে পেলাম 'সব ক্লিয়ার।' টার্গেটকে সিকিউর করা হয়েছে। এখন আমাদেরকে সেন্সেটিভ সাইট এক্সপ্লয়টেশন, যাকে সংক্ষেপে এসএসই বলি, সেটা করতে হবে। সাধারণত আমরা মৃতদেহের ছবি তুলি, অস্ত্রশস্ত্র আর বিস্ফোরক জড়ো করে ধ্বংস করি এবং কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক কিংবা কাগজপত্র থাকলে সেগুলো নিয়ে নেই।

বিগত বছরগুলোতে এসএসই বেশ বিবর্তিত হয়েছে। একটা অভিযোগ বেশ চালু হয়ে গেছে, আমরা যেসব যোদ্ধাদের হত্যা করি তারা নাকি নিরীহ কৃষক। আমরা জানতাম কয়েক দিন পর গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ মাতব্বররা ন্যাটোর অফিসে গিয়ে নিরীহ লোকজন হত্যা করার অভিযোগ আনবে আমাদের বিরুদ্ধে।

নিরীহ লোক বলতে যাদেরকে বোঝাতো তাদের কাছে একে৪৭ আর আরপিজি পাওয়া গেছে। সুতরাং এগুলো প্রমাণ হিসেবে রাখতে হবে। আমরা যাদেরকে হত্যা করেছি তারা সবাই সশস্ত্র যোদ্ধা ছিলো।

"আমাদের হাতে সময় একদম নেই, সুতরাং একটু জলদি করো," ট্রুপ চিফ বললেন। "উত্তর দিকে এখনও কিছু যোদ্ধা রয়ে গেছে।"

তার কণ্ঠটা মিইয়ে গেলো উপত্যকার একশ' মিটার উপরে এসি১৩০'র ১২০ মিমি শেলের প্রচণ্ড শব্দে। ঘড়িতে সময় দেখলাম। ভোর চারটা বেজে গেছে। অন্ধকার শেষ হয়ে আলো ফুটতে শুরু করেছে এখন। ড্রোন থেকে রিপোর্ট আসতে লাগলো আরো অনেক যোদ্ধা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

ছবি তোলার পর অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ কম্পাউন্ডের প্রাঙ্গনে জড়ো করে পাঁচ মিনিট ডিলে টাইম দিয়ে দিলাম বিস্ফোরককে।

তারপর আর দেরি না করে ছেলেদের নেতৃত্বে চুপচাপ প্রস্থান করতে শুরু করলাম দলবল নিয়ে। কম্পাউন্ড থেকে মাত্র বের হয়েছি তখনই বিস্ফোরণের শব্দ কানে গেলো। আলোকিত করে ফেললো চারপাশ।

এখানে আসার চেয়ে চলে যাওয়াটা অনেক সহজ হলো। কারণ পাহাড়ি পথের ঢালু দিয়ে নীচে নেমে যেতে হলো আমাদের। মিশনটা ভালোমতো শেষ করতে পেরে আমাদের সবার মধ্যেই আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেলো। চলে যাওয়ার পথে বেশ কিছু জায়গায় আমাদেরকে থামতে হলো যোদ্ধাদের কারণে। তারা আমাদেরকে হন্যে হয়ে খুঁজছিলো। এয়ার সাপোর্টে সেইসব যোদ্ধাদের তাড়িয়ে দেয়া সম্ভব হলো প্রতিবারই। ঐ উপত্যকায় আর বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব ছিলো না। বিশেষ করে দিনের আলো ফুটতে শুরু করার সময়।

কম্পাউন্ডটা ক্লিয়ার করার তিনঘণ্টা পর আমরা সবাই বেসে ফিরে এলাম। সবাই ক্লান্ত। হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে পড়লো। প্রচুর জল আর পাওয়ার জেল পান করলাম। হাতের সামনে যা-ই পেলাম তা-ই খেলাম।

অপারেশন সেন্টারে ক্যাপ্টেনের কাছে আমাদের সব এসএসই তুলে দিলাম। অভিযোগ

পেলে তিনি এসব প্রমাণ দেখাতে পারবেন।

"ইকেআইএ মোট সত্তরজন," ট্রুপ চিফ বললেন ক্যাপ্টেনকে, এর অর্থ এনিমি কিলড ইন অ্যাকশন- আমরা সত্তরজন যোদ্ধাকে হত্যা করেছি। "আমাদের ধারণা আরো সাত-আটজন মারা গেছে এসি-১৩০'র আক্রমণে।"

কম্পিউটারে ছবিগুলো দেখে আর্মির ক্যাপ্টেন তো হতবাক হয়ে গেলেন। তার সেনারা শত্রুর সাথে এরকম লড়াই খুব একটা করে না। তাদের কাজ রাস্তাঘাট আর গ্রামগুলো পাহারা দেয়া। এই আউটপোস্টে আক্রমণ করা তালিবান যোদ্ধাদের নির্মূল করতে পেরে আমাদের খুব ভালো লাগলো।

হেলিকপ্টারে করে জালালাবাদে ফিরে যাবার সময় এই মিশনটা নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখি। এরকম একটি প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে আমাদের পক্ষে কোনো হতাহত না হয়েই তালিবানদের হত্যা করে আসাটা সত্যি-ই অসাধারণ একটি ব্যাপার।

আগের অপারেশনের মতো হেলিকপ্টার থেকে দড়ি বেয়ে টার্গেটে না নেমে আমরা চুপিসারে ঢুকে পড়েছিলাম শত্রুর ডেরায়। কোনো চিৎকার চেঁচামেচি ছিলো না। অনেকটা পরিকল্পনা মোতাবেকই সব ঘটেছে। এটি একটি আদর্শ মিশন হিসেবে টেক্সটবুকে ঠাঁই পেতে পারে।

তাদেরকে অনুসরণ করে আমরা তাদেরই ঘাঁটিতে চলে যাই, হত্যা করি প্রায় সবাইকে। এই মিশনটা প্রমাণ করে ভালো পরিকল্পনা আর সতর্ক পদক্ষেপ একত্রে মিলে মারাত্মক একটি জিনিস হয়ে উঠতে পারে।

ডি.সি'তে স্পেশাল মিটিং

আমি ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে নীল আকাশের দিকে তাকালাম। এটা ২০১১ সালের বসন্তের শুরুর দিককার কথা। ১১ই সেপ্টেম্বর ২০১১ সাল থেকে যে বিরামহীন মিশনে ছিলাম তার মধ্যে একটু অবসর পেয়েছিলাম তখন। নিজের জায়গায় ফিরে এসে আমি অনেক খুশি।

আমার শেষ ডিপ্লয়মেন্টটা একটু ধীরগতির ছিলো। শীতকালের মিশনগুলো এমনটিই হয়ে থাকে কারণ যোদ্ধারা এ সময় পাকিস্তানে চলে যেতো, অপেক্ষা করতো আবহাওয়া উষ্ণ হবার জন্য। আমার তিন সপ্তাহের ছুটি চলছে। ছুটি শেষে আমার ট্রুপ মিসিসিপি'তে যাবে ট্রেনিং নিতে।

আমাদের শেষ ডিপ্লয়মেন্ট শেষ হবার পর স্টিভকে গ্রীন টিমে পাঠিয়ে দেয়া হয় ইন্সট্রাক্টর হিসেবে কাজ করার জন্য। কিন্তু আমরা তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় সংবর্ধনা জানাই নি।

সকালবেলায় ব্যয়াম করছিলাম আমি, তখনই স্টিভের সাথে দেখা হয়ে গেলো।

"আমার একটু বিশ্রাম দরকার," বললো সে। "গ্রীন টিমে ভালোই কেটেছে দিনগুলো কিন্তু নতুন নতুন সব নিয়ম-কানুনের ফলে ওখানে থাকার সব মজা নষ্ট হয়ে গেছে এখন।"

"বুঝলাম," বললাম তাকে। "টিম লিডার হিসেবে আরেকবার কাজ করো তারপর দেখা যাবে।" আমাদের এখানে যারা আছে তারা সবাই অভিজ্ঞ আর দক্ষ। এক ডজনের নীচে ডিপ্লয়মেন্ট নেই কারো। পরিবার-পরিজন থেকে দূরে থাকার পরও আমরা মিশনে যাবার জন্যে ভেতরে ভেতরে উদগ্রীব হয়ে থাকতাম। সি বার কাজ তারা সবাই।

"বিরতিটা খুব অল্প দিনের হবে," স্টিভকে বললাম । খুব জলদি তুমি ট্রুপ চিফ হিসেবে আবার ফিরে আসবে এখানে।"

"তাহলে আমরা দু'জনেই পাওয়ারপয়েন্টের শিল্পটা ভালোমতো শিখতে পারবো," বললো সে।

আফগানিস্তানের সবকিছুই দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছিলো। প্রতিটি ডিপ্লয়মেন্টেই নতুন নতুন নিয়ম আর সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হতাম আমরা। একটা মিশন অনুমোদন করতে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পাওয়ারপয়েন্টের স্লাইড দেখানোর দরকার পড়তো। আইনজীবি আর স্টাফ অফিসাররা প্রতিটি পৃষ্ঠা আগাগোড়া পড়ে দেখতো। নিশ্চিত হতে চাইতো আফগান সরকারের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য হয় কিনা। লক্ষ্য করলাম দিন দিন মিশনের সংখ্যা কমে আসছে কিন্তু সেনাবাহিনীর সদস্যদের পত্রপাঠ বিদায় করার ঘটনা বাড়ছে। এখন মিশনে যাবার সময় নিয়মিত সেনাবাহিনীকে সঙ্গে নিতে হয়। তারা দেখে আমাদের অপারেশনে উল্টাপাল্টা কিছু হচ্ছে কিনা।

সব কিছু পাল্টে গেছে। আগের মতো আর কিছু নেই।

শেষ ডিপ্লয়মেন্টের একটি অপারেশনে আমাদেরকে রীতিমতো অকেজো করে রাখা হলো চূড়ান্ত মুহূর্তে। একটি বিল্ডিং ঘেরাও করার পর একজন দোভাষী হ্যান্ডমাইক নিয়ে চিৎকার করে যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলো তারা যেনো সুবোধ বালকের মতো মাথার উপর হাত তুলে এক এক করে বাইরে বেরিয়ে আসে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ঠিক একইভাবে পুলিশ অপরাধীদের ধরপাকড় করে থাকে। যোদ্ধারা বেরিয়ে আসার পর আমরা বিল্ডিংটা ক্লিয়ার করি। এভাবেই অপরেশনগুলো পরিচালিত হতে লাগলো। ভেতরে যদি অস্ত্র পাওয়া যেতো তাহলে যোদ্ধাদের গ্রেফতার করতাম, সেটাও সাময়িক সময়ের জন্যে। কয়েক মাস পরেই দেখা যেতো ওইসব যোদ্ধা ছাড়া পেয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রায়শই দেখা যেতো একটি ডিপ্লয়মেন্টে কাউকে একাধিকবারও গ্রেফতার করেছি।

ব্যাপারটা এমন হয়ে গেলো, যেনো আমরা এক হাতে লড়াই করছি আর অন্য হাতে পেপারওয়ার্ক সারছি। কাউকে গ্রেফতার করা হলেও তার জন্য দু-তিন ঘন্টা পেপার ওয়ার্ক করতে হতো। গ্রেপ্তার করে কাউকে বেসে নিয়ে আসলে, সেখানে তাকে প্রথম করা হতো

“আপনার সাথে কি খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে?” জবাবটা হ্যাঁ হওয়া মানে নির্ঘাত একটি তদন্ত কমিটি, আরো বেশি পেপারওয়ার্ক।

আমাদের শত্রুরা এইসব আইন-কানুনের ফায়দা লুটতে খুব বেশি দেরি করলো না।

তারা তাদের কৌশল আমাদের চেয়েও দ্রুত বদলাতে শুরু করে। আমার প্রথম দিককার ডিপ্লয়মেন্টের সময় যোদ্ধারা বুক চিতিয়ে লড়াই করতো। আর সাম্প্রতিক সময়ের ডিপ্লয়মেন্টে তাদেরকে দেখতাম ধরা পড়ার আশংকা দেখা দিলে অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে ফেলতো। কারণ তারা জেনে গেছে নিরস্ত্র অবস্থায় তাদেরকে গুলি করতে পারবো না আমরা। ফলে তাদেরকে গ্রেফতার করলেও কয়েক দিন পর ছাড়া পেয়ে চলে যেতো যার যার গ্রামে। সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে আবার যোগ দিতো পুরনো দলে।

ব্যাপরটা খুবই হতাশাজনক। আমরা নিজেদের জীবনের মূল্যবান সময় আর শ্রম ব্যয় করছি কি এরকম কাজ করার জন্য? প্রশ্নটা সবার মনেই উঁকি দিতে শুরু করে এক সময়। কাজের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে শুরু করি। নিজের জীবন বিপন্ন করার কোনো অর্থই খুঁজে পেতাম না।।

“গুডলাক,” বললো স্টিভ। “কে জানে আগামী বছর কী দেখতে পাবো?”

আমি হেসে ফেললাম। “হয়তো আমাদের হাতে বিবি গান ধরিয়ে দেবে,” বললাম তাকে। “টেসার আর রাবার বুলেট ব্যবহার করতে বলবে।”

আমি আমার সরঞ্জামগুলো গুছিয়ে নিলাম। ভার্জিনিয়া বিচে গরম অনেক বেড়ে গেছে। তবে সমুদ্রে সাঁতার কাটতে ভালোই লাগে। মিসিসিপি’তে যাবার আগে কিছু কাজ করা দরকার।

প্রথম জিনিসটা হলো আমার ঘরের সামনে যে ঘাসের লন আছে তার জন্য একটি কভার লাগানো।

ঘরে ফিরে দেখলাম পুরনো মডেলের একটি ফোর্ড গাড়ি আমার ড্রাইভওয়ে’তে পার্ক করা। গাড়ির ড্রাইভার বিশাল আকারের একটি তারপলিন বিছিয়ে রেখেছে লনের উপর। পাশের একটি বাড়িতে বাগানের কিছু সরঞ্জাম ডেলিভারি দিয়ে ফিরে আসার সময় তাঁর সাথে আমার দেখা হয়ে গেলো। এই লোকটার সাথে আগে আমার দেখা হয় নি। তবে আমার কিছু টিমমেট তার কথা বলেছিলো। সে নাকি ভালো কাজ করে। তারপলিনটা আমি একাই বিছিয়ে দিতে পারতাম কিন্তু সে কাজ করার মতো সময় আমার হাতে নেই। তাই ওকে ভাড়া করেছিলাম।

“আপনি তো ঐ টিমেই আছেন, তাই না?” বললো লোকটা।

“হ্যা।”

তাকে দেখে আমার মনে হলো খুব সহজেই একজন সিল হিসেবে উতরে যেতে পারে সে, তবে লম্বা চুলগুলো কেটে ফেলতে হবে। দীর্ঘাঙ্গ, সুঠাম দেহের অধিকারী, বাহুতে ট্যাটু আঁকা।

“আন্দাজ করছি আপনিই ওটার নেতৃত্বে আছেন। একটু আগে জে'র বাড়িতে কাজ করে এলাম। আপনি তো তাকে চেনেনই, নাকি?”

“ও আমার বস্,” বললাম তাকে। “আগামী সপ্তাহে আমরা মিসিসিপিতে গিয়ে শুটিং প্র্যাকটিস করবো।”

জে আমার স্কোয়াড্রন কমান্ডার। তবে তাকে যে খুব ভালো করে চিনি তা নয়। আমার শেষ ডিপ্লয়মেন্টের আগে সে স্কোয়াড্রনের দায়িত্ব পেয়েছিলো। আমাদের সাথে মিশনে খুব একটা যেতো না সে। সুতরাং তার সঙ্গে একসাথে কাজ করা হয় নি কখনও। তার র‍্যাঙ্কের কর্মকর্তারা বেশিরভাগ সময় জয়েন্ট অপারেশন্স সেন্টারেই (জেওসি) ব্যস্ত থাকে। কেবলমাত্র আমাদের অপারেশনের অনুমোদনের দরকার পড়লে তার দেখা পেতাম।

আমরা আমাদের অফিসারদেরকে ‘মেহমান' বলে ডাকতাম। কারণ নিজেদের ক্যারিয়ারে আরেকটি মাইলফলক পেরোনোর আগে অল্প কিছুদিনের জন্যে তাদের আগমণ ঘটতো।

এক দায়িত্ব থেকে আরেক দায়িত্বে পালাবদল হতো তাদের। আমাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন থাকতোও না, কারো সাথে সখ্যতাও তৈরি হতো না। অন্য দিকে, আমরা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর একই টিমে কাজ করতাম। স্কোয়াড্রনে ঢোকার পর জে ছিলো আমার চতুর্থ কমান্ডিং অফিসার।

আমার মনে হয় উনি খুব ব্যস্ত আছেন," তারপলিনের কারিগর বললো।

আমি অবাক হলাম। আমাদেরকে তো তিন সপ্তাহের ছুটি দেয়া হয়েছে। "তুমি কি বলছো?"

"গতকাল আমি তার লনের বাগানটায় কাজ করেছি," বললো সে। "ওয়াশিংটন ডি.সি'তে বিরাট কিছু হচ্ছে। তিনি ওখানে চলে গেছেন।"

"কি?" বুঝে উঠতে না পেরে আমি বললাম। "আরে দু'দিন পর আমাদের সঙ্গে তারও মিসিসিপি'তে যাবার কথা।"

ঐ সময়টাতে আরব বসন্ত চলছিলো। মিশরের সরকার বদল হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ চলছে পুরোদমে। গৃহযুদ্ধের কবলে লিবিয়া, বিদ্রোহীরা ন্যাটোর সাহায্য চাইছে। সিরিয়ার অবস্থাও সঙ্গীন। আফগানিস্তান আর ইরাকের কথা না হয় বাদই গেলো। কী ঘটতে পারে সে ব্যাপারে আন্দাজ করাও খুব কঠিন।

আমাদেরকে সাপ্তাহিক ব্রীফ করা হতো বিশ্বব্যাপী বর্তমান আর আসন্ন হুমকিগুলোর ব্যাপারে। আমাদের ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট সারাবিশ্বের সব খবরই রাখে। আমাদেরকে যতো বেশি অবহিত করা যাবে আমরা ততো ভালো প্রস্তুতি নিতে পারবো।

একটা মিশন নিয়ে দিনের পর দিন রিহার্সেল করে সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় বসে থাকাটা আমাদের জন্য বিরল কোনো অভিজ্ঞতা ছিলো না। এসব মিশনের মধ্যে কোনো কোনোটির অনুমোদন পাওয়া যেতো ওয়াশিংটন থেকে, আবার অনেকগুলোর আদৌ কোনো অনুমতি মিলতো না। এতোগুলো বছর কাজ করার পর আমরা বুঝে গেছি, নিজেদের কাজে মনোযোগ দেয়া ছাড়া আমাদের কিছু করার নেই। আন্দাজ আর অনুমাণ করার কাজগুলো অন্যদের জন্যেই তোলা থাক।

ঐ তারপলিন কারিগরের কথাটাকে আমি অতোটা গুরুত্ব দিই নি। তবে মনে মনে খুশি হয়েছিলাম আমি কোনো অফিসার নই বলে। অফিসাররা আমাদের চেয়ে দশগুন বেশি ঝক্কি পোহায়। যাইহোক মিসিসিপিতে গিয়ে একটু মজা করতে পারবো বলে আশা করেছিলাম।

মিসিসিপির এই ট্রেনিংটা গ্রীন টিমে চান্স পাওয়ার মতো কোনো ব্যাপার ছিলো না। বটম ফাইভ, টপ ফাইভ এসবের বালাই নেই। শুধু নিজের সিকিউবি একটু ঝালিয়ে নেয়া ছাড়া।

কেউ খেয়াল করলো না জে আর স্কোয়াড্রন মাস্টার চিফ মাইক আমাদের সাথে নেই। তারপলিন কারিগরের কথাটা আমার মনে পড়ে গেলো। আমি ভাবতে লাগলাম ডি.সি'তে হচ্ছেটা কি।

বুধবার আমরা আবার ভার্জিনিয়ায় নিজের আস্তানায় ফিরে আসার পর মাইকের কাছ থেকে একটা টেক্সট মেসেজ পেলাম : "মিটিং ০৮০০।" নিজের বেসে ফিরে এসে আরো জানতে পারলাম আমার মতো অনেকেই এরকম মেসেজ পেয়েছে। সেই রাতে চার্লি আমাকে ফোন করলো।

"তুমি কি মেসেজ পেয়েছো?" বললো সে।

"হ্যা। কিছু বুঝলে? ঘটনা কি?"

"না। বুঝতে পারছি না। শুধু জানি ওয়াল্টও মেসেজ পেয়েছে," বললো সে। "আমার মনে হয় একটা লিস্ট করা হয়েছে।"

আরো কয়েকজনের নাম বললো চার্লি, তার ধারণা এদেরকেও লিস্টে রাখা হয়েছে। পুরো টিমে শুধুমাত্র সিনিয়রদেরকেই স্থান দেয়া হয়েছে তাতে।

"এসব কেন করা হচ্ছে সেটা খুঁজে বের করার তর সইছে না আমার," বললাম তাকে। "খুবই সন্দেহজনক লাগছে।"

ওয়ার্কিং ইউনিফর্ম পরে পরদিন সকালে কমান্ডের সাথে দেখা করলাম। মিটিংটা হলো সিকিউর কনফারেন্স রুমে, তার মানে ওখানে কোনো ফোন নেয়া যাবে না। সিকিউরিটির দরজা পেরোনোর জন্যে আমাদেরকে স্পেশাল ব্যাজ দেখাতে হলো। রুমের দেয়ালগুলো সীসার আস্তরণে ঢাকা যাতে লিসেনিং ডিভাইস কাজ করতে না পারে।

কনফারেন্স রুমের ভেতরে চারটা ফ্ল্যাট-স্ক্রিন টিভি আছে কিন্তু সবগুলোই বন্ধ। দেয়ালে কোনো ছবি কিংবা মানচিত্র নেই। কারোর কোনো ধারণা নেই কেন আমাদেরকে এখানে ডেকে আনা হয়েছে। চেয়ারে বসতেই চোখে পড়লো ওয়াল্ট, চার্লি আর টম নামের গ্রীন টিমের আমার এক ইন্সট্রাক্টরকে। আমাকে দেখে মাথা নেড়ে সম্ভাষণ জানালো সে।

টম ছিলো স্টিভের পুরনো বস, তাই স্টিভকে না ডাকার কারণটা বোধগম্য। তারপরও স্টিভ কেন নেই সেটা নিয়ে ভেবে গেলাম। তবে আমার মনে হলো শেষ পর্যন্ত যখন এটা ফলপ্রসু কিছু হবে না তখন শেষ হাসিটা সে-ই হাসবে।

সিল আর ইওডি টেকসহ ঘরে মোট ত্রিশজন লোক ছিলো। আরো ছিলো সাপোর্ট ডিপার্টমেন্টের দু'জন। মাইক শুরু করলো তার ব্রীফিং। স্কোয়াড্রন কমান্ডার জে অনুপস্থিত। মনে হলো মাইক কিছুটা অস্বস্তির মধ্যে আছে, সে আমাদেরকে বিস্তারিত কিছু জানালো না।

“আমরা একটি জয়েন্ট রেডিনেস এক্সারসাইজ করতে যাচ্ছি, এই ট্রেনিংয়ের জন্য আমাদেরকে উত্তর-ক্যারোলিনায় যেতে হবে,” কথাটা বলেই কি কি সরঞ্জাম সঙ্গে নিতে হবে সেটার একটা তালিকা দিয়ে দিলো সে। “আমার কাছে পর্যাপ্ত তথ্য নেই। তোমরা নিজেদের স্ট্যান্ডার্ড অ্যাসল্ট সরঞ্জামগুলো নিয়ে নিলেই হবে। বাকিটা সোমবার জানাবো।”

লিস্টটা পড়ে দেখলাম। নতুন কিছুই নেই—অস্ত্র, গোলাবারুদ, সরঞ্জাম—এসবই আমরা ব্যবহার করে আসছি।

“আমরা কতোদিনের জন্য যাচ্ছি?” আমার এক টিমমেট জানতে চাইলো।

“এখনও জানি না,” বললো মাইক। “আমরা সোমবার রওনা দিচ্ছি।”

“আমরা কি তাবুতে থাকবো নাকি ব্যারাকে?” প্রশ্নটা চার্লির।

“থাকার ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। সব দেয়া হবে,” বললো মাইক।

আরো অনেকে অনেক প্রশ্ন করতে গেলে, মাইক তাদেরকে নিবৃত্ত করলো। প্রশ্ন করার জন্য আমি হাত তুলতেই মাইক মাথা নেড়ে চুপ করে যেতে বললো আমাকে। ঘরের চারপাশে আবারো তাকালাম। যারা আছে তারা সবাই বেশ সিনিয়র। অভিজ্ঞও বটে। মনে হলো সেরাদের নিয়ে একটি ড্রিম টিম গঠন করা হচ্ছে।

আমার মাথায় অনেক প্রশ্ন ঘুরছিলো তখন। আমি এসবের জবাব চাইছিলাম। কি করতে যাচ্ছি সেটা না জেনে কোনো কাজ করতে গেলে আমার মধ্যে অস্বস্তি দেখা দেয়।

“গোছগাছ করা নিয়ে চিন্তা করো,” আমরা উঠে যাবার আগে বললো টম। “সোমবার বাকিটা জানতে পারবে।”

কি নিতে হবে, কি করতে হবে সেটা তো আমরা ভালো করেই জানি। জিনিসপত্র রাখার কেজ-এ চলে গেলাম। সেখানে দেখা হলো আমার টিমের একজনের সাথে।

কোথাও যাবে নাকি?”

এক্সারসাইজ আছে,” বললাম তাকে। আমাদের অনেককে তারা মিটিংয়ে ডেকেছিলো আজ। উত্তর-ক্যারোলিনায় যাচ্ছি সোমবার। এটাকে তারা ‘জয়েন্ট রেডিনেস এক্সারসাইজ’ নাম দিয়েছে।”।

আমার মতো অবস্থা মাইকেরও। তার মুখ দেখে মনে হলো সে বলতে চাইছে, “ব্যাপারটা কি?”

জিনিসপত্র গোছগাছ করতে করতে আমারা অনুমাণ করার চেষ্টা করলাম কি হতে পারে এটা। কেউ কেউ ধারণা করলো আমাদেরকে খুব শিগ্গির লিবিয়ায় পাঠানো হবে। অন্যেরা সিরিয়া নিয়ে বাজি ধরলো। ইরানে যাবার কথাও বললো কেউ কেউ। তবে আমাদের মধ্যে

সবচেয়ে সাহসী আর অভিনব কথা বললো চার্লি।

"আমরা ইউবিএল'কে ধরতে যাচ্ছি।"

এফবিআই, সিআইএ'র মতো ওসামা বিন লাদেনকেও আমরা সংক্ষেপে ইউবিএল নামে ডাকি। যদিও সবাই তাকে উসামা না বলে ওসামা বলে ডাকে, কিন্তু সত্যি কথা হলো আরবিতে তার নামের উচ্চারণ হয় 'উসামা' হিসেবে, তাই সংক্ষেপে তাকে আমরা ইউবিএল নামেই ডাকি।

"কি করে বুঝলে?" বললাম তাকে।

"দেখো, তাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করলাম প্ল্যানটা কি তখন তারা বললো আমাদেরকে এমন এক ঘাঁটিতে নিয়ে যাবে যেখানে ট্রেনিংয়ের সব ব্যবস্থা করা আছে," বললো চার্লি। "ব্যাপারটা যদি ওসামা সংক্রান্ত না হতো তাহলে আফগানিস্তান - পাকিস্তানেই আমাদের নিয়ে যাওয়া হতো। ওখানে তো আমাদের অনেক ঘাঁটি রয়েছে। কিন্তু না। আমাদেরকে আমেরিকার মাটিতেই ট্রেনিং দেয়া হবে। ব্যাপারটা মনে হচ্ছে খুবই গোপনীয়। এমনকি আমাদের কাছেও সব খুলে বলা হচ্ছে না। এ থেকে বুঝে নিলাম এটা ইউবিএল'ই হবে।"

"আরে না," ওয়াল্ট বললো। "আমার তা মনে হচ্ছে না। আমি ইসলামাবাদেই ছিলাম। ঐ ব্যাটাকে অনেক খুঁজেছি। জায়গাটা একেবারে নরকের মতো।"

২০০৭ সালে আমার ষষ্ঠ ডিপ্লয়মেন্টের সময় আফগানিস্তানের খোস্ত প্রদেশের অপারেটিং বেস চ্যাপম্যানে সিআইএ'র সাথে কাজ করেছিলাম। এই খোস্ত প্রদেশেই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের উপর বিমান হামলা চালানো হাইজ্যাকাররা প্রশিক্ষণ নিয়েছিলো। জায়গাটা আল-কায়েদা আর তালিবান যোদ্ধাদের বিচরণ ক্ষেত্র। পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকলে খুব সহজেই সীমান্ত পেরিয়ে তারা পাকিস্তানে চলে যেতে পারতো।

ডিপ্লয়মেন্টের মাঝপথে আমাদের টিমসহ পুরো স্কোয়াড্রনটাকে ডেকে পাঠানো হলো জালালাবাদে। সিআইএ'র এক সোর্স রিপোর্ট করেছে যে ওসামা বিন লাদেনকে তোরা বোরা নামক এলাকায় দেখা গেছে। ২০০১ সালে এই একই জায়গায় আমেরিকান বাহিনী তাকে প্রায় ধরেই ফেলেছিলো।

২০০১ সালের ডিসেম্বরের ১২ তারিখে শুরু হওয়া এই সংঘর্ষ চলেছিলো পাঁচদিন ব্যাপী। ধারণা করা হয়েছিলো খাইবার পাসের কাছে সাদা পাহাড়ের এক গুহায় বিন লাদেন লুকিয়ে আছে। ঐ গুহাটা ঐতিহাসিকভাবেই আফগান যোদ্ধাদের নিরাপদ জায়গা ছিলো। আশির দশকে সিআইএ'র টাকায় এটি সংস্কার করে উন্নত করা হয়। ঐ সময়টাতে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে আমেরিকান সরকার এইসব মুজাহেদিনদের সরাসরি সাহায্য করেছিলো।

এর আগে আফগান-আমেরিকান বাহিনী যৌথভাবে অপারেশন চালিয়েও বার বার আল কায়দার নেতাকে ধরতে ব্যর্থ হয়েছিলো। এখন সিআইএ'র সোর্স বলছে সে নাকি তোরা বোরায় আছে।

"তারা তোরা বোরাতে ঢিলেঢালা সাদা আলখেল্লা পরা লম্বা মতোন এক লোককে দেখেছে," কমান্ডার বলেছিলেন। "সে হয়তো চূড়ান্ত একটি হামলা করার জন্য ওখানে ফিরে এসেছে আবার।"

১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর ছয় বছর কেটে গেছে, তাকে আমরা ধরতে পারি নি। এর আগে যতোবার তার অবস্থানের ব্যাপারে তথ্য পাওয়া গেছিলো শেষ পর্যন্ত সেগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তবে এবার তোরা বোরায় তার অবস্থানের খবরটি আমরা বিশ্বাস করলাম।

আফগান-পাক সীমান্তে অবস্থিত তোরা বোরায় অবতরণ করবো প্লেন থেকে-তারপর টার্গেট এলাকায় রেইড দেবো। তাত্ত্বিকভাবে এটা চমকপ্রদ বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু বুঝতে হবে, একজন মাত্র লোকের কাছ থেকে পাওয়া, এই তথ্যের উপর ভর করে অপারেশন চালানোটা বিবেচকের কাজ হবে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে একক কোন সোর্সের দেয়া তথ্য শেষ পর্যন্ত ভুল প্রমাণিত হয়। এই রিপোর্ট সম্পর্কে কোনোভাবেই

নিশ্চিত হওয়া গেলো না। ডজন ডজন ড্রোন তোরা বোরার আকাশে দিন-রাত ঘুরে বেড়ালেও ঐ রিপোর্টের সত্যতা পাওয়া যায় নি।

আমরা ওখানে পৌছানোর কয়েক দিন পরই মিশনটা শুরু হবে বলে বলা হলেও বেশ দেরি করা হলো।

প্রতিদিন নতুন নতুন বাহানা দেখানো হলো আমাদেরকে।

"বি-১ বম্বার বিমানের অপেক্ষা করছি।"

"রেঞ্জার্সরা এখনও এসে পৌছায় নি।"

"আমাদের স্পেশাল ফোর্স আফগান ইউনিটগুলোকে সঙ্গে নিয়ে ওদিকে রওনা দিয়েছে।"

মনে হলো আফগানিস্তানে নিযুক্ত সব জেনারেলই এই মিশনের সাথে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত থাকতে চায়।

অপারেশন লঞ্চ করার আগের দিন রাতে ওয়াল্ট আর আমাকে ডেকে পাঠানো হয় অপারেশন সেন্টারে।

"পরিস্থিতি অন্য দিকে মোড় নিয়েছে। তোমাদেরকে পাক মিলিটারির সাথে কাজ করতে হবে," বললেন কমান্ডার। "সীমান্তের কাছে যদি আমাদের টার্গেটকে পাওয়া যায় তাহলে তোমরা আর পাকমিলিটারি একযোগে ব্লকিং পজিশন তৈরি করবে।"

"আমরা কি সাজসরঞ্জাম গোছাতে শুরু করবো?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"হ্যা। সব গোছগাছ করো। পাকিদের সাথে হয়তো তোমাদের অপারেটিং করতে হবে।"

ওখানে নামার পর খবর পেলাম ওয়াল্টকে ইসলামাবাদে থেকে যেতে হবে কারণ পাকিস্তানীরা শুধুমাত্র আমাদের একজনকে তাদের সাথে নিয়ে যেতে দেবে। আমি যেহেতু সিনিয়র তাই মিশনে যাবার সুযোগটা আমার কপালেই জুটলো। আমার সাথে যোগ দিতে পারলো একজন ইন্টেলিজেন্স অফিসার আর এক কমিউনিকেশন টেকনিশিয়ান।

এক সপ্তাহ ধরে আমি একটি ইউ আকৃতির ভবনের কমান্ড সেন্টারে বসে বসে কাটিয়ে দিলাম। তোরা বোরার আকাশে ঘুরে বেড়ানো ড্রোন থেকে রিপোর্ট পেতাম রেডিওতে। যে রাতে আমি পাকিস্তানে এসে পৌছলাম সে রাত থেকেই এয়ারফোর্স বোমা হামলা চালাতে শুরু করে টার্গেট এলাকায়। বোমা হামলার পরই ওখানে আসল্ট টিম যাওয়ার কথা। আমার টিমমেটরা যথারীতি তোরা বোরায় অবতরণ করে বিন লাদেন আর তার যোদ্ধাদের খুঁজতে শুরু করে।

আমি বার বার পাকমিলটারিদের কমান্ড সেন্টারে ডেকে এনে ড্রোন থেকে আসা রিপোর্টগুলো দেখাতাম। একবার কয়েকটি ড্রোন থেকে এমন একটি জায়গার ছবি পাওয়া গেলো যেখানে দেখা গেলো সীমান্তের কাছে একটি ক্যাম্প রয়েছে। লোকগুলোকে মিলিটারির ইউনিফর্ম পরা বলে মনে হচ্ছিলো না কিন্তু পাকমিলিটারির অফিসাররা আমাকে জানালো ওটা তাদের সীমান্ত চেকপয়েন্ট।

আমার কাছে ব্যাপারটা খুবই খটকার মতো লাগলো। আমি বুঝতে পারছিলাম না পাকমিলিটারিদের বিশ্বাস করবো কি না। তাদের একেকজন একেকরকমের। কার কি উদ্দেশ্য, কে কোথা থেকে কোন প্রেক্ষাপট থেকে উঠে এসেছে আমার জানা নেই। ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা কোনো সাহায্য করতে পারলো না আমাকে। নিজেকে মনে হলো একজন রাজনীতিক-যেনো পাকি আর আমার বসদের একসাথে খুশি করার ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছি।

এরকম পরিস্থিতিতে পাকমিলিটারি ঐ অপারেশনে আমার অংশগ্রহণ বন্ধ করে দিলো, কারণ পুরো মিশনটাই ব্যর্থ হয়েছিলো। পরদিনই আমরা ফিরে আসি নিজেদের জায়গায়। ইসলামাবাদে এসে দেখা হয় ওয়াল্টের সাথে। আফগানিস্তানে ফিরে যাবার জন্যে সে প্রস্তত ছিলো।

আমাদের শত প্রচেষ্টা আর শ্রম শেষ পর্যন্ত নির্জন পাহাড়ি এলাকায় ব্যাপক বোমা

নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে অসাড় প্রমাণিত হলো। সাদা আলখেল্লা পরা কোনো লোকের টিকিটাও দেখা যায় নি ওখানে। আফগানিস্তানে ফিরে যাবার পর এই 'সাদা আলখেল্লা'র ব্যাপারটা ব্যর্থ মিশনের বেলায় ব্যবহৃত হতে শুরু করলো।

উত্তর-ক্যারোলিনায় গিয়ে ট্রেনিং করাটাও ওরকম কোনো ব্যর্থ মিশনের জন্যেই করা হচ্ছিলো বলে মনে করেছিলাম আমরা। তবে সেটা সোমবারের আগে পর্যন্ত। একটা দরকারে আমাকে আরো একদিন ভার্জিনিয়া বিচে থেকে যেতে হয়। ফলে আমাকে রেখেই বাকিরা চলে যায় ক্যারোলিনায়। আমি চাইছিলাম টিমের সাথেই যেতে। মাইকের কাছে গিয়ে জানিয়েছিলাম আমাকে যেনো টিমের সাথেই পাঠানো হয়।

"এ নিয়ে এতো উতলা হয়ো না," বলেছিলো মাইক। "মঙ্গলবার চলে যেয়ো।"

সোমবার বিকেল থেকেই চার্লি আর ওয়াল্টকে মেসেজ পাঠাতে শুরু করলাম, জানতে চাইলাম ওখানে গিয়ে তারা কি বুঝছে। তারা দু'জনে প্রায়

একইরকম মেসেজ পাঠালো "যতো দ্রুত পারো এখানে চলে আসো।"

তাদের মেসেজে তাড়া ছিলো কিন্তু বিস্তারিত কিছু বলা ছিলো না। তার মানে অপরেশনটা নিয়ে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। সোমবার রাতে আমার চোখে আর ঘুম এলো না।

মঙ্গলবার ভোরবেলায় আমি আমার ফোর্ড গাড়িটা নিয়ে রওনা দেই ক্যারোলিনার উদ্দেশ্যে। ওখানে পৌছাই সকাল সাতটা বাজে।

প্রবেশপথের গার্ডদের কাছে নিজের নাম বললে তারা লিস্টের সাথে মিলিয়ে দেখলো। একটা লেমিনেটেড সিকিউরিটি ব্যাজ আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে ঢুকতে দিলো ভেতরে।

বেসটা পাইন গাছের একটি বনের মতো। সকালে ভালো বৃষ্টি হয়েছে। বাতাস খুব মিষ্টি।

ওখানে রিপোর্ট করার তিন ঘণ্টা আগেই পৌছে গিয়েছিলাম। তাতেও আমি খুশি হতে পারি নি। কারণ পুরো একটা দিন পিছিয়ে ছিলাম বাকিদের থেকে।

পুরো বেসটার চারপাশে দশ ফিট উঁচু কংক্রিটের দেয়াল। বাইরে থেকে ভেতরের কম্পাউন্ডটা দেখার কোনো সুযোগ নেই। কম্পাউন্ডে ঢুকে দোতলার একটি বিল্ডিংয়ের সামনে আমার গাড়িটা থামলো। তখনই দেখতে পেলাম আমার টিমের দু'জন ঐ বিল্ডিংটায় ঢুকছে। আমাকে দেখে তারা এগিয়ে এলো।

"এতো সকালে এসে পড়েছো," বললো তাদের মধ্যে একজন। "আমরা এইমাত্র ব্রেকফাস্ট করে এলাম। কখন রওনা দিয়েছো?"

একদম ভোরে," বললাম তাদের। "এবার বলো আমাদের কেন এখানে নিয়ে আসা হয়েছে?"

"কথাটা শোনার জন্যে প্রস্তুত আছো তো?"একজন বললো হেসে। "ইউবিএল।"

"আরে বলো কি!"

"হ্যা। ইউবিএল," অন্যজন জানালো। "তারা তাকে খুঁজে পেয়েছে।"

"কোথায়?" আমি জানতে চাইলাম।

"পাকিস্তানে।"

পেসার

ওরা আমাকে পথ দেখিয়ে একটা কনফারেন্স রুমে নিয়ে এলো, এটাকেই অপারেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফোল্ডিং টেবিলের উপর ল্যাপটপ আর প্রিন্টার রাখা, দেয়ালে ঝোলানো পাকিস্তানের মানচিত্র। ওটার ঠিক পাশেই অ্যাবোটাবাদ শহরের মানচিত্রও আছে একটা। রুমের বেশিরভাগ আসবাবগুলো ফক্স লেদারে মোড়া, সেই সাথে আন্ডার স্টাফ কুশন আর ধাতব হাতল। ওরা রুমের বাকি লাউঞ্জ ফার্নিচারগুলো একপাশে গাদা করে রেখে, রুমটাতে জায়গা বের করেছে যাতে বেশিরভাগ জায়গা গিয়ার রাখার জন্যে বা অন্যান্য কাজে লাগানো যায়। রুমের ভেতরে চুপচাপ কর্মরত কয়েকজন সিআইএ অপারেটিভ ছাড়া আর কেউ নেই। আমি মনোযোগ দিয়ে দেয়ালে ঝোলানো মানচিত্র আর ফটোগ্রাফগুলো দেখার চেষ্টা করলাম কিন্তু আমার মাথাটা এতোই গরম হয়ে আছে যে কিছুতেই মনোযোগ দিতে পারলাম না। আমি আসলে তখনো ভাবতেই পারছিলাম না ওরা আসলেই শেষ পর্যন্ত ওসামা বিন লাদেনকে খুঁজে পেয়েছে।

কারণ এই লোকটা ছিলো জীবন্ত আতঙ্ক, একে ধরার জন্যে কখনোই কোন সঠিক ক্লু পাওয়া যায় নি। আফগান যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মানুষ তাকে ধরতে চাইতো, মনে মনে স্বপ্ন দেখতো একদিন সে ধরা পড়বে। কিন্তু আসলেই আমরা শেষ পর্যন্ত তাকে ধরার জন্য সত্যিকার একটা অপারেশন চালাতে যাচ্ছি, এটা একটা ভাগ্যের ব্যাপার। তবে গোটা ব্যাপারটাকে এখন সফল পরিণতি দেয়া একটি নিখুঁত পরিকল্পনার দরকার। তবে আমার কেন জানি মনে হচ্ছিলো আজকে মঙ্গলবারের এই সময়ে এই অপারেশন সেন্টারে আমাদের উপস্থিতি অবশ্যই একটা ভালো কিছু খবর বয়ে আনবে। অপারেশনটার জন্যে বর্তমান কোন রানিং ট্রুপকে না এনে সবচেয়ে সিনিয়র এবং অভিজ্ঞ স্কোয়াড্রন লিডারদেরকে আনা হয়েছে।

মাইক ভেতরে ঢুকে আমাদেরকে প্রস্তুতি চার্টের সামনে দাঁড়ানো দেখতে পেল। ইওডি টেকসহ ওটাতে আঠাশজনের নাম আছে। এরই মধ্যে একজন অনুবাদক এবং কমব্যাট অ্যাসল্ট কুকুরসহ টিমটা বেশ চমৎকার একটা রূপ নিয়েছে।

"আলিকে নেয়া হয়েছে এজেন্সি থেকে," মাইক বললো। আলি হল সেই অনুবাদকের নাম। এই টিমের জন্যে আরো চারজনকে অতিরিক্ত রাখা হয়েছে, ট্রেনিংয়ে কেউ যদি আহত হয় তবে এদের ভেতর থেকে রিপ্লেস করা হবে। "আমরা পুরো টিমটাকে চারভাগে সাজিয়েছি, আর প্রতিটি ভাগের জন্যে একজন করে লিডার ঠিক করা হয়েছে," মাইক কথা শেষ করলো।

টমও এই লিডারদের একজন।

"তুমি থাকবে চক ওয়ানে, " মাইক বললো। "আর দক্ষিণ দিকের গেস্টহাউস সি-ওয়ান সামলানোর দায়িত্ব থাকবে তোমার টিমের উপর।"

সি-ওয়ান হল বাড়িটার মূল ভবনের বাইরের একটা গেস্টহাউসের নাম, সম্ভবত বিন লাদেন ওটাতেই অবসর সময়ে থাকে। আর চক ওয়ান এবং চক টু হল আমাদেরকে মিশনে নিয়ে যাবার জন্য যে দুটো হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হবে তাদের নাম।

মাস্টার চিফ, আমি খেয়াল করলাম চার্লি আর ওয়াল্টও চক ওয়ানে থাকবে কিন্তু ভিন্ন একটা দলে। আমাদের মিশনের জন্যে এই হেলিকপ্টার দুটো সিলেক্ট করার কারণ হল সুযোগ সুবিধা এবং সক্ষমতার দিক দিয়ে এই দুটো একদম একই রকমের। চক ওয়ান আর চক টু যেন একে অপরের প্রতিবিম্ব। আমার টিমে একজন অফিসার আছে যার দায়িত্ব হল কোন কারণে জে'র বার্ড ক্ষতিগ্রস্থ হলে সে কাজ শুরু করবে। মাইক আমাদের মাস্টার চিফ। সেও আমাদের টিমেই আছে। কিন্তু তার দায়িত্ব নামার পর আমাদের দিক নির্দেশনা দেয়া এবং আমাদের টাইমলাইন ঠিক রাখা।

আমাদের টার্গেটের লে-আউট এখনো পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। দেয়ালে ঝোলানো

একটা ডায়াগ্রাম দেখতে পেলাম। ওটাতে কম্পাউন্ডটা মানচিত্রের মতো করে আঁকা আছে, দেয়ালগুলো দেখানো হয়েছে বিভিন্ন ধরনের তীর চিহ্ন দিয়ে। আমি বুঝতে পারছি গেস্টহাউস ের অপারেশনটা বাহ্যিক একটা অংশ, আমার মনে হল মূল ভবনে অপারেশন চালানো এ ওয়ান টিমে থাকতে পারলে ভালো হতো। কারণ যদি সবকিছু আমাদের প্ল্যান মোতাবেক হয় তবে মূল ভবনে প্রবেশ করা এই টিমটাই হবে ভেতরে ঢোকার প্রথম টিম এবং ওরা সরাসরি চতুর্থ তলায় যাবে কারণ ধারণা করা হচ্ছে বিন লাদেন ওখানেই আছে। যাই হোক আমি আমার চিন্তা ছেড়ে আবার কাজে মনোযোগ দিলাম। কারণ এই মুহূর্তে কাজের কোন শেষ নেই, আর আমি এই মিশনের অংশ হতে পেরেই খুশি।

"চেক," আমি বললাম। "আমরা আবার এটা দেখবো।"

উইল আমাদের টিমটাকে সমন্বিত করছে। ওর মূল কাজ ছিলো ইতিমধ্যেই আফগানিস্তানের জালালাবাদে অবস্থান নেয়া আমাদের একটা সিস্টার স্কোয়াড্রন সাথে। কিন্তু ওকে আমাদের সাথে নিয়ে আসা হয়েছে কারণ ও খুবই ভালো আরবি বলতে পারে, সে বিন লাদেনের পরিবারের সাথে কথা বলতে পারবে।

"তুমি উইলের সাথে জালালাবাদে যোগাযোগ রাখবে," মাইক বললো। "আমার এখন একটা মিটিং আছে, তোমরা মডেলটা চেক করো। ওরা এটার জন্যে বেশ ভালো টাকা খরচ করেছে। বাকিরা এখনই হাল্কা করে খেয়ে ফিরে আসবে।"

আমি অপারেশন রুম থেকে বেরিয়ে ডাইনিং রুমের মতো একটা হল রুমে চলে এলাম। কফি দরকার এখন। এখানেই একটা রুমে আমাদের অস্ত্রগুলো মেঝেতে ছড়িয়ে আছে, খাপখোলা অস্ত্রগুলো এক কোনায় স্তুপ করে রাখা। রেডিও, চার্জার আর চার্ট প্রিন্টারগুলো গাদা করে রাখা আরেকপাশে। একদিকে কয়েকটা খালি চেয়ারের সামনে এখ োনো নোট প্যাডগুলো ইজেলে আটকানো।

মেইন ব্রীফ িং রুমের ঠিক বাইরেই আমি বিন লাদেনের বাড়ির কম্পাউন্ডের আদলে তৈরি করা মডেলটা খুঁজে পেলাম। পাঁচ ফিট বাই পাঁচ ফিট কাঠের একটা ফ্রেমের উপরে বিশেষ ধরনের ফোম দিয়ে ওটা বানানো হয়েছে; রুমের এক কোনায় বেশ কিছু বড় বড় বাক্স পড়ে আছে, ওগুলোর একটা দিয়েই ঢেকে রাখা হয়েছে মডেলটা। মডেলটা এক কথায় দারুণ, বিন লাদেনের বাড়ির সমস্ত খুঁটিনাটি জিনিস বেশ চমৎকারভাবে দেখানো আছে, এমনকি বাড়ির প্রাঙ্গনে ছোট ছোট গাছ, গ্যারাজ এবং ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি, সামনে থেকে দক্ষিণ দিকে চলে যাওয়া রাস্তা সবই আছে। এটাতে আরো আছে কম্পাউন্ডের সমস্ত গেট আর দরজার সঠিক অবস্থান, ছাদের উপরের জলের ট্যাঙ্ক এমনকি বাড়ির বিভিন্ন অংশে চলে যাওয়া নানা ধরনের তারসহ আশেপাশের প্রতিবেশিদের বাড়ির বিভিন্ন অংশও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে নিখুঁতভাবে।

কফি খেতে খেতে আমি মূল ভবনটা দেখছিলাম।

এক একরের উপরে নির্মিত বাড়িটা অ্যাবোটাবাদ শহরের আবাসিক এলাকার ঠিক পাশেই অবস্থিত। ব্রিটিশ মেজর জেমস অ্যাবোটের নামে নামাঙ্কিত এই শহরটা পাকিস্তানের রাজধানি ইসলামাবাদের দক্ষিণে অবস্থিত। এটা পাকিস্তানি মিলিটারি অ্যাকাডেমির শহর।

আমার অন্যান্য টিমমেটরা এখনো টিফিন করছে, তাই আমি একা একাই মডেলটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। আমার ভেতরে দারুণ উত্তেজনা কাজ করছে, অবশেষে ওসামা বিন লাদেনের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি আমরা।

ওসামা বিন লাদেনের জন্ম রিয়াদে, মার্চের ১০, ১৯৫৭ সালে। সে ছিলো তার বাবার পঞ্চাশ সন্তানের মধ্যে সপ্তম। তার বাবা আওয়াদ বিন লাদেন ছিলেন একজন কন্সট্রাকশন বিলিওনিয়ার, মা সিরিয়ার আলিয়া ঘানেম, ওসামার বাবার দশম স্ত্রী। তার দশ বছর বয়সের সময় বাবা-মা'র মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে সে তার সৎ ভাইবোনদের সাথে বেড়ে ওঠে।

সৌদি আরবের জালালাবাদ হাইস্কুলে থাকতে বিন লাদেন একটা ইসলামিক স্টাডি গ্রুপের সাথে যোগ দেয়, সেখানেই প্রথম সম্পূর্ন কোরান মুখস্ত করে। হাইস্কুলেই সে মৌলবাদি

ইসলামি চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় আর তখন থেকেই লম্বা দাড়ি রাখতে শুরু করে।

আঠার বছর বয়সে সে তার এক কাজিনকে বিয়ে করে এবং তাদের প্রথম সন্তানের জন্ম হয় ১৯৭৬ সালে। সে বছরই লাদেন তার গ্র্যাজুয়েশান সম্পন্ন করে। তারপর পাবলিক অ্যাডমিনিট্রেশনের উপরে উচ্চতর ডিগ্রি নিতে ভর্তি হয় জেদ্দার কিং আব্দুল আজিজ ইউনিভার্সিটিতে।

১৯৭৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানি্স্তান দখল করে নেবার সাথে সাথে সে প্রথমে পাকিস্তানের পেশোয়ারে চলে আসে তারপর সেখান থেকে আফগানিস্তানে। এই ব্যাপারে তার বক্তব্য হল, একজন মুসলিম হিসেবে আফগানদের পাশে দাঁড়িয়ে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছিলো তার কর্তব্য। সে ক্যাম্প তৈরি করে আফগান মুজাহিদিনদের ট্রেনিং দেয়া শুরু করে, আর এই ব্যাপারে তাকে সাহায্য করে খোদ আমেরিকা। ১৯৮৯ সালে যুদ্ধ শেষ হবার পর সে সৌদি আরবে ফিরে আসে কিন্তু সেখানকার বাদশার উপরে সে ছিলো ভীষণ ক্ষিপ্ত। ১৯৯২ সালে সৌদি সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে সুদানে নির্বাসিত করা হয় তাকে।

এর এক বছর পর আল-কায়েদা গঠন করে সে। আরবিতে যার মানে হল 'ভিত্তি'। এই দল গঠন করার পেছনে তার মূল উদ্দেশ্য ছিলো মধ্যপ্রাচ্যে একটি স্বাধীন মুসলিম দেশ গঠন করে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা।

তার যুদ্ধ সত্যিকার অর্থে শুরু হয় ১৯৯৬ সালে। সে বছর সৌদি আরবে ইউএস ট্রুপ ভর্তি একটি ট্রাকে বিস্ফোরণ ঘটায়। এই ঘটনার পরে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে সুদান থেকে তাকে বহিষ্কার করলে সে তালি্বানদের ছত্রছায়ায় আফগানিস্তানে চলে আসে।

১৯৯৮ সালে কেনিয়া আর তাঞ্জানিয়ার ইউ.এস অ্যাম্বেসিতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটালে আল-কায়েদা নামটা সারা বিশ্বে বেশ পরিচিত হয়ে ওঠে। এই বোমা বিস্ফোরণে প্রায় তিনশ' লোক মারা যায়। ২০০০ সালে অডেন হারবারে সে আবারো ইউএসএস কোল-এ বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। কিন্তু তার পূর্ববর্তী সমস্ত সন্ত্রাসী কার্যক্রমকে ম্লান করে দেয় ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারসহ আমেরিকার তিনটি জায়গায় বিমান আক্রমণের ঘটনা। এই বিমান আক্রমনে তার লোকেরা নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন এবং পেনসিলভানিয়াতে প্রায় তিন হাজারেরও বেশি বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করে। এরপরই ২০০১ সালে আফগানিস্তানের তোরা বোরায় কোয়ালিশান ফোর্সের ধরপাকড় মিশন থেকে অল্পের জন্য বেঁচে গিয়ে লোকচক্ষুর আড়ারে চলে যায় সে।

এরপর আমেরিকার কোয়ালিশান ফোর্স থেকে শুরু করে আরো অন্যন্য বাহিনী তাকে পাক-আফগান বর্ডার থেকে, শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় ধরার জন্যে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াতে থাকে। ২০০৭ সালে শোনা যায় সে নাকি পাকিস্তানে লুকিয়ে আছে।

আমি মডেল দেখতে দেখতে আমার টিমমেটেরা টিফিন করে ফিরে আসে। আমি মনোযোগ দিয়ে মডেলটা দেখছি, টম আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। ও চক ওয়ানের টিম লিডারদের মধ্যে একজন এবং তার টিমের কাজ হলো মূল ভবনের প্রথম ফ্লোর ক্লিয়ার করা, যেটার নাম এ-ওয়ান।

"ওরা তাকে 'পেসার' বলে ডাকে কারণ সে প্রতিদিন চার ঘণ্টা হাটাহাটি করে। আর তখন ওরা ওখানে পেসারের উপর চোখ রাখে," টম আমাকে বাড়ির প্রাঙ্গনের পূর্ব দিকের কম্পাউন্ডটা দেখালো। "স্থানীয় ইনফর্মারের দেয়া তথ্য অনুযায়ী সে প্রতিদিন এক্সারসাইজ করার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে বাগানে হাটাহাটিও করে।"

ওয়াল্ট আর চার্লিও চলে এসেছে। দু'জনেই টমের কথা শুনে দেঁতো হাসি হাসছে।

"তাই নাকি?" আমি টমের কথার জবাবে বললাম। "লোকটার খবর পওয়া গেল কিভাবে?"

"ওর এক কুরিয়ারের মাধ্যমে, " চার্লি জবাব দিল। "ওর দু'জন কুরিয়ার ছিল।"

আগের দিন সিআইএ আমার টিমমেটদেরকে 'রোড টু অ্যাবোটাবাদ্ের ব্যাপারে, মানে

বিন লাদেনের খবর কিভাবে পাওয়া গেলো সেই ব্যাপারে ব্রীফ করেছে। অপারেশন সেন্টারে বিন লাদেন এবং ওর এই এলাকা সম্বন্ধে একগাদা বুকলেট আছে। অন্যরা টিফিন করে আসার আগে আমি কয়েকটা নিয়ে পড়তে শুরু করলাম। একটু পিছিয়ে পড়েছি সুতরাং মূল কাজ শুরু করার আগে আমাকে যেভাবেই হোক সেটা কভার করতে হবে।

পাবলিক সোর্স থেকে জানা গেছে আমাদের টার্গেট কম্পাউন্ডটা প্রায় এক একর জায়গা নিয়ে, এর দাম প্রায় এক মিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি হবে। বাড়িটা এই এলাকার মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বেশি দামি। চারপাশের দেয়ালগুলো অনেক উঁচু, প্রায় দোতলার সমান, বিশেষ করে দক্ষিণ দিকের দেয়ালের কারণে দোতলার জানলাগুলোও ঢেকে গেছে। উপরের দুই ফ্লোরের জানালাগুলো কালো রঙ করা, যেকারনে ভেতরের কিছুই দেখা যায় না। বাইরের লোকজন কখনোই পেসারকে দেখে নি। বাড়ির ভেতরের বাসিন্দারা বাইরে খুব কমই বের হয়। প্রতিবেশিদের সাথে প্রায় মেশে না বললেই চলে। এমনকি তারা বাড়ির আবর্জনাও বাইরে ফেলে না, ভেতরে পুড়িয়ে ফেলে। বাড়িটা পাকিস্তানি মিলিটারি অ্যাকাডেমির বেশ কাছেই।

এই বাড়িতে বসবাস করে এমন একজনের ব্যাপারেই আমরা নিশ্চিত জানতে পেরেছি, তার নাম আহমেদ আল-কুয়েতি। তার ব্যাপারে সিআইএ জানতে পেরেছে মোহাম্মদ আল-খাতামি নামের এক ব্যাক্তিকে ইন্টেরোগেশন করার মাধ্যমে। এই লোক ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের সন্দেভাজন বিশজন প্লেন হাইজ্যাকারদের একজন। ২০০১ সালের আগস্ট মাসে একটা ইমিগ্রেশান সংক্রান্ত ঝামেলায় সে নজরে পড়ে। কারণ তার কাগজপত্র দেখে ইমিগ্রেশান আফিসার ভেবেছিলো সে অবৈধভাবে ইমিগ্র্যান্ট হবার চেষ্টা করছে। পরবর্তীতে তদন্তে জানা যায়, সে যেদিন ওই ঝামেলার কারণে আমেরিকায় ঢুকতে পারে নি সেদিন মোহাম্মদ আতা নামের এক বড় মাপের আল-কায়েদা নেতা তার জন্যে অরল্যান্ডো এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছিল।

আমেরিকায় ঢুকতে না পেরে খাতানি দুবাই চলে আসে এবং পরে তোরা বোরার যুদ্ধে ধরা পড়ার পর তাকে গুয়ান্তানামো বে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হলে সেখান থেকে হাতের ছাপের মাধ্যমে তার ইমিগ্রেশানের ব্যাপারে জানা যায়। তারপর ২০০২ এবং ২০০৩ সালে তদন্তের মাধ্যমে তার ব্যাপারে সব তথ্য বেরিয়ে আসে।

আল-খাতানিকে ইন্টেরোগেশানের এক পর্যায়ে সে জানায় ৯/১১-এর অন্যতম পরিকল্পনাকারীদের একজন খালিদ শেখ মোহাম্মদ তাকে আমেরিকায় পাঠিয়েছিল। সে-ই পরবর্তী একসময় খালিদ আল-কুয়েতির কথা জানায় এবং এও বলে এই লোক বিন লাদেনের কুরিয়ারদের একজন এবং তার ডানহাত। অন্যদিকে খালিদ শেখ মোহাম্মদ, যে এখন আমেরিকার কারাগারে আছে সেও এই লোকের ব্যাপারে নিশ্চিত করে, তবে এই কুয়েতি এখন কোথায় আছে সে জানে না।

তারপর ২০০৪ সালে ধরা পরে হাসান গুল, লাদেনের কুরিয়ার এবং আল-কায়েদার অন্যতম নেতা। সে ধরা পড়ার পরে জানায়, এই কুয়েতি আল-কায়েদার অফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সদের একজন। ২০০৫ সালে পাকিস্তানিদের হাতে ধরা পরে এবং ইন্টেরোগেশানের এক পর্যায়ে সে কুয়েতির কথা বলে, আরো বলে কুয়েতি কোথায় আছে সে জানে না। বার বার বিভিন্ন জনের কাছে এই লোকটার শেষ অবস্থানের ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট তথ্য না পেয়ে সিআইএ ধারণা করে সে সম্ভবত বিন লাদেনের সাথেই আছে।

কারণ সিআইএ জানতো কুয়েতি এবং তার ভাই আবরার আল-কুয়েতি দুজনেই সবসময় বিন লাদেনের বেশ কাছাকাছি থাকতো। এরপর সিআইএ পাকিস্তানে কুয়েতিকে ট্র্যাকডাউন করার চেষ্টা করে, যাতে করে তার মাধ্যমে তারা তার ভাইয়ের কাছে পৌছাতে পারে এবং তার ভাইয়ের মাধ্যমে বিন লাদেনের কাছে। এক সময় তারা কুয়েতিকে পাকিস্তানে আবিষ্কার করে এবং শুরু করে তার উপর নজর রাখা। ২০১০ সালে একটা টেলিফোন কলে কুয়েতি তার এক আত্মীয়ের সাথে কথা বলার এক পর্যায়ে আত্মীয় জানতে চায় সে আজকাল কি

করছে-জবাবে সে চুপ থাকে, তার আত্মীয় আবার জানতে চাইলে সে কিছুক্ষন চুপ থেকে জবাব দেয় আগে যা করতো এখনো সে তাই করে।

তার এই ছোট্ট জবাব আজকের অপারেশনের পেছনে বিরাট ভূমিকা রাখে। ক্লু খুবই সামান্য কিন্তু শুরুটা হয় এখান থেকেই। তারপর থেকে সিআইএ তার পেছনে আঠার মতো লেগে থাকে এবং তারা দেখতে পায় সে একটা সাদা ট্রাক চালায় যেটার পেছনে লাগানো অতিরিক্ত টায়ারে একটা গন্ডারের ছবি আছে। তারপর একদিন তার সেই ট্রাক দেখা যায় এই বাড়িটার কম্পাউন্ডে যেটার মডেলের সামনে এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি।

সিআইএ'র গবেষণা বলে বিন লাদেন সম্ভবত বাড়িটার থার্ড ফ্লোরে থাকে যেটার নাম দেয়া হয়েছে এ-ওয়ান। তার ছেলে খালিদ সেকেন্ড ফ্লোরে এবং বাড়িতে সম্ভবত তার দুই স্ত্রী এবং প্রায় ডজনখানেক বাচ্চকাচ্চা আছে। আমরা এই ধরনের অপারেশনে আগেও এই ধরনের বাড়িতে বাচ্চকাচ্চা দেখেছি। কাজেই এটাও গ্রাহ্য করার মতো একটা ব্যাপার।

জে আর মাইক প্রায় সাতদিন আগে ওয়াশিংটনে এই প্লানের মূল অংশ অনুমোদন করিয়েছে, কিন্তু এর খুঁটিনাটি সবকিছু ঠিকঠাক করে একে বাস্তবরূপ দিতে হবে আমাদেরকে। কারণ আমাদের নিজেদের যোগ্যতা আমরাই সবার থেকে ভালো জানি, আর যেহেতু আমাদেরকে এই মিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, কাজেই এটার মূল প্ল্যান ঠিকঠাক করার কাজ আমরাই সবচেয়ে ভালো পারবো। সবাই ফিরে এসে মডেলটাকে ঘিরে দাঁড়াতে জে আর মাইক এর বর্ণনা শুরু করলো। ওরা এটা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই কাজ করছে এবং ওদের কথা শুনেই আমাদের মনে একটা আশ্বাস কাজ করা শুরু করলো যে ব্যাপারটা এখন একটা পরিণতির দিকে যাচ্ছে।

"আমরা আমাদের গন্তব্য পর্যন্ত ফ্লাই করে যাবো," জে বললো। "তারপর চক ওয়ান থেকে রোপের সাহায্যে উঠোনে নামবো।" এরপরে মডেলটার দক্ষিণ দিকের সি-ওয়ান নামের গেস্টহাউসটাকে দেখিয়ে ও বললো, "মার্ক তুমি এবং তোমার ক্রুরা সরাসরি এটার দিকে যাবে এবং গেস্টহাউসের সমস্ত কিছু সামলানোর দায়িত্ব তোমাদের। স্নাইপাররা প্রথমে কারপোর্ট ক্লিয়ার করে তারপরে ছাদে অবস্থান নেবে। তোমরা সি-ওয়ান ক্লিয়ার করে সিকিউর করবে। ওখানে আল-কুয়েতি তার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে। কাজেই ওটা সামলানো খুব কঠিন কিছু হবে না। ওটা সামলানোর পর যদি সম্ভব হয় তোমরা এ-ওয়ান মানে মূল ভবনে টমের টিমকে সাহায্য করার জন্যে এগোবে।"

তার মানে আমরা ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে চক ওয়ানের বাকি এসল্টারদেরকে নিয়ে এ-ওয়ানের দিকে এগোবে টম।

"চার্লি এবং ওয়াল্ট সি-ওয়ানের দক্ষিণ দরজার দিকে এগোবে এবং সেখানে পৌছে অপেক্ষা করবে," জে বললো। "ওদের ধারণা পেসার সাধারনত এই দরজাটাই ব্যবহার করে। সিআইএ'র ধারণা ওখানে একটা পেচনো সিঁড়ি আছে, এটা থার্ড ফ্লোরের লিভিং কোয়ার্টারের সাথে যুক্ত।"

টম আর ওর টিম উত্তরের দরজার দিকে যাবে এবং ফার্স্ট ফ্লোর ক্লিয়ার করবে। মনে করা হচ্ছে কুরিয়ারের ভাই আবরার আল-কুয়েতি তার পরিবারের সাথে এই ফ্লোরেই থাকে। ওখানকার অবস্থা বুঝে টম ওর দলকে নিয়ে উত্তরের দরজা ক্লিয়ার করবে, আর যদি না পারে তবে অন্তত দরজাটা আগলে রাখবে।

"যেহেতু বাড়ির ভেতরের লে-আউট সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা নেই তবুও এটুকু অনুমান করতে পারি ওটার লিভিং এরিয়াটা দুইভাগে বিভক্ত," জে বললো। "তো যে পর্যন্ত টম ক্লিয়ারেন্স না দেবে চার্লি আর ওয়াল্ট ওদের অবস্থান ধরে রাখবে।"

এর মধ্যে দ্বিতীয় হেলিকপ্টার দক্ষিণ দিকের কম্পাউন্ডে পাঁচজনের একটা দলকে ড্রপ করবে, ওদের দায়িত্ব হবে বাইরের নিরাপত্তা রক্ষা করা। দুজন অ্যাসল্টার কমব্যাট, অ্যাসল্ট কুকুর নিয়ে ওদিকটা পাহারা দেবে যাতে ভেতরের কেউ ওদিক দিয়ে বেরুতে না পারে, সেই সাথে বাইরের কেউও যেন ভেতরে ঢুকতে না পারে, এমনকি স্থানীয় পুলিশও না।

বাইরের সিকিউরিটির এই কাজটা খুবই বিপজ্জনক একটা কাজ, কারণ যেকোনো দিক থেকে বিপদ আসতে পারে।

"একবার এই গ্রাউন্ড সিকিউরিটি ড্রপঅফ করার পরে আমাদের পরবর্তী টার্গেট এরিয়া হবে এ বাড়ির ছাদ। চপারের বাকি কমান্ডোরা এ-ওয়ানের ছাদ এবং ব্যালকনিতে নেমে থার্ড ফ্লোর ক্লিয়ার করার উদ্দেশ্যে এগোবে।"

যদি আমাদের প্ল্যান অনুযায়ী সবকিছু ঠিকঠাক মতো হয়, তবে এই টিমই হবে প্রথম টিম যারা সম্ভবত বিন লাদেনকে মোকাবেলা করবে। কথা শেষ করে জে আর মাইক প্ল্যানের বিস্তারিত সবকিছু নিয়ে আলোচনা করতে বসলো, এখন ওরা এখানেই অপারেশনের জন্যে 'প্রো' ওয়ার্ড ঠিক করবে। 'প্রো' ওয়ার্ড হল একটি অপারেশনের জন্যে নির্দিষ্টকৃত কিছু শব্দ। এই ধরনের অপারেশনে আমরা সাধারনত ল্যাটিন আমেরিকান প্রো ওয়ার্ড রাখি।

"ইউএলবি হল জেরোনিমো," জে বললো।

মিশন ব্রীফিংটা প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চললো। শেষ হবার পর কথা বলে উঠলো মাইক।

"এখন তোমরা সবাই প্ল্যানটা ভালো করে দেখ এবং এর সম্ভাব্য খুঁত বের করে এটাকে আরো কমপ্লিট করার চেষ্টা করো। আমি আর জে গত সপ্তাহ থেকে দেখছি, আর তোমরা গতকাল থেকে, কাজেই ভালো করে আয়ত্ত করে নাও সেই সাথে এটাকে নিখুঁতও করার চেষ্টা করো।"

আমরা কখনোই এই ধরনের প্ল্যানে মূল প্ল্যানটাকে পাত্তা না দিয়ে সম্ভাব্য সব ধরনের দূর্বলতা বের করার চেষ্টা করে প্ল্যানকে আরো সূক্ষ্মতর করার চেষ্টা করি। এবারও সবাই মিলে সেই কাজেই লেগে গেলাম।

এ ধরনের প্ল্যানে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হল চমক। যাদের আক্রমন করতে যাওয়া হচ্ছে তাদেরকে যথা সম্ভব শেষ মুহূর্তে চমকে দিলে কাজ উদ্ধার করা সহজতর হয়ে ওঠে। কিন্তু এই অপারেশনে এই চমকটা পরিপূর্ণভাবে রাখা যাচ্ছে না, কারণ আমাদের চপার এবং তার আওয়াজ। আমরা প্রথমে চেয়েছিলাম চপার থেকে আমরা নামবো বাড়িটা থেকে দূরে কোথাও, তারপর আক্রমন করবো। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি কারণ এলাকাটা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া, আর এই বাড়িটা থেকে চপার নামানোর ফাঁকা জায়গা কমপক্ষে ছয় কিলোমিটার দূরে। এতোদূর থেকে আসা সম্ভব না। এই কারণেই চপার থেকেই বাড়িটাতে ল্যান্ড করার চিন্তাভাবনা করা হয়েছে।

হয়তো এতো আওয়াজে প্রতিপক্ষ সচেতন হয়ে যাবে, তবে এভাবেই আমরা সবচেয়ে দ্রুত টার্গেট এরিয়াতে পৌছাতে পারবো। সবাই যার যার মতো প্ল্যান নিয়ে মগ্ন, সেই সাথে সবাই নিজস্ব গিয়ারের সাথে সাথে মিশনের জন্যে প্রয়োজনীয় আলাদা আলাদা গিয়ারের লিস্ট করছে। এই লিস্টে আছে পোর্টেবল সিঁড়ি, স্লেজ হ্যামার এবং বিশেষ ধরনের এক্সপ্লোসিভ।

"কারপোর্টের ছাদে চড়ার জন্যে আমার হালকা একটা সিঁড়ি দরকার যেটা সহজেই বহন করা যাবে, কারণ এতে করে আমি দ্রুত ওখানে উঠে সবার নিরাপত্তার দিকটা দেখতে পারবো," স্নাইপার বললো।

আমরা ঠিক করেছি প্রথমেই চক ওয়ান এবং চক টু-এর ছাদে দু'জন স্নাইপার রাখবো। পরে তারা কম্পাউন্ডের ভেতরে অবস্থান নেবে।

"উইল বড় হাতুড়িটা বহন করবে, "আমি বললাম। "আর আমি বহন করবো দুই ধরনের এক্সপ্লোসিভ এবং সেইসাথে একটা বোল্ট কাটার।" বলতে বলতে আমি এক্সপ্লোসিভ নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলাম, এই ধরনের এক্সপ্লোসিভ মূলত দরজা ভাঙার জন্যে ব্যবহৃত হয়। লম্বা প্যাকেটটার একপাশে আঠা লাগানো যাতে করে যেকোন দরজায় সহজে আটকে চার্জ সেট করে দেয়া যায়। এই চার্জ ঠিক তিন সেকেন্ড পর বিস্ফোরিত হয়ে দরজার লক ভাঙবে অথবা দরজাটা খুলে ফেলবে।

প্ল্যান নিয়ে আরো কিছুক্ষন বিস্তারিত আলোচনার পর ন্যাশনাল জিওস্পেশাল

ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি থেকে আসা সোনালি চুলো এক মেয়ে এক্সপার্ট আমাদেরকে ম্যাপের বিভিন্ন অংশের ডিটেইলস বোঝাতে লাগলো।

আমি তাকে এক জোড়া দরজা দেখিয়ে বললাম, "আচ্ছা, এই দরজাগুলো কি ভেতরের দিকে খোলে না বাইরের দিকে খোলে।"

সে মানচিত্র ডিটেইল্স দেখে জবাব দিলো "ডবল মেটালডোর বাইরের দিকে খোলে।"

তারপর সে ডিটেইল বলে গেল, ছোট থেকে বড় কোন ব্যাপারই বাদ দিল না। কোন দরজাটা কিসের তৈরি, কোনটা কোন দিকে খোলে, কোন রুমে সম্ভাব্য কি থাকতে পারে, কম্পাউন্ডের কোথায় কি গাছ আছে, সব।

ওরা এইসব তথ্য বের করেছে লোকাল ইনফরমার এবং স্যাটেলাইট থেকে তোলা হাজারো ছবি ঘেঁটে।

আমরা যখন অপারেশনের খুঁটিনাটির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভাবছিলাম তখন ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তার অ্যাডভাইজারদের সাথে অপারেশনের সম্ভাব্য অন্যান্য পথ নিয়ে আলোচনা করছিলেন। আমরা যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি এই অ্যাসল্ট অপারেশনের হোয়াইট হাউস তখনো এয়ার ফোর্স অপারেশনের সম্ভাবনা পুরোপুরি বাতিল করতে পারে নি। ডিফেন্স সেক্রেটারি রবার্ট গেটস এয়ার স্ট্রাইকটাকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছিলেন। কারণ এতে গ্রাউন্ড ট্রুপকে ব্যবহার করতে হচ্ছে না, ঝুঁকি কমে যাচ্ছে এবং পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের উপরেও আঘাত আসছে না।

এভাবে একটা গ্রাউন্ড ট্রুপকে অন্য একটা দেশের ভেতরে অপারেশনে পাঠালে সেই দেশের সার্বোভৌমত্বের উপরেও আঘাত করা হয় এবং গ্রাউন্ড ট্রুপকেও ঠেলে দেয়া হয় চরম ঝুঁকির মুখে, যার প্রমান আগে আমরা পেয়েছি অপারেশন ঈগল ক্ল'তে।

ঈগল ক্ল অপারেশন শুরুর আগে অপারেশনের ছয়টা হেলিকপ্টার রাখা ছিলো ইরানের এক বেসে। সেখানে হঠাৎ করে একটা মরুঝড় আঘাত হানলে, একটা হেলিকপ্টার উল্টে গিয়ে পড়ে একটা অয়েল ট্যাঙ্কারের গায়ে। সাথে সাথে ট্যাঙ্কার এবং চপার দুটোই বিস্ফোরিত হয় এবং আটজন সার্ভিসম্যান মারা যায়। এই ঘটনার পর ডেল্টা ফোর্সকে ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু এই অপারেশনে যদি এয়ার অ্যাটাক করা হয়, তবে সেটা অনেকটা বাঙ্কার অ্যাটাকের মতো করে করতে হবে এবং এতে কোলাটেরাল ড্যামেজের ফলে সবকিছু ধ্বংস হবার সমূহ সম্ভবনা আছে।

আগের রেকর্ড দেখতে গিয়ে হঠাৎ করেই প্রথমবারের মতো একবার স্ক্রিনে পেসারকে দেখতে পেলাম। সে ধীরে ধীরে হেটে স্ক্রিনে প্রবেশ করলো। তাকে দেখতে লাগছিলো একটা ছোট্ট পিঁপড়ার মতো, তার চেহারা কিংবা উচ্চতা কিছুই ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছিলো না কিন্তু এটা যে সে-ই এই ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। সে কম্পাউন্ডের উত্তর দিকে হাটতে লাগলো।" সে প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা এভাবে হাটে," একজন এজেন্সি এনালিস্ট বললো। "আমি দেখেছি সে হাটার সময় কেউ তার কাছ দিয়ে গেলেও তাকে উপেক্ষা করে স্রেফ হাটতে থাকে।"

"আমরা খেয়াল করেছি ওরা কম্পাউন্ডের এ পাশে আগে গরু রাখতো কিন্তু এখন সেগুলোকে আরেক পাশে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কারণ ওরা কম্পাউন্ডের এই পাশটা সুরক্ষিত এবং গোপন রাখতে চায়। এই যে, এখানে এই জিনিসটা খেয়াল করুন।"

হঠাৎ সে আরেকটা পিসিতে আগের একটা ফুটেজ দেখাতে লাগলো। কম্পাউন্ডের উপরে একপাশ দিয়ে একটা পাকিস্তানি হেলিকপ্টার উড়ে গেল।

"কি ব্যাপার, এটা এখানে এসেছিলো কি করতে?" আমি বেশ বিস্ময়ের সাথেই বললাম।

"পাক আর্মির একটা হেলিকপ্টার, সম্ভবত ওটা আর্মি বেস থেকে এসেছে।"

এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করে আমার বেশ পুলকিত লাগলো, তার মানে এই এলাকা দিয়ে মাঝেমাঝেই হেলিকপ্টার উড়ে যায় সুতরাং আমাদের হেলিকপ্টারের আওয়াজ ওদের কাছে অতোটা সন্দেহজনক নাও লাগতে পারে। তাহলে আমরা যা ভাবছিলাম হয়তো এই

অপারেশনে প্রতিপক্ষকে তারচেয়ে বেশি চমক দিতে পারবো। সাথে সাথে আমি ব্যাপারটা চার্লিকে বলতেই সেও একমত পোষণ করলো।

প্ল্যানিং মোটামোটি একটা লেভেলে পৌছাতেই আমরা নর্থ ক্যারোলিনার পাইন জঙ্গলে লাদেনের বাড়ির কম্পাউন্ডের আদলে একটা মডেল তৈরি করে রিহার্সেল শুরু করে দিলাম। প্লাইউড, চেইন লিঙ্ক আর শিপিং কন্টোইনার দিয়ে তৈরি করা হয়েছিলো মডেলগুলো।

তিনদিন টানা ট্রেনিং করার পর তৃতীয় দিন আমি চপারের দরজা থেকে দড়ি বেয়ে নেমে এলাম আমার জন্যে নির্দিষ্টকৃত সি-ওয়ানের দিকে। মাথার উপরে রোটরের তীব্র আওয়াজের কারণে আমরা কোনো কথা বলছি না। তবে কথা বলার প্রয়োজনও নেই, আসলে এই কয়েকদিনের টানা ট্রেনিংয়ের কারণে প্রতিটা জিনিস, প্রতিটা মুভমেন্ট এমনকি প্রতিটা অঙ্গ চালনা পর্যন্ত আমাদের সবার মস্তিষ্কে গেঁথে গেছে। কথা বলার আসলে কোন প্রয়োজনই নেই। এমনকি রেডিওগুলোও একদম শান্ত। অবশেষে আমাদের এই রিহার্সেল দেখে হোয়াইট হাউস সন্তুষ্টচিত্তে হ্যাঁ-সূচক জবাব দিলো।

কিন্তু এর পরও আমরা রিহার্সেল চালিয়ে যেতে লাগলাম। রিহার্সেলের এক পর্যায়ে আমি একজন কন্সট্রাকশান ক্রুকে কম্পাউন্ডের মডেল গ্রাউন্ডের এক জায়গায় কিছু পরিবর্তন করতে বললাম। লোকটা একদম বিনা বাক্য ব্যয়ে, কোন প্রশ্ন না করে সুন্দর করে বদলে দিল। এই ধরণের কাজের অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম। কোনো ব্যুরোক্রেসি নেই, মাতব্বরি ফলানোর মতো কেউ নেই স্রেফ নিজের কাজ করে যাও।

লোকটার কাজ শেষ হবার পর আমি আবারো রিহার্সেল গ্রাউন্ডে ফিরে এলাম। একটা ব্যাপার শুধু আমাকে ভাবাচ্ছিল। সেটা হল এই অপারেশনের সবকিছু আমরা রিহার্সেলে দারুণভাবে প্র্যাকটিস করেছি তবে সেটা শুধুমাত্র বাইরের আক্রমনের অংশ। কিন্তু ভবনগুলোর ভেতরে কি আছে? কোন লেআউট কেমন এবং লোকসংখ্যা কতো, কিছুই জানি না। তবে বহু বছরের অ্যাসল্ট অপারেশনের অভিজ্ঞতা আর দক্ষতা দিয়ে আমাদের এসব ঘাটতি মোকাবেলা করতে হবে।

আমি আমার নির্দিষ্ট সি-ওয়ানের দরজায় এসে দাঁড়ালাম। বহুবার আমি এই বাইরের অংশ পর্যন্ত প্র্যাকটিস করেছি কিন্তু এই দরজার ভেতরে কি আছে আমি জানি না। কুয়েতি কি একাই থাকবে? নাকি তার সাথে আর কেউ আছে? তারা সসস্ত্র কিনা, কিংবা কুয়েতি কি সুইসাইড বোমা বুকে বেধে বেরিয়ে আসবে-আমি এসব ভাবছিলাম।

একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্নে প্র্যাকটিস করার পরে আমরা আবার বিভিন্নভাবে অপারেশনটাকে রিহার্সেল দেয়া শুরু করলাম। যেমন চপার থেকে কম্পাউন্ডের ভেতরে না নেমে দেয়ালের বাইরে নামলাম, তারপর আবার বিভিন্নভাবে টানা রিহার্সেল চলতে লাগলো।

অ্যাসল্ট কমান্ডোর এই জীবনে আমি বহু প্রশিক্ষণ নিয়েছি, বহু অপারেশনে কাজ করেছি কিন্তু এইরকম কড়া রিহার্সেলের মুখোমুখি কখনো হই নি। যাইহোক রিহার্সেল শেষ করার পর জে আমাদের সবাইকে অপারেশন সেন্টারে ডাকলো, সে পরিস্থিতির লেটেস্ট আপডেট নিয়ে অপেক্ষা করছে।

"আমরা এখন বিশ্রাম নেবো তারপর সোমবার থেকে ফুল অপারেশনের স্টাইলে মিশন প্রোফাইলে আরো সাতদিনের ট্রেনিং এবং রিহার্সেল চলবে।"

আমি হাত তুলে জানতে চাইলাম, "আমাদের অপারেশনের অনুমতি পাশ হয়েছে?"

"না এখনো হয় নি," জে গম্ভীরমুখে জবাব দিলো। "হোয়াইট হাউস আমাদের কাজে সন্তুষ্ট ঠিকই, কিন্তু অনুমতি এখনো পাশ হয় নি।"

"আমার মনে হয় এখন আমাদের লাঞ্চে যাওয়া উচিত," ওয়াল্ট বললো।

অবশেষে আমরা নির্দিষ্ট সোমবারে সম্পূর্ন কমব্যাট ড্রেসে ফাইনাল রিহার্সেলের জন্যে একত্রিত হলাম। আমাদের সামনে প্রায় পুরো ফ্লোর জুড়ে আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলের একটা মানচিত্র। আজ আমাদের সামনে অনেক ভিআইপি উপস্থিত। জয়েন্ট চিফদের চেয়ারম্যান অ্যাডমিরাল মাইক মুলেন, স্পেশাল অপারেশন কমান্ডার চিফ অ্যাডমিরাল এরিক ওলসন

আরো আছেন ভাইস অ্যাডমিরাল বিল ম্যাকর‍্যাভেন। ওনারা সবাই ম্যাপের আরেক প্রান্তের সামনে চেয়ারে বসে আছেন।

ওনারা প্রথমে আমাদের কাছ থেকে সব ডিটেইলস শুনেছেন তারপর তাদের মতো করে নির্দেশনা দিয়েছেন। আমরা যে কাজটা করতে যাচ্ছি তাকে মিলিটারির ভাষায় বলে 'রক ড্রিল'। একজন ন্যারেটরের মুখে আমরা আমাদের অপারেশনের প্রতিটি মুভমেন্ট আবারো শুনলাম। ন্যারেটর পুরো অপারেশনের স্ক্রিপ্ট পড়ে শোনালো, আবারো আমরা অনুভব করলাম এই অপারেশন নেপচুন স্টার কতোটা গুরুত্বপূর্ণ।

ন্যারেটর শেষ করার পর এবার প্রত্যেকের নিজের নিজের অংশটুকু বলার পালা। প্রথমেই শুরু করলো পাইলট। সে জালালাবাদ থেকে অ্যাবোটাবাদের গ্রাউন্ড পর্যন্ত উড়ে যাবার সমস্ত কিছু ডিটেইল বলে গেলো।

পাইলট শেষ করার পর টিম কমান্ডাররা একে এক শুরু করলো।

"আমার টিম প্রথমে চক ওয়ান থেকে দড়ির সাহায্যে নিচে নেমে এসে আমাদের টার্গেট এরিয়া সি-ওয়ানের দিকে এগোবে। ওটা ক্লিয়ার করার পর সম্ভব হলে আমরা এ-ওয়ানের দিকে ধাবিত হবো যাতে করে ওখানে আমরা বাকিদেরকে যথাসম্ভব সাহায্য করতে পারি, আমার পালা এলে আমি সব বলার পর এটুকু বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

ভিআইপিরা বেশিরভাগ প্রশ্ন করলেন মূল টিমটাকে যারা মূলত এ-ওয়ান কভার করবে। এক পর্যায়ে একজন ভিআইপি জানতে চাইলেন, "ধরো তোমরা যদি পাকিস্তানি আর্মি বা পুলিশের সামনে পড়ে যাও সেক্ষেত্রে কি করবে?"

"প্রথমে আমাদের অনুবাদকের সাহায্য নিয়ে ওদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করবো আমরা কারা, এবং কি করতে এসেছি। তারা বুঝতে পারলে ঠিক আছে, আর যদি আগে বা পরে খারাপ পরিস্থিতি দেখা দেয় সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের অপারেশন আমাদের মতো করেই চালিয়ে যাবো, তবে আমাদের মূল চেষ্টা থাকবে যেভাবেই হোক ওদের সাথে সংঘর্ষে না জড়ানো, আমার ধারণা আমরা সেটা পারবো," টিম লিডারদের একজন জবাব দিলো।

আলোচনার একপর্যায়ে প্রশ্ন চলে এলো এটা কিলিং অপারেশন কিনা। ভিআইপিরা নিশ্চিত করলেন এটা কোন কিলিং অপারেশন নয়। সম্ভব হলে বিন লাদেনকে জীবিতই ধরতে হবে।

"যদি সে খালি দুইহাত উপরে তুলে বাইরে বেরিয়ে আসে তবে কোন অবস্থাতেই তাকে গুলি করার দরকার নেই, " একজন ভিআইপি জবাব দিলেন।

কথা শেষ হবার পর আমরা আবার চপারে উঠে রওনা দিলাম। এবার আরেকটা সাজানো কম্পাউন্ডে, যাতে করে ভিআইপিরা আমাদেরকে দেখতে পারেন। কম্পাউন্ডে নামার পর আমার মনে হতে লাগলো আমি একটা ফিস বোলের উপরে আছি।

আমার টার্গেট এরিয়ার কাছে এসে যথারীতি আমার টিমের একজন ঠেলা দিয়ে দরজা খুলে দিল, আর আমি ডাইভ দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলাম। ভেতরে ঢুকে রুমের ডামিগুলোর পেছনে ভিআইপিদের একজনকে দেখলাম বেশ মনোযোগ দিয়ে আমাদের কাজ খেয়াল করছেন।

"তাহলে তোমার কি মনে হয় আমরা এখন ভালোভাবে এগোতে পারবো?" ফাইনাল রিহার্সেল শেষ করার পর চার্লি আমার কাছে জানতে চাইলো।

"ঈশ্বর জানে, " আমি জবাব দিলাম। তবে এইটুকু বলতে পারি আমি আমার কাজ করে যাবো।"

আমাদের এখানকার কাজ শেষ, এবার সামনে এগোবার পালা। অপেক্ষার পালা শেষ হয়েছে।

কিলিং টাইম

ভার্জিনিয়া বিচের বেসে প্রবেশ করার করার জন্যে আমি যখন গার্ডকে আমার আইডিকার্ড দেখালাম সূর্য তখন পশ্চিমাকাশে প্রায় হেলতে শুরু করেছে। গার্ড কার্ড চেক করে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিতেই, গাড়ির লম্বা লাইন পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকলাম।

অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে গেছিলাম দেখে আমি ফ্লাইটের বেশ কয়েক ঘণ্টা আগেই চলে এসেছি। বাড়িতে কাটানো এই সাতদিনের ছুটি, শেষের দিকে আমার কাছে অসহ্য লাগছিল। ছুটিটা ছিলো ঈস্টারের কিন্তু সবাই যখন নানা উৎসব আয়োজনে ব্যস্ত আমি তখন অশান্ত চিত্তে অপেক্ষা করছি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অপারেশনটার জন্যে। বাবা-মায়ের সাথে ছুটি কাটালেও তাদেরকে আমি ভুলেও বলি নি আমি কি কাজে যাচ্ছি।

রিহার্সেলের পালা শেষ করে অবশেষে ওয়াশিংটনের কর্তামহল আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন অপারেশন চালানোর এবং প্রাথমিক নির্দেশ হল জালালাবাদ বেসে অবস্থান নেয়া।

নির্দেশটা শোনার পর মনে হল না অবশেষে ব্যাপারটা সত্যিই ঘটতে চলেছে।

গাড়ি পার্ক করে নেমে আসার পর দেখি আমার টিমমেটদের বেশ কয়েকজনই অপেক্ষা করছে হেডকোয়ার্টারের বাইরে। মনে মনে হাসলাম, ওরাও তাহলে ছুটি কাটাতে গিয়ে অসহ্য হয়ে ফিরছে।

"হলি শিট, আমি এখনো মানতেই পারছি না যে, ওরা পারমিশন দিল," আমাকে দেখেই একজন চিৎকার করে বললো।

ডিফেন্স মেকানিজমে এটা অসম্ভব কিছুই না। কারণ শেষ মুহূর্তে প্রায়ই দেখা যায় কোনো অপারেশন বাতিল ঘোষণা করে মেম্বারদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। তাই এবার পারমিশন পেয়ে সবাই বেশ উত্তেজিত।

"তবে আমার আগে থেকেই মনে হচ্ছিলো, এবার আমরা অনুমতি পেয়ে যাবো," বিল্ডিংয়ের লবিতে ঢুকতে ঢুকতে ওয়াল্ট জবাব দিলো।।

টিম রুমের ভেতরে ঢুকে দেখলাম কয়েকজন শেষমুহূর্তে লম্বা ফ্লাইটের আগে হালকা কিছু খেয়ে নিচ্ছে।

আর কয়েকজন হালকা মেজাজে গল্প করছে, পরনে সাধারন পোশাক। আমরাও ভেতরে ঢুকে পোশাক পাল্টে সাধারণ জিন্স আর শার্ট পরে নিলাম। এখন আমাদেরকে দেখতে লাগছে একদল সাধারণ অভিযাত্রীর মতো, মনে হচ্ছে যেনো ছুটি কাটাতে যাচ্ছি। ঘুরে বেড়াবো, গলফ খেলবো, অনেকটা এরকমন। আমরা খেলবো ঠিকই, তবে গলফ স্টিকের বদলে আমাদের হাতে থাকবে রাইফেল আর আমাদের প্লে-গ্রাউন্ড হবে বিন লাদেনের কম্পাউন্ড।

একটা বাসে করে আমরা রওনা দিলাম এয়ারপোর্টে। যেতে যেকে রানওয়েতে একটা বিশাল সি-১৭ গ্লোবমাস্টার দাঁড়ানো দেখলাম। একদল সিআইএ আর এনএসএ এক্সপার্ট ওটাকে ঘিরে আছে। বাহ্ প্লেনও রেডি তাহলে, মনে মনে ভাবলাম। আমাদের ট্রাভেল প্ল্যান খুব সিম্পল, আমরা বেসে গিয়ে দুদিন কাটানোর পর তৃতীয় দিন রাতে চালানো হবে অপারেশন।

প্লেনে ওঠার সাথে সাথে আমি কাজে লেগে গেলাম। জিনিসপত্র গুছিয়ে হালকা পোশাক পরে আমার ঝোলানো বিছানা হ্যামকটা একপ্রান্তে ঝুলিয়ে আরাম করে শুয়ে অন্যদের দিকে নজর দিলাম। সবাই আমার মতোই প্রায় একই ধরনের কাজ করছে। কেউ কেউ শুয়েও পড়েছে। এই ধরনের লম্বা জার্নিটাকে সবাই চায় কমবেশি আরামদায়ক করে নিতে।

আমাদের প্রথম নয় ঘণ্টার জার্নি জার্মানি পর্যন্ত। তারপর সেখানে সামান্য বিরতির পর বাগরামে পৌছাতে আরো আট ঘণ্টা লাগবে। আমার কাছেই বিছানা পেতেছে সিআইএ

এক্সপার্ট জেন। আমি ক্লান্ত না থাকায় ওর সাথে গল্প জুড়ে দিলাম। মেয়েটার বাড়ি নর্থ কারোলিনায়, ওর সাথে অনেক আগেই আমার পরিচয় হয়েছে।

"আচ্ছা, এটা যে লাদেনই এই ব্যাপারটা কতটুকু নিশ্চিত?" আমি ওর কাছে জানতে চাইলাম।

"একশভাগ নিশ্চিত।"

কলেজ থেকে বেরিয়ে এজেন্সিতে জয়েন করার পর পরই ও লাদেন বিরোধী টাস্কফোর্সে যোগ দেয়। আল-কুয়েতির ফোন কল ট্যাপ করার পর, যে টিম একের পর এক ক্লু জোড়া লাগিয়ে গোটা ব্যাপারটাকে একটা অবস্থায় দাঁড় করিয়েছে, জেনও ওদের মধ্যে একজন। কাজেই ওর এই জবাব 'একশভাগ নিশ্চিত' মানে একশভাগ-ই নিশ্চিত। তবে কেন জানি লাদেনের অবস্থানের এই নিশ্চিত সত্যটা শুনে আমার পেটের মধ্যে গুড়গুড় করে উঠলো। তবে আমি ওর সাথে মজা করার জন্যে বললাম, "এই শতভাগ নিশ্চয়তা আবার ২০০৭-এর মতো না তো?"

২০০৭ সালে লাদেনকে ধরার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায়, একটা বিশদ অপারেশন চালানো হয়, কিন্তু পওয়া যায় নি কিছুই।

জেন আমার কথা শুনে হেসে ফেললো, "না না, ওটা একটা মিস লিড ছিলো।"

আমি মনে মনে হাসলাম, যাক সিআইএ ও অন্তত নিজেদের ভুল স্বীকার করে। বেশিরভাগ অফিসারই এটা করে না। জেন অন্তত করলো। তবে ক্ষেত্র বিশেষে জেনও অন্যান্য অফিসারদের মতোই। কারণ ও অ্যাসল্ট অপারেশন পছন্দ করে না। এই কথা ও ফাইনাল রিহার্সেলের আগে ভিআইপিদেরকে সরাসরিই বলেছে। কারণ ওর ধারণা এই লোকটাকে শায়েস্তা করার সবচেয়ে নিট অ্যান্ড ক্লিন উপায় হলো এয়ার বোম্বিং করা। তাতে ঝুঁকিও কম ঝামেলাও কম। তবে ভিআইপিরা ওর পক্ষে রায় দেন নি।

ওই ব্যাপারে কথা বলতে বলতেই এক পর্যায়ে ও বললো, "অনেকেই এই ধরনের অপারেশনে অনেক উল্টাপাল্টা কান্ড করে ফেলে, তাই আমি ইজি বাটনে চাপ দিয়ে কাজ হাসিল করার পক্ষপাতি।"

আমি হেসে জবাব দিলাম, "দেখো মেয়ে, আমাদেরকে পছন্দ করো আর নাই করো, যতোদিন আমাদের সাথে আছো, ততদিন নিজেকে আমাদের একজন ভাবতে হবে।" জেন হেসে জবাব দিলো, "তার মানে কি নিজেকে ছেলে ছেলে ভাবতে হবে?" দুজনেই হেসে উঠলাম।

"তবে একথা ঠিকই, এই ধরনের বড় গেমের জন্যে তোমরাই সেরা," জেন প্রশংসাসূচক কন্ঠে বললো।

ওর কথা ঠিকই কারণ ওরা প্রায় পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে, এই লোকটাকে ট্রেস করার চেষ্টা করছে। আর আমরা এখানে এসেছি ওদের পাঁচ বছরের সাধনাকে বাস্তবে রূপ দিতে।

"তোমরা তোমাদের কাজ করেছো, এখন বাকিটা আমাদের। আশা করি ত্রিশ মিনিটের খেলা ভালোই জমবে," আমি আনমনেই বললাম।

"হ্যা, আমিও তাই আশা করি, তবে আমি তোমাদের সাথে মেশার আগে ভাবতেও পারি নি তোমরা কেমন। সত্যি ভালো লাগলো তোমাদের সাথে কাজ করে," জেন বললো।

"উঁহু, বলি নি এখন তুমিও আমাদের একজন। তো আমরা এখন একই," আমিও ভদ্রতা দেখাতে কার্পণ্য করলাম না।

বাগরাম হল উত্তর-আফগানিস্তানের সবচেয়ে বড় ন্যাটো বেস। ছোটোখাটো একটা শহরের আয়তনের। এই বেসে নেই এমন কিছু নেই। আর এর নিরাপত্তা ব্যবস্থাও এক কথায় অসাধারন। তবে আমাদের জন্যে খারাপ, কারণ এই বেসে বেশিক্ষন থাকা মানে আমাদের মিশনের উদ্দেশ্য ফাঁস হয়ে যাবার সম্ভবনা। তবে আমরা খুব দ্রুতই জালালাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা দেব। জালালাবাদে আবার এই প্লেন নামানোর রানওয়ে নেই দেখে এখানে

আমাদেরকে নামতে হচ্ছে। এখান থেকে ছোট একটা প্লেনে করে আমরা ওখানে যাবো। আমরা এয়ারপোর্টে খুব সাবধানে থাকালাম যাতে আমরা লোকজনের চোখে না পড়ে যাই।

আমরা সরাসরি আমাদের প্লেন থেকে নেমে ছোট্ট বিমানটায় গিয়ে উঠলাম। সাথে সাথে একদল অফিসার আমাদের পেছনে ছোট তিনটা কন্টেইনার প্লেনে তুলে দিয়ে পেছনের র‍্যাম্প বন্ধ করে দিল। এই প্লেন একদম আরামদায়ক নয়, বসে মোটেও মজা পেলাম না। কারণ এর সিটগুলো আরামদায়ক নয়। তবে কপাল ভালো বাগরাম থেকে জালালাবাদ মাত্র এক ঘণ্টার জার্নি।

প্লেনটা ল্যান্ডও করলো অত্যন্ত জঘন্যভাবে। আমার মনে হল কেউ যেন আমার মেরুদন্ড ধরে জোরে ঝাঁকাচ্ছে। প্লেন থেকে নেমে দেখি বাইরেই আমাদের জন্যে বাস দাঁড়িয়ে আছে, এটা আমাদেরকে মূল ভবনে নিয়ে যাবে। এই এয়ারফিল্ডটা পাকিস্তান বর্ডার থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে এবং অনেক আমেরিকান সোলজারের হোমটাউন। আফগানিস্তানে ওয়ার্কিং সকল ইউনিটের জন্যে এটা মেন হেলিকপ্টার অপারেটিং বেস।

এই বেসটাতে প্রায় পনেরোশ' আমেরিকান সৈন্য এবং অসংখ্য সিভিলিয়ান কন্ট্রাক্টর বাস করে। এর নিজস্ব হাসপাতাল, জিম, সিনেমা হলসহ মার্কেট থেকে শুরু করে সবই আছে। রানওয়েটা এয়ারফিল্ডের ঠিক মাঝখানে। আর বেশিরভাগ বাসভবনগুলো দক্ষিণ দিকে। আমরা বাসে করে রওনা দিলাম। আমাদের প্রায় সবাই আগে এখানে কাজ করে গেছে। আমার নিজের কাছেও যেন মনে হচ্ছিলো বাড়ি ফিরে এসেছি।

"কি খবর, কেমন চলছে?" আমাকে দেখা মাত্রই উইল জড়িয়ে ধরে জানতে চাইলো।

ও আমাদের সাথে রেইডে অংশ নেবে এবং গোটা প্ল্যানটা পড়ার জন্যে অস্থির হয়ে আছে।

আমরা ফ্রেশ হবার পরই, এখানে কর্মরত এই অপারেশনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে ব্রীফিংয়ে বসে গেলাম। ওরা আগে একটা শুধু গুজব শুনেছিলো। কিন্তু ব্রীফিংয়ে বসে সমস্ত ডিটেইল জানতে পারলো ।

এখানকার নতুনদের ভেতরে উইলকে সাথে নেয়া হবে, কারণ ও-ই একমাত্র শুদ্ধ আরবি বলতে পারে। আর অন্যরা যাদেরকে ব্রীফ করা হচ্ছে, তারা থাকবে বড় বড় দুটো সিএইচ-৪৭ চপারে, ব্যাকআপ হিসেবে। ওরা মূল অপারেশনে না গিয়ে কাছেই অপেক্ষা করবে যাতে ডাকলে যেকোন সময় হাজির হতে পারে। আর ওদের আরো একটা ফাংশান আছে। সেটা হল রিফুয়েলিং। এই সিএইচ-৪৭ হেলিকপ্টারগুলো অনেকটা এয়ার কার্গোর মতো, ভেতরে অনেক জায়গা তাই এদের একটার ভেতরে প্রচুর ফুয়েল নেয়া হবে, যাতে আমাদের চপারগুলোর রিফুয়েলিং দরকার পড়লে আমরা এটাকে ডেকে এনে রিফুয়েল করতে পারি।

"তুমি মক-আপটা দেখেছো?" ব্রিফিংটা শেষ হবার পর আমি রুমের বাইরে বেরিয়ে হাটতে হাটতে উইলের কাছে জানতে চাইলাম। ও না-সূচক জবাব দিলে আমি আবার রুমে ঢুকে তালা খুলে মক-আপটা বের করে এনে ওকে দেখালাম।

ও মুগ্ধ দৃষ্টিতে মডেলটা দেখতে দেখতে প্রশংসা করলো।

উইল লম্বায় পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চির মতো হবে, হালকা পাতলা ফিগার। তবে আরবিতে দক্ষতার কারণে ওকে বেশ আলাদা চোখে দেখা হয়। আর ও দারুণ স্মার্ট, প্রফেশনাল এবং খুবই কম কথা বলে।

আসলে নেভি সিলদের জীবনটা অন্যান্য আর্মি বা ডিফেন্স জীবন থেকে একদম আলাদা। আর এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই আজ আমরা এই ধরনের একটা অপারেশনের দায়িত্বে। কারণ হোয়াইট হাউস জানে, কেউ যদি এ ধরনের অপারেশন পরিপূর্ণ আর সুষ্ঠুভাবে, যোগ্যতার সাথে সম্পন্ন করার ক্ষমতা রাখে তো সেটা নেভি সিল।

মডেলটা দেখতে দেখতে উইল বললো, "তো আমাকে ডিটেইলে সব জানাও।"

"আমরা থাকবো চক ওয়ানে," আমি ওকে বলতে লাগলাম। "আমাদের চপার

আমাদেরকে এই দিক থেকে কম্পাউন্ডের এই দিকে নামিয়ে দেবে," আমি মক-আপে ওকে অবস্থান দেখিয়ে দিতে দিতে বললাম।

"আমাদের দায়িত্ব হবে এই বিল্ডিংটা ক্লিয়ার করা," আমি ওকে সি-ওয়ানে আমাদের অবস্থান বুঝিয়ে দিলাম।

এরপর আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অপারেশনের যাবতীয় ডিটেইল এবং রিহার্সেলের ব্যাপারে আলোচনা চালিয়ে গেলাম।

উইল হল একমাত্র ব্যাক্তি যে আমাদের তিন সপ্তাহর রিহার্সেলে অংশ নেয় নি। তবে কোন অপারেশনের জন্যে এই রকম তিন সপ্তাহর রিহার্সেল খুব বিরল একটি ব্যাপার। সাধারনত আফগানিস্তান এবং ইরাকে কোন অপারেশন চালাতে হলে আমরা কয়েক ঘণ্টার ব্রীফিংয়ে অংশ নেই তারপর প্ল্যান করে অপারেশনে নেমে যাই।

আজ আমাদের অপারেশনের দিন।

আমরা আমাদের সমস্ত গিয়ার ঠিক করে সমস্ত ইকুইপমেন্ট রেডি করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এই অপেক্ষার সময়টা খুব খারাপ। এই সময়টা আমার কাছে মোটেই ভালো লাগে না।

আমার সবকিছু রেডি এবং চমৎকার অবস্থায় ঠিক রাখা আছে। নাইটভিশন এবং লেজারসাইটে একদম তাজা ব্যাটা ভরা। রেডিওটা চার্জে লাগানো। আমার গিয়ার, ভেস্ট, ব্যালিস্টিক প্লেট, পাউচ, হেকলার অ্যান্ড কচ ৪১৬ বিছানার একপাশে সারি সারি সাজানো। এমনকি মোজা জুতো সহ আর সবকিছুও একদম ঠিক করে রাখা। আর এর মধ্যেই জিনিসগুলো ডাবল চেক করা হয়ে গেছে। এই সময়টা সাধারনত আমরা জিমে হালকা ধরনের কোন এক্সারসাইজ করে অথবা কফি খেয়ে কাটাই।

অপেক্ষার সময়টাতে আমার মনে পড়ে গেল মিশন লঞ্চ হবার আগের দু'দিনের কথা।

আমরা পৌছানোর পরের দিন উইলের সাথে আমি এবং আরো কয়েকজন হ্যাঙ্গারে গেলাম পাইলটের সাথে দেখা করার জন্যে। আমি আগেও ১৬০ স্পেশাল এভিয়েশন ক্রুদের সাথে কাজ করেছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি এরা পৃথিবীর সেরা পাইলট।

টেডির বয়স পঞ্চাশের মতো, তামা রঙা চুলের একজন ছোটোখাটো মানুষ, ইনিই চক ওয়ানের পাইলট। টেডির সাথে আমাদের দেখা হল হ্যাঙ্গারের প্রবেশপথে। আমরা দীর্ঘ সময় ধরে বিশদ আলোচনা করলাম। আবশেষে বিদায় নেবার আগে টেডি বললো, "আমি আমার সেরা চেষ্টা করবো তবে কখন কি পরিস্থিতি হয়, তা তো বলা যায় না। যদি একান্তই কোন খারাপ পরিস্থিতি দেখা দেয় সেক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করবো চপারটাকে উঠোনের পশ্চিম দিকে ল্যান্ড করানোর।"

আমি বুঝলাম এটাও একজন এক্সপার্টের অ্যাডভাইজ। কারণ এটাই এই কম্পাউন্ডের সবথেকে বড় জায়গা, সেই সাথে চপারের কিছু হলে ওটাকে ওখানে নামানোই সবচেয়ে নিরাপদ।

আমি হালকা সুরে পরিস্থিতি হালকা করার জন্যে বললাম, "আপনি চিন্তা করবেন না কারণ আমি নিশ্চিত যদি কোনো চপার ভূপাতিত হয় তবে সেটা হবে চক টু। যদিও আমি নিজে কখনো সরাসরি কোন ক্র্যাশে ছিলাম না তবে নেভি সিলদের জন্যে চপারের পতন নতুন কিছু না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটা হয় সাধারনত দ্বিতীয় অন এয়ার চপারের ক্ষেত্রে। কে জানতো এবার থেকে এই ধারণা নতুন রূপ নিতে শুরু করবে। ,

কোন মিশনের ক্ষেত্রে এই ধরনের টান টান অবস্থা আমাদের এর আগে হয় নি। কারণ একে তো অপারেশনটা দারুন গুরুত্বপূর্ণ, আরেক দিকে গত প্রায় এক মাসের টানা হার্ডওয়ার্ক আর প্রিপারেশান রিহার্সেলের কারণে আমরা এই মিশনটার ব্যাপারে একদম বুঁদ হয়ে গেছি। যে কারণে এই শেষমুহূর্তে সবকিছু অসহ্য লাগছে। এই সময়ে ম্যাকর‍্যাভেনও ছিলেন আফগানিস্তানে। এর আগে আরেক দিকে গত মিশনের উনি শেষমুহূর্তে জালালাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। শেষ মুহূর্তের প্রিপারেশান এবং কিছু আন্তসংযোগ উনি নিজ চোখে দেখতে চান।

কিন্তু ওয়াশিংটনে চলছিলো অন্যরকম জল্পনা-কল্পনা। কারণ জেনের সহকর্মী অ্যানালিস্টারা প্রায় নিশ্চিত ছিলো, লাদেন এই কম্পাউন্ডের ভেতেরেই আছে। কাজেই তারা যে ব্যাপারটাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছিলো তা হলো মিশনের গোপনীয়তা। তাদের ধারণা এই অপারেশনের কথা কোনভাবে ফাঁস হলেই লাদেন পালিয়ে যাবে। কাজেই সবমিলিয়ে উত্তেজনা চরমে।

দ্বিতীয় দিন আমরা একটা ক্যাম্প ফায়ারের পাশে গোল হয়ে বসে কফি খাচ্ছিলাম। হঠাৎ ওয়াল্ট বলে উঠলো, "একটা কথা, লোকটাকে ধরতে পারলে বা কোনো কারণে গুলি করতে হলে কিছুতেই তার মুখ বা মাথায় গুলি করা যাবে না। কারণ পুরো পৃথিবীর লোকে তাকে দেখতে চাইবে।"

“হ্যা, তোমার কথা ঠিক আছে কিন্তু যদি অন্ধকার থাকে, আর শুধুমাত্র লোকটার মাথাই দেখা যায়, পরিস্থিতি যদি আমাকে বাধ্য করে তবে আমি কোনো ঝুঁকি নেবো না,” চার্লি জবাব দিলো।

“সেক্ষেত্রে আমি ওয়াল্টকে সমর্থন করি কারণ আমার বিশ্বাস কোনো অপশন সবসময়ই থাকে। মাথায় না করে তুমি বুকে গুলি করতে পারো সে রকম পরিস্থিতি হলে,” আমি জবাব দিলাম।

“সেটা তুমি এখন বলতে পারছো, সেসময় এরকম পরিস্থিতি নাও থাকতে পারে,” ওয়াল্ট বললো।

“শোন, তোমার জন্যে আমি বলবো একটু উঁচুতে গুলি করতে, কারণ তুমি তার কোমর সমান হবে,” আমি ওয়াল্টের সাথে দুষ্টুমি করে বললাম। কারণ খাটো ওয়াল্টের সামনে প্রায় সাড়ে ছয়ফিট লাদেন দানবের মতোই।

আমরা আরেকটা বিষয়ে মজা করতে লাগলাম। সেটা হল এই অপারেশন নিয়ে যদি হলিউড সিনেমা বানায় তবে ওয়াল্টের চরিত্রে খাটো কাউকে নিতে হবে, কারণ ব্র্যাড পিট বা জর্জ ক্ুনিতো এই চরিত্র করবে না। তবে সমস্যা হল বিন লাদেনর চরিত্রে ওরা কাকে কাস্ট করবে?

অবশ্যই নতুন কাউকে করবে। কারণ, এতে করে সে হলিউডে ক্যারিয়ার গড়ার ভালো একটা সুযোগ পেয়ে যাবে“, কে যেন ফোড়ন কাটলো।

“তবে যাই বল, আমি দেখতে পাচ্ছি ওবামাকে। কিভাবে নেক্সট ইলেকশান ক্যাম্পেইনে, লাদেন অপারেশনের লোহমর্ষক বর্ণনা দিচ্ছেন, জনগনের সামনে। আমাদের এই অপারেশন সফল হলে ওবামা নিশ্চিত আরেকবার নির্বাচিত হবেন,” ওয়াল্ট বলে উঠলো।

ব্যাপারটা আমিও ভাবছিলাম, পৃথিবাটা সত্যিই আজব। কষ্ট করে জীবন দিয়ে কাজ করবো আমরা কিন্তু সেটার ফায়দা লুটবে পলিটিশিয়ানরা, আর জনগণও তাদেরকেই হিরো ভাববে। আজব!

তবে আমি ভালো করেই জানি এই ব্যাপারটা আমাদের থেকে কিংবা রাজনীতি থেকে অনেক বড়। ব্যাপারটা এমন না যে জনগন আমাদের ভূমিকা জানে না বা পলিটিশিয়ানরা আমাদেরকে আড়াল করে হিরো হতে চায়। আসলে সিস্টেমটাই এমন। আর আমাদের পুরস্কার হলো কাজটা ভালোভাবে সম্পন্ন করা। এর কিছুক্ষন পর আমরা ফায়ার ক্যাম্প থেকে উঠে ঘুমাতে চলে গেলাম এবং পরের দিনও প্রায় সারাদিনই ঘুমালাম।

আমি দুটো ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমিয়েছি। মজার ব্যাপার হল কেউই ঘুমের বড়ি ছাড়া এরকম সময়ে ঘুমাতে পারে না। এর কারণ মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজনা। আমরা সবাই জানি আমাদের রেস্ট দরকার কিন্তু স্বাভাবিকভাবে সেটা সম্ভব না। কাজেই ঘুমের বড়িই ভরসা। দুই দিন কেটেছে মাত্র অথচ মনে হচ্ছে যেন দু’ মাস।

তৃতীয় দিনটা মিশনের দিন। কিন্তু ভারি মেঘে আকাশ ঢাকা। মিশন দেরি হবার সম্ভবনা দেখা দিলো। আমরা লাঞ্চ সারলাম বেশ তাড়াতাড়ি কারণ ঘুমাতে হবে। ম্যাকর্যাভেন কম্পাউন্ডের উপরে নজর রাখার ব্যবস্থা করেছেন কারণ ঠিক তো নেই যদি আমরা রওনা দেবার পথে লাদেন কম্পাউন্ড ছেড়ে চলে যায়।

লাঞ্চের পর আমরা সবাই মিলে গেলাম চার্চের রুমের মতো বেঞ্চ ফেলা একটা রুমে বিভিন্ন ধরনের ব্রিফিং শুনতে। রুমটার ঠিক সামনে একটা প্রোজেক্টরে পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশানের ভঙ্গিতে কম্পাউন্ডের ছবি অথবা স্যাটেলাইট ইমেজ ফুটে উঠছে। শেষ মুহূর্তের ব্রীফিংটা হলো যদি মিশন কেঁচে যাবার সম্ভবনা দেখা দেয় সেক্ষেত্রে করনীয় কি? কিংবা আমাদেরকে যদি পাকিস্তানি কোনো বাহিনীর মোকাবেলা করতে হয়। প্রেসিডেন্ট আমাদেরকে গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছেন নিজেদের সিকিউরিটির প্রয়োজনে যেকোনো কিছু করার। কারণ আমরা পাকিস্তানের ভেতরে একটা আবাসিক এলাকায় মিশন চালাতে যাচ্ছি, কাজেই তাদের ব্যাপারটা মাথায় রাখতেই হবে।

“ওকে বয়েজ,” অফিসার আমাদেরকে বললো। “আমরা একটা আইএসআর প্ল্যাটফর্মের খোঁজে এসেছি। এটাই বলতে হবে।”

আইএসআর প্ল্যাটফর্ম হলো একটা ড্রোন হেলিকপ্টার। প্ল্যানটা হল যদি আমরা ওদের সামনে পড়েই যাই, তবে ওদেরকে বলবো আমেরিকান বেস থেকে একটা ড্রোন চপার খোয়া গেছে এবং আমরা সেটার খোঁজে এসেছি। আমাদেরকে প্ল্যানটা বলতেই অফিসারের কথায় সবাই হেসে ফেললাম। ক্ষনিকের জন্যে হলেও মনটা একটু হালকা হলো।।

তবে এই গল্পটাতে একটা ফাঁক আছে, কারণ এইভাবে আমরা ওদের দেশের ভেতরে অপারেশন চালাতে পারি না। এমনকি একটা ড্রোন হারানো গেলেও না। নিয়ম হলো এরকম ক্ষেত্রে আমেরিকান অথরিটি পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ করে জিনিসটা ফেরত চাইবে। ওরা নিজ দায়িত্বে সেটা খুঁজে ফেরত পাঠাবে, না পারলে বিশেষ অনুমতি নিয়ে ছোটো একটা দল যেতে পারে। আর আমরা ২৪জনের একটা দল পূর্ণ অস্ত্রসস্ত্র আর হেভিগিয়ার নিয়ে একটা অ্যাসল্ট কুকুরসহ, পাকিস্তানি মিলিটারি এরিয়ার এতো কাছে কোনো অনুমতি ছাড়াই অনুপ্রবেশ করেছি, সেটা বোঝানো অসম্ভব হবে। তারপরও একটা অজুহাত দাঁড় করানো আর কি।

অফিসারের ব্রিফ শেষে ডেভগ্রু’র একজন কমান্ডার ভেতরে প্রবেশ করলেন। সিলভার রঙের চুল, কড়া গোফ সামান্য খুড়িয়ে হাটেন। বেশ কয়েক বছর আগে উনি প্যারাসুট জাম্পিঙে একটা পা হারান। তবে খুব খুঁটিয়ে খেয়াল না করলে সেটা প্রায় ধরা যায় না বললেই চলে।

কমান্ডারের প্রবেশমাত্রই আগের হালকা পরিবেশটা মুহূর্তে ভারি হয়ে উঠলো।

“ওকে গাইজ,” কমান্ডার করলেন। এইমাত্র ম্যাকর‍্যাভেনের সাথে কথা বলে এলাম। অপারেশন অ্যাপ্রুভ করা হয়েছে। আমরা যথাসময়েই অপারেশন লঞ্চ করবো।”

কোনো শব্দ নেই রুমে, কেউ উচ্ছ্বাস বা আনন্দসূচক কোনো শব্দ করলো না। আমি আমার দু' পাশে বসা দু’জনের দিকে তাকালাম। বছরের পর বছর ধরে আমরা একসাথে কাজ করছি। আমি জানি কার মনে কি চলছে।

আমার মনে শুধু একটাই শব্দ এলো হলি শিট! আমি এখনো ভাবতে পারছি না ব্যাপারটা সত্যিই ঘটতে চলেছে।

আর কোনো ব্রিফিং হবে না।

আর কোনো আলাপ আলোচনার দরকার নেই।

আর কোনো অপেক্ষাও করতে হবে না।

গো ডে

আমি ঘুমাতে পারি নি।

ভেবেছিলাম ঘুমাতে না পারি, অন্তত কিছুক্ষণ বিশ্রাম তো নেওয়া যাবে। কিন্তু হাবিজাবি চিন্তার কারণে সেটাও হলো না। আজই মিশনের দিন। ব্যাপারটা মাথায় আসতেই অস্থির লাগছে, অনেকটা যেন কঠিন কোন পরীক্ষা দেয়ার আগে যেমন লাগে।

আমি বাঙ্কের উপরে উঠে বসে চোখ ডলতে লাগলাম। তিনদিন যাবৎ মিশন মিশন করার পরে আসলেই মাথা থেকে এই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা দূর করা সম্ভব নয়। আর মাত্র বারো ঘণ্টারও কম সময় পর আমরা পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বিন লাদেনের কম্পাউন্ডের ভেতরে থাকবো।

উঠে বসার পর খেয়াল করলাম শরীরটা ঝরঝরে লাগছে কিন্তু মাথায় চিন্তার ঝড়। আমাদের সবার অপেক্ষার প্রহর শেষ।

সাবধানে উঠে বসে কাপড় পরতে লাগলাম। সাবধানে কারণ টিমমেটদের কয়েকজন বেশ আরামে ঘুমাচ্ছে। কাপড় পরে সানগ্লাসটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। বাইরের কড়া রোদের আঘাতটা মনে হল যেনো স্লেজ হ্যামারের মতো এসে গায়ে লাগলো। আমার মনে হচ্ছে সারারাত লাসভেগাসের কোনো ক্যাসিনোতে জুয়া খেলে সকালবেলা বেরিয়ে এলাম।

রোদটা একটু চোখে সয়ে এলে, একবার ঘড়ি দেখে, ক্যান্টিন হলের দিকে হাটতে লাগলাম। রাতের অপারেশনের কথা চিন্তা করে ঘুমানোর ব্যাপারটা ভাবলে, এখন আমাদের জন্যে সকাল। কিন্তু বাকি বেসের জন্যে এখন একদমই দিনের কর্মব্যস্ত সময়। চারপাশে লোকজন প্রচন্ড কাজে ব্যস্ত। নাকে এসে লাগলো কেমিকেলের ঝাঁঝালো গন্ধ।

নুড়ি বিছানো পথ ধরে হাটতে হাটতে প্রথম গেটের কাছে চলে এলাম। পকেট থেকে বের করলাম গেটের কম্বিনেশান লেখা একটা কাগজ।

অ্যাম্বিয়েন, মানে ঘুমের ওষুধের কারণে, আমার মাথা এখনো ভারি। কোড পাঞ্চ করলাম কিন্তু কোনো কাজ হলো না।

তিন-চারবার ট্রাই করার পর যখন হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছিলাম, গেটটা খুলে গেল। তার মানে আমিই ভুল কোড দিচ্ছিলাম। এখানে এসেছি কারণ ভাবলাম, উঠেই যখন পড়েছি কিছু খেয়ে নেয়া যাক। ঘুমাতেই পারলাম না, আর খাওয়া। কয়েক ঘণ্টা পর, জীবনের সবচেয়ে বড় মিশনে যাবার, ঠিক আগে গলা দিয়ে খাবার নামানো কঠিন হবে।

খাবার হলের ভেতরে ঢুকে, আগে বরফ ঠান্ডা জল দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নেবার পর, খানিকটা ফ্রেশ লাগলো। ক্যাফেটেরিয়াটা বেশ পুরনো ধাঁচের। দেয়ালো ঝোলানো সেই সত্তরের দশকের বিভিন্ন ধরনের ছবি। আমি বুফের স্টিল কেসের দিকে এগিয়ে গেলাম। প্রতিটা কেসের পেছনে একজন করে সাদা অ্যাপ্রোন আর সাদা টুপি মাথায় শেফ। কি খাওয়া যায় ভাবতে ভাবতে এগোলাম। আমার আসলে এনার্জি দরকার। তাই গ্রিল এরিয়ার দিকে গিয়ে শেফকে অর্ডার দিলাম।

"চারটা স্ক্যামবলড এগ, চিজ আর হ্যাম প্লিজ,"

লোকটা ডিম বানানো শুরু করতেই আমি প্লেটে বেশ কিছু টোস্ট আর ফলমূল তুলে নিলাম। ফল সিলেক্ট করার সময় খেয়াল রাখছি যেগুলোতে বেশি পরিমাণ এনার্জি আছে সেগুলো নিতে। আমি খাবারের ব্যাপারে কখনোই খুব একটা অতি-আগ্রহী না। অত খেয়ে কি হবে?

তবে এখন খাবার দরকার এনার্জির জন্যে। দুটো রুটি টোস্টারে দিয়ে টোস্ট করতে লাগলাম।

খাবার রেডি হতে হতে ফল খেতে লাগলাম। আমার ডিম আর টোস্ট এসে যেতেই খাওয়া শুরু করে দিলাম। এই ক্যান্টিনটাও শুধুমাত্র কিছু অফিসারদের জন্যে বরাদ্দ হলেও

এখানে উপস্থিত বেশিরভাগ লোকেরাই আমাদের মিশনের ব্যাপারে জানে না। তাই চারপাশে গুঞ্জন আর ব্যস্ততার মাঝেও নিজেকে একলা লাগছে। দূরে একটা টেবিলে দেখলাম টিমমেটদের কয়েকজন বসে চুপচাপ খাচ্ছে। ওরা আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লো। একবার ভাবলাম ওদের সাথে গিয়ে বসি, পরে বাতিল করে দিলাম। কারণ ওরা একসাথে বসে থাকলেও কেউ কথা বলছে না। সবাই আসলে যে যার যার ভাবনায় ডুবে আছে। খাবারের মান খুব একটা ভালো না হলেও পেট ভরেই খেলাম, কারণ এরপরে মিশনের ঠিক আগে খুব ভারি কিছু খাওয়া ঠিক হবে না। আসলে এটা খাওয়া না, নিজেকে ফুয়েল দেয়া। আমার মনে হয় না টিমমেটরা কেউই ঠিকমতো খেয়েছে।

খাওয়া শেষ করে কফি নিয়ে ওদের সাথে এসে বসলাম। "কেমন ঘুমালে?" চার্লির কাছে জানতে চাইলাম।

"বিচ্ছিরি," ওর জবাব।

"ওষুধ খেয়েছিলে?"

"দুটো।"

"যাক একটা ভালো দিক অন্তত আছে, এই যে রাজার হালে বুফে ব্রেকফাস্ট করছি, আমার মনে হচ্ছে কোন ফাইভস্টার হোটেলে খাচ্ছি," ওকে অনেকটা সান্ত্বনা দেয়ার সুরে বললাম।

"খুব ভালো বলেছো," চার্লি কাটা কাটা জবাব দিল। "মাথায় আর কিছু আসছে না দেখে এখন কি খাবার নিয়ে গবেষণা শুরু করলে নাকি!"

আমি জোরে হেসে উঠলাম। আমার ফালতু জোকে কাজ না হলেও চার্লির কথায় পরিবেশট◌া হালকা হয়ে গেল। কিন্তু এরপর আমরা আর কোন কথা বললাম না। না মিশন, না অন্যকিছু। আসলে আর কিছু বলারও নেই।

রুমে ফিরে এসে দেখি এখনো দুয়েকজন চুপচাপ শুয়ে আছে। ঘুমাচ্ছে কিনা কে জানে। আমি আস্তে করে আমার ব্রাশ বের করে, তাতে পেস্ট লাগিয়ে, এক বোতল জল হাতে, বাইরে এসে দাঁত ব্রাশ করতে লাগলাম।

ব্রেকফাস্ট, চেক।

ব্রাশ মাই টিথ, চেক।

রুমে ফিরে আমি জিনসপত্র গোছাতে লাগলাম। প্রথমেই বের করলাম আমার প্রিসিশান ডিজিটাল কমব্যাট ড্রেস। জিনিসটা মূলত শার্ট আর কার্গো প্যান্ট। এতে দশটা পকেট আছে, প্রতিটা আলাদা, আলাদা প্রয়োজনে ব্যাবহারের জন্যে। এই শার্টটা বিশেষভাবে আর্মারের নিচে পরার জন্যে তৈরি। এর হাতা আর কাঁধ ক্যামোফ্লেজ করা, কিন্তু বডি ট্যান কালারের আর এমনভাবে তৈরি যাতে বেশি ঘাম না হয়। এখানে য◌ে বিচ্ছিরি রকমের গরম, তাতে আমি পারলে এটার হাতা দুটো কেটে ফেলতাম। প্যান্টটাও বিশেষভাবে তৈরি অনেক গবেষণার ফসল। এর প্রতিটা জিনিস মেপে মেপে আলাদা আলাদা উদ্দেশ্যের জন্যে বানানো হয়েছে।

আমি বিছানায় বসে রেডি হতে লাগলাম।

এই রেডি হওয়াটাও মিশনেরই একটা অংশ। প্রতিটা কাজ করতে হয় মনোযোগ দিয়ে, তারপর আবার চেক, ডাবল চেক করতে হয়। এটাই রেডি হবার নিয়ম। প্যান্টটা পায়ে গলাবার আগে আবারও প্রতিটা পকেট চেক করে নিলাম।

আমার কার্গো প্যান্টের এক পকেটে আমার অ্যাসল্ট গ্লাভস, আরেক পকেটে এক্সট্রা ব্যাটারি, এনার্জি জেল এবং দুইটা পওয়ার বার। একটা এক্সেল পকেটে একটা টার্নিকেট (রক্ত পড়া বন্ধ করতে ব্যবহৃত হয়), আরেক পকেটে রাবার গ্লাভস আর এসএসই কিট। আমার বাম কাঁধের এক পকেটে ২০০ ডলার ক্যাশ। এটা রাখা হয় যেকোন প্রযোজনে ব্যবহার করার জন্যে, ডান পকেটে একটা ডিজিটাল ক্যামেরা, অলিম্পাস পয়েন্ট অ্যান্ড শুট। আর পেছনের দিকে কোমরে আছে একটা ডেনিয়েল উইঙ্কলার ফিক্সড ব্লেড নাইফ।

শার্ট আর প্যান্ট পরে নিয়ে চেক করে দেখতে লাগলাম। শার্টের সামনে আর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ অর্গানগুলোকে কভার করার জন্য দুটো সিরামিকের প্লেট আছে। সামনের প্লেটের দুইপাশে লাগানো দুটো রেডিও। রেডিও দুটোর মাঝে হেকলার অ্যান্ড কচের জন্যে দুটো এক্সট্রা ম্যাগজিন। আরো আছে কয়েক ধরনের কেমিকেল লাইট, এই লাইটগুলো রুমের ভেতরে ছুড়ে দিলে খালি চোখে কিছু দেখা যায় না, কিন্তু নাইট ভিশনে একদম দিনের মতো পরিষ্কার দেখা যায়।

আমার বোল্ট কাটারটা রাখা আছে পেছনে আটকানো একটা পাউচে। পাউচটা আবার পাতলা দুটো স্ট্র্যাপ দিয়ে কাঁধের সাথে আটকানো। আমার ভেস্টের সাথে আটকানা আছে দুটো এন্টেনা। আমি হাত বুলিয়ে সবকিছু চেক করে, আমার হেলমেটটা তুলে নিলাম। এটার ওজন প্রায় দশ পাউন্ডের কাছাকাছি, এতে বিল্টইন নাইটভিশন গ্লাস লাগানো আছে। এটা দিয়ে একটা নাইন এমএমের গুলি আটকানো সম্ভব। কিন্তু পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি এটা দিয়ে একে৪৭-এর গুলিও আটকে যায়। আমি হেলমেটে লাগানো রেইল সিস্টেম স্লাইডটা ওপেন করে চেক করলাম। অতি সম্প্রতি প্রিন্সটনে এই টেকনোলজিটা আবিষ্কার হয়েছে।

আমি হেলমেটটা মাথায় পরে ওটার নাইটভিশনে দেখতে লাগলাম।

এটা পৃথিবীর আধুনিকতম নাইটভিশন। এটা দিয়ে পুরো ১২০ ডিগ্রি দেখা যায়। সেই সাথে এতে আছে চমৎকার একটা ম্যাগনিফায়ার যা দিয়ে দূর থেকেও যেকোনো জিনিসের ডিটেইলস দেখা সম্ভব। অন্যান্য যেকোন নাইট ভিশনে দৃষ্টি হয় অনেকটা ঘসা কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখার মতো কিন্তু এতে একদম পরিষ্কার একটা ভিউ পাওয়া যায়। এটাকে সংক্ষেপে বলা হয় এনভিজি অর্থাৎ নাইটভিশন গগল্স।

সবশেষে আমি তুলে নিলাম আমার রাইফেলটা।

কাঁধে ঠেকিয়ে ওটার ইও টেক সাইট ওপেন করলাম। এটা দিয়ে এমনকি দিনের বেলাতেও একদম সূক্ষ্মতম লক্ষ্যে আঘাত হানা যায়। চোখে এই এনভিজি আর রাইফেলে ইও টেক থাকলে, দিনে বা রাতে সমান সুবিধা নিয়ে শুট করার সম্ভব।

আস্তে করে বোল্ট টেনে আমি একটা বুলেট নিয়ে এলাম চেম্বারে। একদম ঠিক আছে বুঝে ওটাকে আবার আনলোড করে দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে রাখলাম। সমস্ত গিয়ার রেডি এবং চেক করে আমি একটা ছোট্ট পুস্তিকা নিয়ে বসলাম। এটাতে আমাদের মিশনের সবকিছু এক নজরে দেয়া আছে। প্রথমেই টার্গেট কম্পাউন্ডের বেশ ভালো একটা ইমেজ থেকে শুরু করে সমস্ত ধরনের রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিসহ শেষ পৃষ্ঠায় দেয়া আছে সম্ভাব্য সব টার্গেটের নামসহ একটা করে ছবি।

আমি ছবিগুলো একে একে ভালো করে দেখতে লাগলাম। প্রথমেই আল-কুয়েতিদের দুই ভাইয়ের ছবি। আমি আহমেদ আল-কুয়েতিকে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে খুঁটিয়ে দেখলাম। কারণ ধারণা করা হচ্ছে সেও সি-ওয়ানে আছে। আর ওটাই আমার টার্গেট ক্লিয়ারেন্স এরিয়া। এখানে ছবির সাথে ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস মানে উচ্চতা, গড়ন ইত্যাদি বিস্তারিত দেয়া আছে। শেষ পৃষ্ঠায় আছে বিন লাদেনের ছবি এবং তার পরে আরো সম্ভাব্য লোকজন, যাদের ছবি নেই বা তারা হয়তো এই কম্পাউন্ডে থাকতে পারে তাদের বর্ণনা দেওয়া আছে।

গিয়ার আর ড্রেসআপ সব শেষ করার পর, আমি আমার সলোমন কুইস্ট বুটজোড়া তুলে নিয়ে পরতে লাগলাম। এই বুটগুলো আমার বিশেষ প্রিয়, এগুলো দিয়ে আমি কুনারের পাহাড় থেকে শুরু করে ইরাকি মরুভূমিতে ডিউটি করেছি। আগে একবার আমার একটা গোড়ালি ভেঙেছিলো আর এই বুটগুলো আমার ভাঙা গোড়ালিকে বেশ ভালো প্রটেকশান দেয়। আমার প্রতিটি জিনিস আগে বিভিন্ন মিশনে ব্যবহার করেছি এবং আমি জানি এগুলোর প্রত্যেকটাই চমৎকার কাজ করেছে, করছে এবং করবে।

এই ধরনের মিশনে যাবার আগে আমার যে কথাটা সবসময় মনে হয়, আজও বুটের ফিতে বাঁধতে বাঁধতে সেটাই মনে হলো। হয়তো এটাই আমার শেষ মিশন, হয়তো এইভাবে

রেডি হয়ে আর কোনদিন কোন মিশনে যাওয়া হবে না। কারণ এগুলো যে ধরনের মিশন তাতে যেকোন কিছুই হতে পারে। মারা যেতে পারি, আহত হয়ে চিরকালের মতো পঙ্গু হয়ে যেতে পারি।

প্রতিবারের মতো এবারও মনকে কড়া শাসনে বাধ্য করলাম, উল্টোপাল্টা কিছু না ভাবতে। এটাই আমার কাজ এবং যতোদিন বেঁচে আছি এটাই আমাকে করতে হবে। আর আজকের অপারেশনটা হয়তো একটা ভিউ থেকে বিশেষ কিছু, কিন্তু আরেকদিক থেকে চিন্তা করলে সাধারনও। কারণ আমাদেরকে একটা কম্পাউন্ড রেইড দিয়ে একজন মানুষকে ধরে আনতে হবে বা তার মৃত্যু নিশ্চিত করতে হবে। সে যেই হোক না কেন। আমি এসব ভাবতে ভাবতে সুন্দর করে বুটের ফিতে বাধার কাজ শেষ করলাম।

শেষ মুহূর্তে আরো কিছু কাজ সারতে হবে। ফিতের শেষ গিট্টুটা দিলাম দুই পরত, তারপর সেটার প্রান্ত বুটের একদিকে ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। রুমের মাঝে আমার প্রায় ষাট পাউন্ড ওজনের ভেস্টটা রাখা আছে। সেটা তুলে নিয়ে আলতো করে মাথা গলিয়ে পরে নিলাম। তারপর ফিতেগুলো সুন্দর করে বেধে চেক করে দেখলাম ফ্লেক্সিবেল নড়াচড়া করতে পারছি কিনা। তারপর আমি একে একে চেক করে দেখলাম, আমার শরীরে কোথায় কি আছে, সেটা ঠিকমতো মনে আছে কিনা এবং মস্তিষ্কের নির্দেশ পাওয়া মাত্র হাত জায়গামতো পড়ছে কিনা। সব চেক করার পর মাথা নাড়লাম সন্তুষ্ট চিত্তে।

তারপর বুকের এন্টেনার সাথে আমার হেডসেট অর্থাৎ চিকবোনের সামনে চলে আসা রেডিওটা চেক করে দেখতে লাগলাম। এটাতে বেশ কয়েকটা অপশন এবং বেশ কয়েক ধরনের সুবিধা আছে। ইচ্ছে করলে আমি এটা দিয়ে আমার ফেলোমেটদের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারবো, অপারেশনের সবার কথা শুনতে পারবো আবার চাইলে অপারেশন হেড সেন্টারের সাথেও কথা বলতে পারবো। এটা থেকে বেসের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হয় স্যাটেলাইট ফোনের মাধ্যমে।

আমার সবকিছু চেক করা শেষ। রুমের চারপাশে একবার চোখ বুলালাম কিছু ভুলে গেছি কিংবা কিছু মিস হয়েছে কিনা দেখতে। না, সবই ঠিক আছে। বাইরে সূর্য অস্ত গেছে। আমার চারপাশে সবাই যার যার মতো করে রেডি হচ্ছে। মাঝে মাঝে হালকা আলাপের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কারণ রেডি হবার সময়ে সবাই কথা খুব কমই বলে। আমি রুম থেকে বেরিয়ে এলাম।

আমাদের অপেক্ষার জায়গাতে এসে দেখি এরই মধ্যে দুয়েকজন চলে এসেছে। এখানেই যাবার আগে ম্যাকর‍্যাভেন আমাদের সাথে মিটিং করবেন। এই মিটিংটা শুধুমাত্র তার অনুরোধেই আয়োজন করা হয়েছে।

“কি, রেডি তো?” আমি হালকাস্বরে উইলকে জিজ্ঞেস করলাম।

কিন্তু উইল বেশ দৃঢ়তার সাথেই বললো সে রেডি।

আমি চারপাশে তাকিয়ে দেখতে পেলাম ওয়াল্ট এবং চার্লিসহ বাকিরা প্রত্যেকেই যার যার টিমের সাথে অপেক্ষা করছে। মূল নাটক শুরু হতে আর দেরি নেই। এখন সবাই রেডি এবং সিরিয়াস।

একটু পরেই ম্যাকর‍্যাভেন প্রবেশ করলেন। সাথে সাথে সবাই চুপ হয়ে গেল। উনি ভেতরে ঢুকে কোন রকম ভণিতা না করে সোজা কাজের কথায় চলে এলেন এবং তার আলোচনার বেশিরভাগ অংশ জুড়ে থাকলো কৌশলগত বিষয়। কোনো গুডলাক উইশ না, কোনো ফালতু কথা না। কথা শেষ করে উনি সবার শেষে বললেন, “চক-ওয়ান এবং চক-টু তে আপনাদেরকে পৌছে দেয়ার জন্যে বাইরে বাস অপেক্ষা করছে।

আমি বাসে উঠে মাঝামাঝি একটা সিটে বসলাম। চার্লি আমার কাছেই বসেছে। বাসটা পুরনো এবং নোংরা। আর জার্নিটাও হল খুব বিরক্তিকর একটা রাস্তা দিয়ে। তাই কয়েক মিনিটের পথ মনে হলো যেনো কয়েক ঘন্টা।

কিছুক্ষনের মধ্যেই হ্যাঙ্গারের আলো দেখা গেল। ওখানেই আমাদের চপার দুটো থাকার

কথা। চারপাশ চোখ ধাঁধানো আলোয় আলোকিত। পেছন থেকে শক্তিশালি জেনারেটরের ভারি আওয়াজ ভেসে আসছে। আমরা হ্যাঙ্গার এলাকার ভেতরে প্রবেশ করলাম।

হ্যাঙ্গারের ভেতরে ক্রুরা শেষ মুহূর্তে চপার দুটোর সবকিছু চেক করছে। আমরা বাস থেকে নেমে সামনে এগোলাম। জেনারটের আর চপারের রোটরের আওয়াজে কথা বলা বা কিছু শোনা দায়। আমরা একে অপরের কাছ থেকে হাসিমুখে বিদায় নিয়ে যার যার চপারের দিকে এগোলাম। কেউ কথা বললো না কারণ কথা এখানে শোনা যাবে না। কিন্তু প্রত্যেকের মুখের অভিব্যক্তিই মনের ভাব প্রকাশ করে দিচ্ছে।

আসলে আর বলার মতো আর কিছু নেইও।

আমরা চপারে উঠে যার যার পজিশন মতো বসে গেলাম। আমি দরজার একদম পাশেই হেলান দিয়ে আরাম করে বসলাম। দরজার একদম পাশেই বসার কারণ হল আমিই প্রথম রোপের সাহায্যে নিচে নামবো। আমার ঠিক পাশেই আছে ওয়াল্ট আর তার পাশে স্নাইপার। প্রথম রোপ ডাউন হবার সাথে সাথে ওরা দরজার দুইপাশে পজিশন নিয়ে কভার দ েবে এবং সেই সময়ে বাকিরা নেমে আসবে।

কিছুক্ষন অপেক্ষার পর একজন ক্রু ফাইনাল সিগন্যাল দিতেই চপার উপরে উঠতে লাগলো। সময় বেশি নেই, আমরা খুবই অল্প সময়ে পৌছে যাবো। আমি শেষ মুহূর্তে হাতের অস্ত্রটা চেক করতে লাগলাম। এটাই নিয়ম, ইন্সট্রাক্টররা বলে শেষ মুহূর্তে তুমি যদি কিছু চেক করতে চাও তবে নিজের অস্ত্রটাই চেক করবে। এতে করে তুমি নিশ্চিন্তও থাকবে সেই সাথে তোমার মনোবলও বাড়বে।

ভালোভাবে বসে আমি হেলমেটটা খুলে কোলের উপরে রাখলাম।

ক্লিক করে দরজাটা লেগে যাবার সাথে সাথে অনুভব করলাম চপার উপরে উঠছে। চপার উপরে ওঠার অনুভূতির সঙ্গে অনুভব করলাম, পেটের ভেতরে একটা শূণ্য অনুভূতি। অনেকটা যেন অনিশ্চিত যাত্রার উদ্দেশ্যে উপরে উঠে রওনা দিলে যেমন লাগে তেমনটা। চপার প্রথমে খানিকটা ওপরে উঠে এলো, তারপর নাক ঘুরিয়ে সোজা রওনা দিল বর্ডারের দিকে।

কেবিনের ভেতরটা অন্ধকার। শুধুমাত্র উপস্থিত কমান্ডোদের উপস্থিতির নীরব আভাস।

আমার পাশে বসা ওয়াল্টকে শুধু অনুভব করতে পারলাম একবার যখন একটু ঘুরে বসলো।

চুপচাপ অনেকক্ষন ধরে চলার পর পাইলটের ঘোষণা শোনা গেল,

"আমরা বর্ডার পার হচ্ছি।"

যাক, অবশেষে উদ্দিষ্ট গন্তেব্যের কাছে চলে এসেছি, মনে মনে ভাবলাম।

মাথার ভেতরে যেন ফুটন্ত জলের মতো বুদবুদ ফুঁটছে। অ্যাবোটাবাদ আর মাত্র অল্প দূরেই।

"আর দশ মিনিট," পাইলটের ঘোষণা।

আমি হেলমেটটা মাথায় পরে নিয়ে নাইটভিশন অন করে আরেকবার অস্ত্রসহ সবকিছু চেক করে নিলাম।

"ছয় মিনিট।"

নাইটভিশনের সাইট ফোকাস করতে করতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। কেবিনের ভেতরেটা নাইটভিশনের কারণে আলোকিত কিন্তু বাইরেরটা কালিগোলার মতোই আঁধার। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মনে হল বাইরের পৃথিবী যেন এক অন্ধকার গহ্বর। কেবিনের ভেতরে সবাই যার যার জিনিস ঠিকঠাক করে শেষবারের মতো চেক করে নিচ্ছে।

"এক মিনিট।"

পকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে অবস্থিত ওসামা বিন লাদেনের কম্পাউন্ড

ক্রু চিফ চপারের দরজাটা খুলে আমার হাতে রোপের সাথে আটকানো একটা বার ধরিয়ে দিল। এই বারটাকে বলে ফ্রাইস। মানে ফাস্ট রোপ ইনসারশান/ এক্সট্রাকশান সিস্টেম (এফ.আর.আই.ই.এস)। এটার সাহায্যে নিখুঁতভাবে নিচে নামা যায়। আমি বারটা একবার চেক করে নিয়ে ওটার পিনটা ঠিক পজিশানে আছে কিনা দেখে নিলাম। যদিও জানি চিফ ক্রু ওটাকে চেক করেই আমার হাতে দিয়েছে তবুও নিজে আরেকবার চেক করে নেয়াই নিয়ম।

খোলা দরজা দিয়ে বাইরের মৃদু হাওয়া লাগছে এখন মুখে।

আমি রোপটা ভালোভাবে ধরে নিচে তাকালাম। এখনো আমরা নিচের বাড়িঘর পার হয়ে চলেছি। বিভিন্ন ধরনের বাড়ি, কম্পাউন্ড আর পাহাড়ি এলাকার টিলা পার হচ্ছি। উপর থেকে দেখে অ্যাবোটাবাদ শহরটাকে আমার বেশ উন্নত আর আধুনিক বলেই মনে হলো। আমরা কম্পাউন্ডের উপরে চলে এসেছি।

আমি দরজা দিয়ে বাইরে মাথা বের করে নিচে স্থির হয়ে থাকা কম্পাউন্ডটা এক পলক দেখে নিলাম। জালালাবাদ থেকে রওনা দেবার প্রায় নব্বই মিনিট পর আমরা এখানে পৌছেছি। এখন প্রায় মাঝরাত। চারপাশে কোনো আলো নেই, এমনকি কোনো বাড়িঘরেও আলো জ্বলছে না। মাঝরাতের অ্যাবোটাবাদ শহর একদম নিঝুম আর অন্ধকার। নিচে তাকিয়ে মনে হচ্ছে যেন এখানে পারমানেন্ট ব্ল্যাকআউট চলছে।

আমি রোপটাকে নিচে ছুড়ে দেবার জন্যে অপেক্ষা করছি কিন্তু পাইলট চপারটাকে একদম স্থির করতে পারছে না। আমার মনে হলো যেনো পাইলট চপারটা নিয়ন্ত্রণে আনতে কুস্তি লড়ছে, কিন্তু এটার অস্থির অবস্থা দেখে মনে হলো পাইলট খুব একটা সুবিধা করতে পারছে না। আমি ক্রু চিফের দিকে তাকালাম, সেও অপেক্ষা করছে চপারটা স্থির হওয়ার জন্য, যাতে করে আমি রোপটাকে নিচে ছুড়ে দিতে পারি।

"গো গো গো," চিৎকারটা আমার মাথার ভেতর বিস্ফোরিত হলো। পাইলট চপার নিয়ন্ত্রণ করেত পারছে না, সেটা যে কারণেই হোক। আমাদের রিহার্সেলের সময়ে এমন কিছুই হয়নি। নিশ্চয়ই কোন গন্ডগোল হয়েছে।

"আমরা পড়ে যাচ্ছি," কে যেনো চিৎকার করে উঠলো।

"সর্বনাশ," শব্দটা আমার মুখ দিয়ে আনমনেই বের হয়ে এলো। এখনো আমরা কম্পাউন্ডেই নামি নি এরই মধ্যে গড়বড় শুরু হয়ে গেলো! হঠাৎ চপারটা প্রায় নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ডান দিকে স্লিপ করলো। রোলার কোস্টার রাইডে হঠাৎ করে যেমন পাকস্থলিটা লাফ মারে আমার অনুভূতিটাও হল প্রায় তার কাছাকাছি। মাথার উপরে রোটরের অওয়াজ বদলে গিয়ে মনে হচ্ছে যেন ওগুলো তারস্বরে চিৎকার করে ছিড়ে যেতে চাইছে। চপার প্রতিমুহূর্তে সাঁই সাঁই করে নিচের দিকে নামছে। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আমার মনে হলো যেনো নিচের মাটি আমাদেরকে গিলে খাবার জন্যে লাফিয়ে লাফিয়ে উপরে উঠে আসছে। আসলে আমরাই প্রচন্ড বেগে নিচের দিকে নেমে চলেছি।

আমি কিছু একটা ধরে কেবিনের ভেতরের দিকে যাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু নিষ্ফলের মতো আমার হাত শূন্যে খাবি খেল। খোলা দরজা দিয়ে বাইরেই পড়ে যেতাম যদি না ওয়াল্টের হাত বিদ্যুৎগতিতে আমার পেছনের গিয়ার ধরে আমাকে কেবিনের ভেতরের দিকে টেনে না নিতো। আমি কেবিনের ফ্লোরে পড়ে গেছি। ওয়াল্ট আর স্নাইপার মিলে চেষ্টা করছে আমাকেসহ বাকিদেরকে ভেতরের দিকে ঠেলে দিতে। কিন্তু চপারের টালমাটাল ঝাকুনির কারণে পারছে না। আর আমি শুয়ে পড়লেও আমার একটা পা খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আছে। ওটাতে আঘাত লাগার এমনকি পা'টা দু টুকরো হয়ে যাবার সমূহ

সম্ভবনা দেখতে পাচ্ছি। আমার শরীর রাগ আর জেদে রি রি করে উঠলো। আমরা এখানে প্রতিটা কমান্ডো অনেক পরিশ্রম করেছি অনেক আত্মত্যাগ করেছি এই মিশনের জন্যে। সর্বোপরি এই মিশনে সুযোগ পাওয়াটা আমাদের জন্যে ছিলো চরম সম্মানের এবং সৌভাগ্যের।

আর এখন আমরা এভাবে মরতে বসেছি কিছু না করেই, এমনকি মিশন শুরুও করতে পারি নি। এর চেয়ে রাগ আর অসহায়ত্বের আর কি আছে।

“শিট! শিট! শিট!” আমার মনের ক্ষোভ বিস্ফোরিত হয়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো।

অনুপ্রবেশ

পা দুটো ভাঁজ করে বুকের কাছে নিয়ে আসার চেষ্টা করতেই আমার শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেলো, গুলিয়ে উঠলো তলপেট। হেলিকপ্টারের দরজা দিয়ে দেখতে পেলাম নীচের জমিন তেড়ে আসছে আমাদের দিকে। হেলিকপ্টার প্লেনের মতো গ্লাইড করে ক্র্যাশ ল্যান্ডিং করে না। শূন্যে ভেসে থাকার সময় হেলিকপ্টারের এঞ্জিন যদি কাজ না করে তখন ভারি পাথরের মতোই সেটা সবেগে আছড়ে পড়ে মাটিতে। লম্বা লম্বা রোটর ভেঙে ছিটকে যায়, চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে এর টুকরো টাকরা। খোলা দরজার সামনে বসে থেকে আমি আশংকা করছিলাম কেবিনটা বোধহয় গড়িয়ে যাবে, ওটার নীচে চাপা পড়ে যাবো আমি।

টের পেলাম ওয়াল্ট আমার পিঠের ব্যাগটা টেনে ধরে রেখেছে, কেবিনের ভেতরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে আমাকে। আমি যতোই পা দুটো টেনে ভেতরে আনার চেষ্টা করি না কেন ওগুলো তখনও দরজার বাইরে রয়ে গেছে। আমার পাশে থাকা স্নাইপারের এক পা কেবিনের ভেতরে, অন্য পা'টা ও দরজার বাইরে।

ভূপাতিত হতে থাকা হেলিকপ্টারের যাত্রিদের কী রকম অনুভূতি হয় সেটা বর্ণনা করা খুবই কঠিন। মনে হয় না পুরো ঘটনাটা ঠিকঠাক মতো মনে আছে আমার। শুধু মনে আছে, যে করেই হোক লুনি টিউস কার্টুন চরিত্রের মতো দরজার কাছে সেঁটে থাকতে হবে। আপনারা তো জানেনই পাহাড়ের উপর থেকে কোনো বাড়ি নীচে পড়ে গেলে দরজা দিয়েই বাসিন্দারা বের হয়ে থাকে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো হেলিকপ্টারটা মাটিতে আছড়ে পড়লে, আমি দরজা দিয়ে লাফিয়ে নিচে নেমে যেতে পারবো নিরাপদভাবে।

আরেকটুর জন্যে কম্পাউন্ডের দেয়ালে আছড়ে পড়লো না আমাদের কপ্টারটি। তার বদলে মাটির দিকে এগিয়ে গেলো সেটা। হেলিকপ্টারটা যখন নব্বই ডিগ্রি ঘুরে গেলো তখন ওটার লেজ অল্পের জন্য দক্ষিণ দিকের দেয়ালের সাথে বাড়ি লাগলো না। নীচের মাটি আমার দিকে ধেয়ে আসার সময় যারপরনাই ভয় পেয়েছিলাম। তখন কিছুই করার ছিলো না। এটাই ছিলো সবথেকে বেশি ভয়ের। সব সময় মনে করতাম আমার মৃত্যু হলে সেটা যুদ্ধক্ষেত্রেই হবে, কোনো হেলিকপ্টার ক্র্যাশে নয়। এরকম পেশার ঝুঁকি সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি অবগত ছিলাম। যুদ্ধক্ষেত্রের হিসেবনিকেশ আমরা ভালোভাবেই করে নিতে পারতাম। নিজেদের দক্ষতার উপর আমাদের ছিলো অগাধ আস্থা। কিন্তু পড়ন্ত হেলিকপ্টারের দরজার সামনে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার সময় কোনো দক্ষতা, অভিজ্ঞতা কাজে লাগে নি। চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করার ছিলো না তখন।

মাটিতে আছড়ে পড়ার ঠিক আগ মুহূর্তে টের পেলাম হেলিকপ্টারের নাকটা বেঁকে নীচের দিকে চলে গেছে। দম বন্ধ করে অপেক্ষা করলাম ভূপাতিত হবার জন্য। তীরের মতোই কপ্টারটা যেনো মাটিতে গিয়ে বিধঁলো। এতো দ্রুত ক্র্যাশটা হলো যে আমি কিছুই টের পেলাম না।

রোটরটা ছিটকে গেলো না। তার বদলে খোলা প্রাঙ্গনের মাটি আর ধূলোবালি উড়িয়ে দিলো সেটা। ক্ষণিকের জন্যে সৃষ্টি করলো ধূলোর ঝড়। ধূলোবালি থেকে চোখ বাঁচিয়ে পিটপিট করে তাকালাম আমি। বুঝতে পারলাম আমরা এখনও মাটি থেকে ছয় ফিট উপরে আছি।

"বের হও," আমাকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে বললো ওয়াল্ট।

ছয় ফিট উপর থেকে লাফ দিতে কোনো সমস্যাই হলো না, যদিও ষাট পাউন্ডের সরঞ্জাম বইছি পিঠে। কোনো দিকে না তাকিয়ে সামনের দিকে ভো-দৌড় দিলাম আমি, একেবারে অলিম্পিকের স্প্রিন্টারদের মতো! ত্রিশ গজ দূরে গিয়ে মনে করলাম আমি নিরাপদ। ঘুরে পেছন ফিরে তাকিয়ে ধ্বংসস্তুপটা প্রথমবারের মতো দেখলাম।

হেলিকপ্টারটি ক্র্যাশ করার সময় ওটার লেজ বারো ফিট উঁচু দেয়ালের সাথে আটকে যায়। এর ফলে দেয়ালের সাথে নব্বই ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করে ব্ল্যাকহকের নাক গেঁথে যায়

মাটিতে। ভাগ্য ভালো, ওটার ঘূর্ণায়মান রোটর মাটি স্পর্শ করতে পারে নি। হেলিকপ্টারের অন্য কোনো অংশ যদি দেয়ালে গিয়ে লাগতো তাহলে রোটরটা অবশ্যই বিচ্ছিন্ন হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতো, এর অংশগুলো ছিটকে পড়তো আশেপাশে। আমাদের কারো পক্ষে

আর অক্ষত অবস্থায় বের হওয়া সম্ভব হতো না। টেডি আর তার কোপাইলট অসম্ভব রকম দক্ষতা দেখিয়ে সবাইকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

ছবি

দেখতে পেলাম আমার টিমমেটরা হেলিকপ্টারের দরজা থেকে একে একে বের হয়ে আসছে। আমার মতো তারাও যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলো। আমি এমন জায়গায় পড়েছি যে, বাকিদের সাথে যোগ দিতে হলে হেলিকপ্টারটারের নীচ দিয়ে যেতে হবে।

যাইহোক, মাত্র দু'মিনিট আগেও ভেবেছি আমরা কম্পাউন্ডের বাইরে ক্র্যাশ করবো, কিন্তু ভেতরে ক্রাশ করাতে এবং আমরা সবাই অক্ষত থাকার কারণে আমাদের পরিকল্পনায় কোনো ব্যঘাত ঘটলো না।

আমরা আমাদের কাজে লেগে পড়লাম দ্রুত।

ইতিমধ্যেই মেইন কম্পাউন্ডে যাবার যে গেটটা আছে সেটার দিকে ছুটে যাচ্ছে আমার টিমমেটরা। আমি উঠে দাঁড়ালাম সঙ্গে সঙ্গে। কাউকে কোনো রকম অভিযোগ অনুযোগ করতে শুনলাম না। যেনো দুর্ঘটনার বিষয়টি মুহূর্তে ভুলে গেছে সবাই। এর কারণ আমাদের হাতে সময় মাত্র ত্রিশ মিনিট। এই সময়ের মধ্যে মিশনটা শেষ করতে হবে। হেলিকপ্টারের জ্বালানীও এরচেয়ে বেশি সময় থাকবে না। তারচেয়ে বড় কথা, এরচেয়ে বেশি সময় লেগে গেলে পাকিস্তানি মিলিটারি এসে পড়তে পারে ঘটনাস্থলে। বাড়তি দশ মিনিট সময় অবশ্য পাওয়া যাবে, কেননা পরিকল্পনা করার সময় মাথায় রাখা হয়েছিলো নতুন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে—যেমন কপ্টারের দুর্ঘটনাটি। হেলিকপ্টারের দিকে দৌড়ে যেতে যেতে মনে হচ্ছিলো ঐ দশ মিনিট আসলেই প্রয়োজন পড়বে আমাদের।

ছবি

যেভাবে হেলিকপ্টারটি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, তাতে করে আমি সামনের রোটরটা ক্লিয়ার করার মতো জায়গাও পেলাম না। নাইটভিশন গগল্স থাকার পরও ঘন অন্ধকারে বুঝে উঠতে পারলাম না রোটরটা কতো উপরে ঘুরছে। কম্পাউন্ডে যাবার একটাই উপায়-অকেজো কপ্টারের নীচ দিয়ে যেতে হবে।

"আমি এক্সপ্লোসিভ সেট করছি," ট্রুপনেটের মাধ্যমে চার্লির কথাটা শুনতে পেলাম। ট্রুপনেট হলো আমাদের টিমের সবার সাথে মাইক্রোফোনের সাহায্যে যোগাযোগ করার সিস্টেম। মেইন কম্পাউন্ডের গেটের সামনে তাকে বিস্ফোরক সেট করতে দেখলাম আমি।

বিধ্বস্ত কপ্টারের নীচ দিয়ে চলে এলাম চার্লির কাছে। সে লোহার গেটটার লকের উপর চার্জ বসাচ্ছে। তার চারপাশে অস্ত্রধারী টিমমেটরা কড়া নজর রাখছে আশেপাশে।

গেটের কাছেই নামাজ পড়ার ঘরের দিকে চলে এলাম আমি, নিশ্চিত হলাম ওটা খালি আছে। ইন্টেলিজেন্স অ্যানালিস্টের কাছ থেকে আমরা জেনেছিলাম এই ঘরটাই অতিথিদের সাথে সাক্ষাত করার জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে সেটা কদাচিৎ ঘটে থাকে। ঘরটা ক্লিয়ার দেখে একটি আইআর কেমলাইট ছুড়ে মারলাম দরজার ভেতর দিয়ে যাতে করে বাকিরা বুঝতে পারে এই ঘরটা ক্লিয়ার।

যখন বাইরে এলাম দেখলাম চার্লি তার বিস্ফোরণের বৃত্ত কতোটুকু হতে পারে সেটা চেক করে দেখছে। এই বৃত্তের বাইরে সবাইকে সরে যেতে বলবে সে, যাতে কেউ আহত না হয়।

ডেটোনেটরটা চার্জ করেই, চার্লি মাটিতে গড়িয়ে একটু দূরে সরে গেলো।

আমরা সবাই হাত দিয়ে মাথা ঢেকে রাখলাম চোখ দুটো রক্ষা করার জন্য। কেউ ভয় পেলো না, নার্ভাসও হলো না। অবশেষে বহু প্রতীক্ষার পর আমরা এই টার্গেট কম্পাউন্ডের ভেতর পা রেখেছি। এখন কাজটা ভালোমতো শেষ করার সব কিছু আমাদের উপর নির্ভর করছে।

বিস্ফোরণটার প্রকোপে লোহার গেটের মধ্যে বিরাট একটি ফোকরের সৃষ্টি হলো। চার্লি দরজাটা লাথি মারতেই সেটা খুলে গেলে একে একে আমরা ভেতরে ঢুকে পড়লাম। কে কোথায় যাবে কি করবে সবই জানা আছে। কোনো কথা বলার দরকার পড়লো না। অপারেশনের শুরুতে একটু হোঁচট খেলেও আমাদের মূল পরিকল্পনা মতোই সব কিছু এগোতে লাগলো।

গেটটা ক্লিয়ার করার পর দ্বিতীয় ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টারটি আমার চোখে পড়লো। ওটার নাম চক-টু। কপ্টারটি যেভাবে শূন্যে ভাসছিলো তাতে করে আমি নিশ্চিত ছিলাম ওটা ইতিমধ্যেই কম্পাউন্ডের বাইরে সিকিউরিটি টিমকে নামিয়ে দিতে পেরেছে। ঠিক এরকমই দেখতে একটি মডেল কম্পাউন্ডে কিভাবে হেলিকপ্টার থেকে দড়ি বেয়ে নামতে হয় সেটা ডজনখানেকবার প্র্যাকটিস করেছি। পরিকল্পনা ছিলো প্রথম দলটিকে ভবনের ছাদের উপর ড্রপ করার পর পরই চক টু কম্পাউন্ডের ভেতরে দ্বিতীয় ড্রপিংটা সেরে ফেলবে। দুটো হেলিকপ্টারই পুরো অপারেশনের সময়টাতে ভেসে থাকার কথা কম্পাউন্ডের উপরে।

কিন্তু তার বদলে আমি ওটাকে দেয়ালের পেছনে উধাও হয়ে যেতে দেখলাম। ওটার পাইলট হয়তো আমাদের কপ্টারটি ক্র্যাশ করতে দেখেছে, তাই টিমটাকে কম্পাউন্ডের বাইরে ড্রপ করেছে সে।

“হেলিকপ্টারের খারাপ পজিশন আর ঝুঁকির কথা ভুলে গিয়ে ছেলেদেরেকে গ্রাউন্ডে নামিয়ে দিয়ো,” ফাইনাল ব্রীফিংয়ের সময় অ্যাডমিরাল ম্যাকর্যাভেন বলেছিলেন আমাদেরকে। “গ্রাউন্ডের কোথায় তাদেরকে নিরাপদে নামাতে হবে সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। বাকিটুকু ওরা নিজেরাই দেখবে।”

আমার মনে হয় চক-টু আমাদের অবস্থা দেখার পর ভবনের ছাদের উপর ফাস্ট-রোপিং ড্রপ করার ঝুঁকিটা আর নেয় নি। সিদ্ধান্তটি ঠিকই ছিলো।

ট্রুপনেটের মাধ্যমে প্রথম কিছু রেডিও কল শুনতে পেলাম আমি। সমস্যা দেখা দিলে বিকল্প আরেকটি পরিকল্পনা ছিলো। চক-টু যদি ভবনের ছাদে ড্রপ করতে না পারে, তারা চলে যাবে কম্পাউন্ডের দক্ষিণ দিকে যে গেটটা আছে সেখানে।

গেস্ট হাউস সি-ওয়ানের দিকে এগিয়ে যাবার সময় উইল ছিলো আমার সঙ্গে। ঐ মুহূর্তে আমাদের বুটের শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ হচ্ছিলো না। আমরা জানতাম বিন লাদেনের সবচাইতে বিশ্বস্ত কুরিয়ার আহমেদ আল-কুয়েতি তার পরিবার নিয়ে গেস্ট হাউসে বাস করে।

নিদেনপক্ষে একজন স্ত্রী আর কিছু বাচ্চা-কাচ্চা আশা করছিলাম। যেহেতু এই ভবনে সন্তান-সন্ততি নিয়ে বাস করে তাই এখানে কোনো বুবি ট্র্যাপ নেই বলেই আমার বিশ্বাস।

ছবি

কম্পাউন্ডের মডেল আর ছবি থেকে জানি উপর তলায় বেশ কিছু লোহার দরজা আর জানালা রয়েছে। জানালার ডান দিকের দরজাটার রয়েছে বেশ কিছু কাঁচের বার। ওটার ভেতর দিয়ে আমি ঘরে কোনো আলো জ্বলতে দেখলাম না। সবগুলো জানালা কাপড়ের পর্দা দিয়ে ঢাকা, ফলে ভেতরটা ভালো করে দেখার উপায় নেই।

উইল দরজার বাম দিকে পজিশন নিয়ে নিলে আমি হাতলের উপর হাত রাখলাম। ‘এল’ আকৃতির হাতলটা দুবার টেনে বুঝতে পারলাম ওটা লক করা।

উইল তার পিঠের ব্যাগ থেকে হাতুড়ি আর এক্সটেনডেবল হাতল বের করলো। আমি তার ডান দিকটা কভার করলাম এ সময়।

প্রচণ্ড জোরে দরজার হাতলে আঘাত হানলো উইল কিন্তু হাতলটা দুমড়ে গেলেও ভাঙলো না। এখানকার দরজাগুলো সলিড লোহার, হাতুড়ি দিয়ে কাজ হবে না। জানালার কাছে গিয়ে কাঁচ ভাঙার চেষ্টা করলো সে, যাতে করে পদার্টা সরিয়ে ভেতরটা দেখতে পাই।

"আমি এক্সপ্লোসিভ ব্যবহার করবো," চাপা কণ্ঠে বললো উইল। "সময় নষ্ট করার দরকার নেই।" কথাটা বলেই আমার পিঠে থাকা কিটবক্স থেকে চার্জ বের করে নিলো সে।

আমরা দু'জনেই জানি সময় কতো মূল্যবান। শত্রুপক্ষকে চমকে দেবার সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে গেছে হেলিকপ্টার ক্র্যাশ করার সঙ্গে সঙ্গে। কম্পাউন্ডের অন্য প্রান্তে চক-টু টিম উত্তর দিকের গেটটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভেঙে ফেললো। রেডিওতে শোনা গেলো 'ফেইলড ব্রিচ।' "আমরা এ মুহূর্তে ডেল্টা কম্পাউন্ড গেটের দিকে এগোচ্ছি।" গেটটা উড়িয়ে দেবার পর তারা দেখতে পায় ইটের তৈরি দেয়াল দিয়ে ওটা সিল করা। এ সময়ের মধ্যে ওদের টিমটা থার্ড ফ্লোরে বিস্ফোরণে অ্যাসল্ট করার কথা। কিন্তু তারা তখন পর্যন্ত ঢোকার চেষ্টা করে যাচ্ছিলো।

"রজার, আমি ওখানে এসে ভেতর থেকে লক খুলে দিচ্ছি,"। জবাব দিলো মাইক।
Banmael

দক্ষিণ দিকের ড্রাইভওয়ের কাছে যে গেটটা আছে সেটাই ডেল্টা গেট। হেলিকপ্টারটা যেখানে ক্র্যাশ হয়েছে সেই জায়গাটাকে বাকি কম্পাউন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে এই গেটটা। মাইক ছিলো দক্ষিণ দিকের ড্রাইভওয়েতে, গেস্টহাউসের খুব কাছেই।

মিশনটা খুব দ্রুত এগোতে শুরু করলো এবার। সম্ভবত গ্রাউন্ডে নামার পর পাঁচ মিনিটের মতো সময় চলে গেছে। এ মুহূর্তে পঁচিশজন সেনা ঢুকে পড়েছে কম্পাউন্ডের ভেতর। কমপক্ষে দুটো বোমা বিস্ফোরণ আর হেলিকপ্টার ক্র্যাশের প্রচণ্ড আওয়াজ শত্রুপক্ষ শুনে ফেলেছে। কোনো সন্দেহ নেই কম্পাউন্ডের বাসিন্দারা এরইমধ্যে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যে প্রস্তত হয়ে গেছে।

হাটু মুড়ে দরজার ডান দিকে নব আর হাতলের পাশে চার্জটা বসিয়ে দিলাম অ্যাডহেসিভ টেপের সাহায্যে। এ কাজটা আমি সব সময় হাটু মুড়ে বসে করি তার কারণ ইরাকে থাকার সময় বহুবার যোদ্ধাদের গুলিবৃষ্টির মুখে পড়েছিলাম। দরজার ওপাশে কেউ আছে টের পেলেই তারা এটা করতো। দরজার মাঝখানটা লক্ষ্য করেই গুলি চালাতো তারা।

আমার টিমের তৃতীয় সদস্য কম্পাউন্ডের ভেতরে ঢুকলো এ সময়। হেলিকপ্টার থেকে সবার শেষে বের হয়েছে সে তাই এখানে আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে। দরজা বরাবর গেস্টহাউসেরর ছাদে যাবার যে সিঁড়িটা আছে সেটা ক্লিয়ার করার দায়িত্ব ছিলো তার। ও যখন সেদিকে এগিয়ে গেল, দরজার ওপরের কাঁচ ভেঙে ছুটে আসতে লাগলো একে৪৭ অটোমেটিক রাইফেলের গুলি, অল্পের জন্য রক্ষা পেল সে। আমি সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে সরে এলাম, মাথার কয়েক ইঞ্চি ওপরে আঘাত হানল বুলেটের ঝাঁক। বিচূর্ণ কাঁচের আঘাত টের পেলাম কাঁধে।

"গুলিটা সাপ্রেস্ড অস্ত্র থেকে করা হচ্ছে না," ভাবলাম আমি,

আমরা সবাই যেহেতু সাপ্রেসর ব্যবহার করি তাই খুব সহজেই বোঝা গেলো গুলিটা কে করছে। সাপ্রেসর বিহীন গুলি মানেই শত্রুপক্ষের কাজ। ভেতরে কারো কাছে অ্যাসল্ট রাইফেল আছে। বুক বরাবর তাক করে গুলি করে যাচ্ছে সমানে। খাঁচায় বন্দী পশু সে। পালানোর কোনো জায়গা নেই। ভালো করেই জানে আমরা আসছি।

দরজার বাম দিকে কভার নিয়ে পাল্টা গুলি ছুড়তে শুরু করলো উইল। আমিও ঘুরে গুলি করতে গেলাম কিন্তু টের পেলাম কাঁধে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। সম্ভবত কাঁচের টুকরোর আঘাত। আমাদের পাল্টা গুলিবর্ষণের ফলে লোহার দরজাটা এফোড় ওফোড় হয়ে গেলো।

দরজার ফুটোগুলো থেকে নিজেকে সরিয়ে ফেললাম, চলে এলাম জানালার কাছে।

“আহমেদ আল-কুয়েতি,” উইল বললো। “আহমেদ আল-কুয়েতি, বাইরে বেরিয়ে আসো!"

রাইফেলের ব্যারেল দিয়ে জানালার কাঁচ ভেঙে ঘরের ভেতরে ফায়ার করলাম আমি। উইল তখনও চিৎকার করে সারেন্ডার করতে বলছিলো কুয়েতিকে, কিন্তু কোনো সাড়া পাচ্ছিলো না। সময়ক্ষেপন না করে আমি ফিরে গেলাম দরজায় লাগানো এক্সপ্লোসিভ চার্জারের দিকে। দরজাটাটা উড়িয়ে দিলেই কেবল ভেতরে ঢুকতে পারবো, এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আরো বেশি নীচু হয়ে কাছে গেলাম।

দরজাটা উড়িয়ে দিয়েই ভেতরে একটা গ্রেনেড ছুড়ে মারা কথা ভাবলাম। আহমেদ আল-কুয়েতি লড়াই না চালিয়ে থামবে না। মৃত্যুর আগপর্যন্ত সে এটা করে যাবে বলেই মনে হয়। সেজন্যে আমি কোনো ঝুঁকি নিতে চাইলাম না।

দরজায় লাগানো বিস্ফোরককে ডেটোনেটর লাগাতেই ভেতর থেকে দরজা খোলার চেষ্টা করা হলো। উইল আর আমি দু'জনেই সেটা শুনতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে দরজা থেকে সরে দাঁড়ালাম আমরা। আমাদের কোনো ধারণাই নেই কে বের হতে যাচ্ছে, অথবা আমরা কি দেখতে পাবো। সে কি দরজা খুলে গ্রেনেড ছুড়ে মারবে আমাদের দিকে, নাকি একে৪৭ দিয়ে গুলি করবে?

আমি দ্রুত চারপাশে তাকালাম। আমার কোনো কভার নেই। খোলা প্রাঙ্গণে আবর্জনা আর বাগানের সরঞ্জাম পড়ে আছে। আমাদের একমাত্র অপশন হলো যতোটা সম্ভব দরজা জানালা থেকে পিছু হটে যাওয়া।

দরজাটা আস্তে করে খুলে গেলে একটা নারী কণ্ঠ শুনতে পেলাম। এর মানে এই নয় যে আমরা নিরাপদ। এই মহিলা যদি, নিজের বুকে আত্মঘাতি বোমা বেধে বিস্ফোরণ ঘটায় তাহলে আমরা দুই জনই মারা যাবো। এটা বিন লাদেনের কম্পাউন্ড। এরা তার অন্ধভক্ত, একেবারে বিশ্বস্ত আর অনুগত লোকজন। আমরা যে তাদের ডেরায় ঢুকে পড়েছি, গুলি-বোমা, চালাচ্ছি সেটা সবাই জেনে গেছে। পেলাম। লাদেনকে রক্ষা করতে জীবন দিতেও প্রস্তত তারা।

আমার কপাল বেয়ে ঘাম গড়াতে শুরু করলো। নাইটভিশন গগল্‌সে দেখতে পেলাম একটি নারী অবয়ব বের হয়ে আসছে। তার হাতে কিছু একটা ধরা। এটা দেখে আমার আঙুল রাইফেলের ট্রিগার চেপে ধরলো। আমাদের লেজাররশ্মির ছোট্ট দুটো বিন্দু মহিলার মাথার উপর নেচে বেড়াচ্ছে। সে যদি বোমা বহন করে থাকে তাহলে মুহূর্তে তার জীবনাবসান হবে।

দরজার বাইরে আসতেই বুঝতে পারলাম তার কোলে একটি শিশু। আল-কুয়েতির স্ত্রী মরিয়ম তার শিশু সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে বের হয়ে এলো। তার পেছন পেছন আরো তিনটি ভীতসন্ত্রস্ত বাচ্চা।

“এখানে আসো তোমরা,” আরবিতে বললো উইল।

তারা সামনের দিকে এগিয়ে আসার সময় আমি আমার রাইফেলের নল তাক করে রাখলাম।

“ও মারা গেছে,” আরবি ভাষায় উইলকে বললো মরিয়ম। “আপনারা ওকে গুলি করেছেন। ও মরে গেছে। আপনারা ওকে খুন করেছেন।”

মহিলার গালে আলতো করে থাপ্পড় মেরে তাকে চুপ করালো উইল। “এই মহিলা বলছে সে নাকি মারা গেছে,” বললো আমাকে।

আমি হামাগুড়ি দিয়ে দরজার ডান দিকে চলে এলাম, খোলা দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম ভেতরটা। দেখতে পেলাম শোবার ঘরের দরজার সামনে একজোড়া পা পড়ে আছে। লোকটা মারা গেছে নাকি বেঁচে আছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হবার কোনো উপায় নেই। ঠিক করলাম, কোনো সুযোগ নেবো না। উইল আমার কাঁধে হাত রাখলো, বোঝাতে চাইলো সে প্রস্তত। আমরা দু'জন একসঙ্গে হলওয়ে'তে প্রবেশ করলাম। পড়ে থাকা লোকটার উপর কয়েক রাউন্ড খরচ করে নিশ্চিত হলাম সে মরে গেছে।

বাড়ির ভেতরে তেল পোড়ার গন্ধ পেলাম। কুয়েতির লাশটা টপকে এগিয়ে যেতেই দেখতে পেলাম শোবারঘরের দরজার সামনে একটা পিস্তল আর একে৪৭ রাইফেল পড়ে আছে। সেগুলো লাথি মেরে সরিয়ে দিয়ে ঘরটা ক্লিয়ার করতে শুরু করলাম। ঘরের মাঝখানে একটি ডাবল বেড আর দেয়ালের সাথে লাগোয়া বাচ্চাদের ছোটো ছোটো খাট। পুরো পরিবারটি এই একটা ঘরেই ঘুমাতো।

ঘরের অন্যদিকে একটি রান্নাঘর দেখা গেলো। আমাদের পাল্টা গুলিতে ঘরটা তছনছ হয়ে গেছে। জলের বোতল উল্টে পড়ে আছে এখানে সেখানে। কেরোসিনের চুলাটা ফুটো হয়ে তেল গড়িয়ে পড়ছে মেঝেতে। তাকে রাখা খাবার আর বিভিন্ন ধরণের মাল মসলাও পড়ে আছে।

আমাদের বুটের নিচে রক্ত। ঘরের মেঝেটা পিচ্ছিল হয়ে আছে জল আর কুয়েতির রক্তে। ঘর দুটো ক্লিয়ার করে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমরা।

“সি-ওয়ানে ফায়ার করা হয়েছে। সিকিউর করা হয়েছে পুরো ভবনটি,” ট্রুপনেটের মাধ্যমে বললাম আমি। একটা কেমলাইটন গেস্টহাউসের সামনের দরজায় রেখে মেইন বিল্ডিংয়ের দিকে ছুটে গেলাম বাকিদের সাথে যোগ দিতে। "

খালিদ

ক্র্যাশ করার পর দশ মিনিটও অতিক্রান্ত হয় নি। উইল আর আমি গেস্টহাউস আর মেইন কম্পাউন্ডের মাঝখানে যে, খোলা দরজাটা আছে, সেটা দিয়ে দৌড়ে চলে গেলাম। আমাদের গন্তব্য এ-ওয়ানের উত্তর দিককার দরজাটি।

"উত্তর দিকের এ-ওয়ানের দরজায় এক্সপ্লোসিভ সেট করা হয়েছে," ট্রুপনেটের মাধ্যমে বলে উঠলো চার্লি।

চার্জ সেট করে দরজাটা উড়িয়ে দেবার জন্য নির্দেশের অপেক্ষা করছে সে। টম রেডিও'তে সেই নির্দেশ দিলেই তারা ডেটোনেট করবে।

এ পর্যন্ত জেন আর তার অ্যানালিস্টের কথা একদম সত্যি বলেই প্রমাণিত হয়েছে। তাদের সন্দেহ ছিলো বাড়িটা ডুপ্লেক্স। বিন লাদেনের পরিবার সেকেন্ড আর থার্ড ফ্লোরে বসবাস করে। তাদের ফ্লোরে যাবার জন্য আলাদা প্রবেশ পথও রয়েছে। পেসার সব সময়ই উত্তর দিককার দরজা দিয়ে বের হতো, তবে আল-কুয়েতি ভায়েরা ব্যবহার করতো দক্ষিণ দিকের দরজাটা।

উত্তর আর দক্ষিণ দিকের দরজার মধ্য দিয়ে হলওয়েটা চলে গেছে কিনা নিশ্চত হতে পারলাম না। একই সঙ্গে দুটো এক্সপ্লোসিভ ব্যবহার করতে চাই নি আমরা। এজন্যে টম আর তার টিম পরিকল্পনা করেছিলো প্রথমে তারা দক্ষিণ দিকটা ক্লিয়ার করবে, তারপর চার্লিকে নির্দেশ দেবে তার দিকটা ক্লিয়ার করার জন্য।

টমের তিন সদস্য বিশিষ্ট টিম ফার্স্ট ফ্লোরের ভেতরে ঢুকে ক্লিয়ার করার কাজ করছে। ভবনের ভেতরটা বেশ অন্ধকার। কিন্তু নাইটভিশন গগল্স পরে থাকার কারণে তারা হলওয়ে আর সুদীর্ঘ হলটায় যাবার জন্যে, যে চারটা দরজা আছে সবগুলোই স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলো। টমের টিম বাড়ির ভেতরে কয়েক পা এগোতেই তাদের পয়েন্ট ম্যান বাঁ দিকের প্রথম ঘর থেকে একজনকে উঁকি দিতে দেখে। গেস্টহাউস থেকে একে৪৭-এর ফায়ারিংও তারা শুনতে পায়। কোনো রকম সুযোগ দেবার পক্ষপাতি তারা ছিলো না। এ-ওয়ানের ভেতরে যে-ই থেকে থাকুক লড়াই করার জন্য যথেষ্ট সময় পেয়েগেছিলো।

পয়েন্ট ম্যান একটা গুলি করে। পরবর্তীতে দেখা গিয়েছিলো ঐ একটা গুলিই লেগেছিলো আবরার আল-কুয়েতির দেহে। সে অন্য একটা ঘরে ঢুকে পড়ে। ধীরে ধীরে পুরো টিম হলের ভেতর এগিয়ে গেলে একটা দরজার সামনে এসে থামে। আবরার আল-কুয়েতি আহত হয়েছে, মেঝেতে পড়ে কাতরাচ্ছে সে। তাকে গুলি করতেই তার স্ত্রী বুশরা এসে দাঁড়ায় গুলির সামনে। তারা দু'জনেই নিহত হয় ঐ টিমের হাতে।

টিমের সবাই দেখতে পায় আরেকজন মহিলা আর কিছু বাচ্চা-কাচ্চা ঘরের এককোণে জড়োসড়ো হয়ে কাঁদছে। ঘরে একটা একে৪৭ ছিলো। রাইফেলটা হাতে নিয়ে গুলিগুলো বের করে ফেলে টম, আর তার টিম বাকি ঘরগুলো তল্লাশী করতে চলে যায়।

হলের শেষ মাথায়, উত্তর দিকের দরজার ঠিক বিপরীতে তালা মারা একটি দরজা ছিলো। এ ওয়ানের দক্ষিণ দিকটা সিকিউর হয়ে যাওয়াতে টমের টিম দ্রুত বেরিয়ে যায় সেটা দিয়ে।

সাধারণত আমরা মহিলা আর বাচ্চাদেরকে বেডরুমে একজনের কাছে রেখে দিয়ে চলে আসতাম কিন্তু আমাদের হাতে সময় যেমন ছিলো না তেমনি এ কাজের জন্য লোকবলও ছিলো অপ্রতুল। ঐ ঘরের মহিলা আর বাচ্চাদেরকে একা রেখেই চলে আসি আমরা।

এই যে চার্লি, চার্জ করো," ট্রুপনেটের মাধ্যমে টম বললো।

দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়ে বাইরে বের হয়ে আসতেই, আবরার আল-কুয়েতির একে৪৭ রাইফেলটা, একজন সিল প্রাঙ্গনে ছুড়ে ফেলে দিলো। ঘন অন্ধকার থাকায় কারো পক্ষে এটা বাইরে এসে খুঁজে পাওয়াটা সম্ভব হবে না।

টমের নির্দেশ পাবার কয়েক সেকেন্ড পরই শুনতে পেলাম চার্লি তার বোমাটা বিস্ফোরণ ঘটালো। আমি আর উইল ভবনের পশ্চিম দিকে চলে গেলাম। ওখানে উত্তর দিকের খোলা

দরজার সামনে বাকিরা দাঁড়িয়ে ছিলো।

চক-টু'তে থাকা সিল সদস্যরা এরইমধ্যে কম্পাউন্ডে নেমে পড়েছে। তারাই দাঁড়িয়ে আছে উত্তর দিকের দরজার সামনে। এই দরজাটা বোমা মেরে খুলে ফেলেছিলো মাইক।

চার্লি তখনই ভেতরে ঢুকে পড়েছে, বাকিরা অপেক্ষা করছি ঢোকার জন্য। আমি আমার নাইটভিশন গগল্‌সে দেখতে পেলাম অনেকগুলো লেজার রশ্মি জানালা আর বেলকনির দিকে তাক করা। ওখান দিয়ে কেউ গুলি করার চেষ্টা করলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে ঘায়েল করে ফেলা হবে। আমি অবশ্য কোনো নড়াচড়া দেখতে পেলাম না। জানালাগুলোতে এমনভাবে কোটিং দেয়া আছে যে ভেতরে কি আছে না আছে সেটা দেখা অসম্ভব।

এতোক্ষণ আমাদের মধ্যে যে তাড়াহুড়ার ভাব ছিলো, সেটা উধাও হয়ে গেলো এখন। দশ মিনিট আগে হেলিকপ্টারটা ক্র্যাশ হবার পর থেকে সবকিছু ঠিকঠাক মতোই চলছে। আমরা সবাই উপর তলায় যেতে চাইলেও চার্লি রেডিও'তে জানালো তৃতীয় তলায় যাবার পথে বাড়তি আরেকটা লোহার দরজা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের জন্য। চার্লি সেই দরজাটা ভেঙে ফেলার জন্য তৃতীয়বারের মতো বিস্ফোরণ ঘটাতে ব্যস্ত।

আমাদের কেবল একটু অপেক্ষা করতে হবে আর নিজেদের নিরাপত্তার দিকে রাখতে হবে সতর্ক দৃষ্টি। আমি জানতাম চার্লি আর তার সঙ্গীরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে দ্রুত কাজ করার জন্য। ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি ভাবতে লাগলাম পুরো ব্যাপারটাই যেনো পরাবাস্তব। মনে হচ্ছিলো আমি যেনো গ্রীন টিমের সিকিউবি ট্রেনিং করছি।

কিছু মোরগ-মুরগির আর্তনাদ শুনে আমি সম্বিত ফিরে পেলাম। উত্তর দিকের দরজায় যেতে হলো কাঠের নক্সা করা একটি ছোটো এরিয়া আর পোষা মুরগির খাঁচা পেরিয়ে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। টো এরিয়া।

আমার ঠিক সামনে কয়েকজন কথা বলছে -

"আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না আমরা ক্র্যাশ করেছিলাম" বলল ওয়াল্ট।

"ক্র্যাশ করেছো মানে, এসব কী বলছো?"

"হ্যা, আমাদের হেলিকপ্টারটা ক্র্যাশ করেছে," ওয়াল্ট জানালো।

আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলো মিশন কমান্ডার জে, সে ছিলো চক টু'তে।

যখন শুনতে পেলো ওয়াল্ট ক্র্যাশ নিয়ে কথা বলছে তখন সে নড়েচড়ে উঠলো।

"কি বলছো?"

"হ্যা, আমরা ক্র্যাশ করেছি," যেখানটায় ক্র্যাশ হয়েছিলো সেদিকে ইশারা করে দেখালো ওয়াল্ট। "আপনি চাইলে ওখানে গিয়ে দেখতে পারেন।"

নাইটভিশন গগল্‌সেও দেখতে পেলাম কথাটা শোনার পর জে'র মুখের অভিব্যক্তি হাস্যকর রকমের হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ক্র্যাশ সাইটটা দেখার জন্য দৌড়ে চলে গেলো সে। আমার ধারণা চক-টু'র কেউ জানতো না আমরা ক্র্যাশ করেছি। এই খবরটা ট্রুপনেটের মাধ্যমে জানানো হয় নি তখনও। চক-টু'র পাইলট যখন দেখতে পায় চক-ওয়ান নীচে পড়ে যাচ্ছে তখন সে আর ছাদের উপর দড়ি দিয়ে নামানোর ঝুঁকিটা নেয় নি, তার বদলে চক-টু'কে দেয়ালের বাইরে ল্যান্ড করায়।

এদিকে হেলিকপ্টারের পাইলট টেডি আর তার ক্রুরা এঞ্জিন বন্ধ করে সব ধরণের ইন্সট্রুমেন্ট ধ্বংস করে ফেলেছিলো। কয়েক মুহূর্তের জন্য সে ভেবেছিলো টেকঅফ করার চেষ্টা করে দেখবে কিনা। দৃশ্যত হেলিকপ্টারের বড়সড় কোনো ক্ষতি হয় নি। তার ধারণা ছিলো, খালি হেলিকপ্টারটির ওজন যেহতু অনেক কমে গেছে তাই হয়তো আবার ওড়ানো সম্ভব হবে ওটা। শেষ পর্যন্ত সেটা আর করা হয় নি।

ক্র্যাশ সাইটে গিয়ে জে দেখতে পেলো কি ঘটেছে। তার সঙ্গে থাকা স্যাটেলাইট রেডিওতে খবরটা জানিয়ে কিউআরএফ ডেকে পাঠায়।

কিউআরএফ সময়ক্ষেপণ না করে দ্রুত রওনা দেয় কম্পাউন্ডের দিকে। সময় বাঁচানোর জন্য তারা পাকিস্তানি মিলিটারি অ্যাকাডেমির উপর দিয়েই ফ্লাই করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু

কয়েক মিনিট পর জে আবারও কল করে। আমরা ক্র্যাশ করলেও হতাহত হয় নি কেউ। চক-ওয়ানে থাকা সব অ্যাসল্টারই যথারীতি অপারেশন চালিয়ে যাচ্ছে।

"পজিশন হোল্ড করুন," রেডিও'তে কিউআরএফ'কে বললো সে।

এ-ওয়ানের ভেতরে চার্লি তার বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর দ্বারপ্রান্তে তখন। শেষবারের মতো চেক করে দেখছে 'ব্যাক ব্লাস্ট'টা কি রকম হতে পারে। যেহেতু বোমাটা ভবনের ভেতরে আবদ্ধ জায়গায় হবে তাই ওটার চাপ অনেক বেশি থাকবে। প্রচণ্ড চাপের ফলে দরজা জানালা সব উড়ে যাবে। চার্লির খুব কাছেই ছিলো আরো দু'জন সিল। তাদের কোনো কভার ছিলো না। একজন সিল কভার নিয়েছিলো পাশের একটি ঘরের দরজার আড়ালে।

"বন্ধু, দরজাটা থেকে দূরে থাকো," বললো চালি।

চার্লি বিস্ফোরণ ঘটানোর আগেই সে দরজা থেকে সরে যায়। মুরগির খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে আমি বিস্ফোরণের শব্দটা শুনতে পেলাম। একটু আগে সিল সদস্যটি যে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়েছিলো সেটা ছিটকে গিয়ে বিপরীত দিকের দেয়ালে আছড়ে পড়ে। এই দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে যায় ঐ সিল। ওখান থেকে সরে না দাঁড়ালে মারাত্মক আহত হতো।

"ধন্যবাদ তোমাকে," চার্লিকে বলেছিলো সে।

দোমড়ানো মোচড়ানো দরজাটা দিয়ে আমরা উপরের দিকে উঠতে শুরু করলাম। দলের বেশিরভাগ সদস্য আমার আগে আগে ছিলো।

টাইল্সের সিঁড়িটা দিয়ে ওঠার সময় বুঝতে পারছিলাম না কোন জিনিস অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। ওটা ছিলো অনেকটা পেচানো সিঁড়ির মতোই। এতোক্ষণে বিন লাদেন অথবা এখানে যে-ই থেকে থাকুক, অস্ত্র হাতে নেবার মতো যথষ্ট সময় পেয়ে গেছে। যেহেতু ঐ একটা পেচানো সিঁড়ি দিয়েই উপরে ওঠার ব্যবস্থা রয়েছে তাই খুব সহজেই আমরা আটকা পড়ে যাবো।

জায়গাটা ঘন অন্ধকারে ঢেকে আছে। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি শব্দ না করার। প্রতিটি পদক্ষেপই ছিলো খুবই সতর্ক।

কথাবার্তা নেই।

চিৎকার চেঁচামেচি নেই।

তাড়াহুড়াও নেই।

এর আগে এরকম অভিযানের সময় আমরা ঝটিকা হামলা চালাতাম, ফ্ল্যাশ গ্রেনেড ছুড়ে মারতাম ক্লিয়ার করার জন্য। কিন্তু এখন আমরা যতোটুকু সম্ভব নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছি। নাইটভিশন গগল্সের বাড়তি সুবিধাটুকু রয়েছে আমাদের। তবে দ্রুত কোনো ঘরের দিকে ছুটে গেলে দৃষ্টিসীমায় সমস্যা দেখা দিতে পারে। মৃত্যুর দিকে দৌড়ে যাওয়ার কোনো দরকার ছিলো না আমাদের।

আমি যখন সেকেন্ড ডেক-এ পা রাখলাম ততোক্ষণে বাকি অ্যাসল্টাররা ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন দিকে। সেকেন্ড ফ্লোরের সামনের দিকে লম্বা হলওয়ে, সেটা চলে গেছে ভবনের দক্ষিণ দিকে। ফ্লোরটায় চারটি দরজা, দুটো ল্যান্ডিংয়ের খুব কাছে ডান দিকে, আর বাকি দুটো একটু দূরে। দেখতে পেলাম আমার টিমমেটরা হল দিয়ে সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে, দরজাগুলোর সামনে গিয়ে ভেতরটা ক্লিয়ার করছে।

একজন অ্যাসল্টার সেকেন্ড আর থার্ড ফ্লোরের মাঝখানে যে সিঁড়ির ল্যান্ডিংটা আছে সেখানে রয়ে গেছে। তার দায়িত্ব ওটা পাহারা দেয়া। ল্যান্ডিংয়ের উপর একটা লাশ পড়ে আছে। রক্তে ভেসে গেছে মার্বেলের মেঝেটা।

ওখানে পাহারা দিতে যাবার সময় অ্যাসল্টার দেখতে পেয়েছিলো কেউ একজন ল্যান্ডিং থেকে উঁকি দিচ্ছে। ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট বলেছিলো ঐ কম্পাউন্ডে তিন থেকে চারজন লোক বসবাস করে। বিন লাদেন থার্ড ফ্লোরে থাকলেও তার এক ছেলে খালিদ থাকতো সেকেন্ড ফ্লোরে।

“খালিদ,” অ্যাসল্টার ফিসফিসিয়ে বলে ওঠে। “খালিদ!”

এই কম্পাউন্ডের সবাই হেলিকপ্টারের এঞ্জিনের শব্দ, গেস্টহাউসে গোলাগুলি আর বোমার বিস্ফোরণ শুনেছে।

তবে ততোক্ষণে সব কিছু আবার আগের মতোই সুনশান হয়ে গেছিলো। এ সময় তারা যদি কিছু শুনে থাকে তাহলে সেটা আমাদের পায়ের শব্দ ছাড়া আর কিছু না।

তো ল্যান্ডিংয়ের ঐ লোকটা তখনই শুনতে পায় কেউ তার নাম ধরে ডাকছে।

তারা আমার নাম জানে?

আমি কল্পনা করতে পারি, সে তখন খুবই অবাক হয়ে সেটা ভাবছিলো। কৌতুহল চেপে না রাখতে পেরে সে আবার উঁকি দিয়ে দেখতে গিয়েছিলো, তার নাম ধরে কে ডাকছে।

অ্যাসল্টার তার মুখে গুলি করে বসে। তার নিথর দেহটা সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে ল্যান্ডিংয়ের উপর পড়ে থাকে। ভেবেছিলো।

পেছনে ফিরে দেখতে পেলাম সিঁড়ি দিয়ে আরো কয়েকজন সিল এসে দাঁড়ালো আমার ঠিক পেছনে। সেকেন্ড ফ্লোরের হলওয়েটা অ্যাসল্টারে ভরে গেছে।

এখন একমাত্র যাওয়ার জায়গা হলো উপর তলা।

পয়েন্ট ম্যানের পেছনে দাঁড়িয়ে আমি তার কাঁধে আলতো করে চাপ দিলাম। বোঝাতে চাইলাম আমরা সবাই প্রস্তুত।

“এগোও।”

থার্ড ডেক

খালিদ উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

আমরা ওর শরীর পার হয়ে সিঁড়ির ধাপে পা রাখলাম। সিঁড়ির প্রতিটা ধাপ রক্তে পিচ্ছিল। একটু সামনেই আমি পড়ে থাকতে দেখলাম খালিদের একে৪৭-টা।

"ভাগ্যিস খালিদ ওটা ব্যবহার করার সুযাগ পায় নি," মনে মনে বললাম।

যদি সে জিনিসটা ব্যবহার করতে চাইতো তবে সিঁড়ির ধাপে হাটু গেড়ে বসে বেশ ভালোভাবেই ব্যবহার করতে পারতো, সেক্ষেত্রে আমরা খুব সহজে কিছু করতে পারতাম না। নিশ্চিত আমাদের মধ্যে অন্তত কয়েকজন আহত হতো।

পরে আমরা যখন খালিদের একে৪৭ চেক করেছিলাম তাতে দেখেছি বোল্টে একটা বুলেট লোড করা ছিলো তার মানে খালিদ বাধা দেয়ার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছিলো কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে সে ঠিক কুলিয়ে উঠতে পারে নি। খালি চোখে সিঁড়িটা নিশ্চিত গাঢ় রক্তের কারণে কালো দেখালো। কিন্তু আমাদের নাইট ভিশনের কারণে অনেকটা গাঢ় সুবজ দেখাচ্ছে। ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠতে লাগলাম। খুব সাবধানে উঠছি, আর আমাদের সামনের অ্যাসল্টার আরো সাবধানে। কারণ অনেকটা তার মুভমেন্টের উপরেই নির্ভর করছে আমাদের নিরাপত্তা। .

থ্রটল অন, থ্রটল অফ!

এটাই হয় এই ধরনের ফাইটে। মুহূর্তের ভেতরেই নির্ধারিত হয়ে যায় জয়-পরাজয়। আমাদের হিসাব মতো এই বাড়িতে কমপক্ষে চারজন পুরুষ লোক থাকার কথা। তার মানে সেই হিসেবে বাকি আছে শুধুমাত্র বিন লাদেন। আমার মনে হচ্ছে সামনে ভালো একটা গানফাইট হতে পারে যদি এর মধ্যেই সে আহত বা নিহত না হয়ে থাকে।

"সাবধানে, সতর্কতার সাথে," মনে মনে নিজেকে সতর্ক করে দিলাম। আমার সামনের অ্যাসল্টারের ঠিক পেছনেই আমি। মানে তাকে কভার করা ছাড়া আমার এই মুহূর্তে আসলে তেমন কিছু করার নেই। আমরা আক্রমন শুরু করার পরে প্রায় পনেরো মিনিটের মতো পার হয়েছে। তার মানে বিন লাদেন একটা সুইসাইড ভেস্ট পরার জন্যে বা তার অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হবার জন্যে সময় পেয়েছে যথেষ্ঠ।

আমার চোখ আর কান সম্পূর্ন প্রস্তুত হয়ে আছে যেকোন ধরনের শব্দ বা নড়াচড়ার জন্যে। আমি যেকোনো সময় একটা গুলির আওয়াজ বা একটা ছায়ার নড়াচড়া বা কারো এগিয়ে আসার শব্দ শুনতে পাবো বলে মনে হচ্ছে। এই ধরনের মিশনে এরকম টানটান মুহূর্তে, ঠিক এই ধরনের হঠাৎ কিছু একটা দিয়েই ভেঙে পড়ে। আমি এরকম অন্তত শ'খানেক অপারেশনে অংশ নিয়েছি এবং আমার অভিজ্ঞতা তাই বলে। তবে যাই হোক আমাদের মাথায় একটা ব্যাপারই শুধু ইন্সটল করা, আর সেটা হলো যেভাবেই হোক আমাদেরকে জিততে হবে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরে এই মিশন শুধুমাত্র এ কারণেই আমাদের কাছে এতোটা গুরুত্বপূর্ন।

সিঁড়ির উপরে উঠে আমরা একটা সরু হলওয়ে দেখতে পেলাম। ওটার একদিকে একটা ব্যালকনির দরজা আরেক দিকে পরপর দুটো দরজা। একটা ডানে একটা বামে।

সিঁড়িটা দুজনের একসাথে উঠে আসার জন্যে বেশ সরু। তাই আমরা একজন একজন করে উঠে এলাম। আমাদের সামনের দরজা দুটো খুব একটা দূরে না।

হঠাৎ ঝলকানির মতোই হলওয়ের ডানদিকে একজন মানুষকে নড়তে দেখলাম। আমাদের থেকে দূরত্ব হবে খুব বেশি হলে পাঁচ কদম। ছায়াটা এক পলক দেখা দিয়েই নিমেষের ভেতরে অন্ধকার দরজার আড়ালে হারিয়ে গেলো।

আমার সামনের জন খুব ধীরে ধীরে, দরজার সামনে গিয়ে দরজাটায় মৃদু একটা ঠেলা দিল। হলিউডি সিনেমাতে আমরা যেমনটা দেখি, কমান্ডোরা ধড়াম করে দরজা ভেঙে ডাইভ দিয়ে ভেতরে ঢুকে যায়, সেরকম না। আমরা এগোলাম অনেক ধীরে ধীরে সময় নিয়ে।

আমার সামনের অ্যাসল্টার ধীরে ধীরে খোলা দরজার একপাশে দাঁড়ালো, পুরোপুরি প্রফেশনাল ভঙ্গিতে ট্রেনিংয়ে শেখানো স্টাইলে তার রাইফেল তাক করা। তার শরীরটা অত্যন্ত সতর্ক একটা ভঙ্গিতে স্থির হয়ে আছে। ঠিক পেছনেই আমি। তারপর আবারো সময় নিয়ে আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম।

ভেতরে ঢুকে প্রথমেই দেখতে পেলাম দুজন মহিলা বিছানার গোড়ায় লম্বা হয়ে পড়ে থাকা এক লোকের উপরে ঝুঁকে আছে। মহিলাদের পোশাক আলুথালু, চুল কাকের বাসা। দেখলেই বোঝা যায় আমাদের আক্রমনের আগে এরা ঘুমিয়ে ছিল। আরবীতে বিলাপ করছিলো দু'জনে। হঠাৎ একজন মহিলা উঠে দাঁড়ালো। সাথে সাথে আমার সামনের অ্যাসল্টার তাকে রুমের একপাশে টেনে নিলো। মহিলা যদি সুইসাইড ভেস্ট পরে থাকে তবে এতে আক্রমনের মাত্রাটা কমে যাবে।

তবে তেমন কিছু হল না। আমার সামেনর জন সরে যেতেই আমি তৃতীয় আরেকজন অ্যাসল্টারকে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। দ্বিতীয় মহিলাকেও পড়ে থাকা লোকটার কাছ থেকে বিছানার একপাশে সরিয়ে দেয়া হল।

এবার আমরা নজর দিলাম পড়ে থাকা ব্যক্তির দিকে। তার পরনে একটা হাতাকাটা টি-শার্ট, লুজ প্যান্ট এবং ট্যান কালারের টিউনিক। দেরি করে তার দিকে নজর দেয়ার কারণ, রুমে ঢোকার সাথে সাথেই আমরা দেখেছি মেঝের একটা অংশ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। লোকটা গুলি খেয়েছে। গুলিটা তার মাথার একপাশে লেগে খুলি ভেঙে মগজ বেরিয়ে এসেছে। তবুও ঝুঁকি না নিয়ে আমরা নিশ্চিত হবার জন্যে তার শরীরে গুলি চালালাম কয়েকটা।

এতোক্ষণে আমি রুমের চারপাশে তাকালাম। একপাশে দেখতে পেলাম, রুমের এক কোনায় গুটিশুটি মেরে বসে, বেশ কয়েকটা বাচ্চা কাঁদছে। তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে ব্যালকনির একটা স্লাইড ডোর টেনে ওদেরকে বারান্দায় বের করে দিলাম। যাতে এই রুমের ভয়ঙ্কর দৃশ্য বাচ্চাগুলোকে দেখতে না হয়।

তারপর আমার তৃতীয় সঙ্গীকে ওখানে রেখে সতর্কতার সাথে, পাশের একটা দরজার দিকে এগোলাম। একটা বিদ্ধস্ত এলোমেলো অফিস। পাশে একটা ছোট্ট বাথরুমের দরজা। সেটারও ভেতরে চেক করে অল ক্লিয়ার মেসেজ পাঠালাম।

আমি ফিরে এসে দেখি মহিলাদের একজনকে বাচ্চাদের সাথে বারান্দায় রাখা হয়েছে, আরেকজন বিছানার কিনারায় বসে আছে। পুরো রুম ক্লিয়ার।

অবশেষে তাকে আমরা মারতে পেরেছি।

হলওয়েতে ওয়াল্টের সাথে দেখা হয়ে গেল।

রেডিওতে মেসেজ এলো “এদিকটা পরোপুরি ক্লিয়ার।”

“এদিকাও ক্লিয়ার,” আমি জবাবে জানালাম।

ওয়াল্ট আর আমি একসাথে রুমে ফিরে এলাম। টম ব্যালকনিতে বাচ্চা আর মহিলাদের শান্ত করার চেষ্টা করছে।

ওয়াল্ট বিন লাদেনের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে ট্রুপনেটের রেডিওতে ঘোষণা করলো, “থার্ড ডেক, সিকিউর করা হয়েছে।

জেরোনিমো

বেডরুমের ভেতরে একজন কমবয়সী মহিলা একপাশের একটা বিছানার উপরে শুয়ে চিৎকার করে কাঁদছে।

ওয়াল্ট লাশের পাশে দাঁড়িয়ে মৃতের চেহারা দেখার চেষ্টা করলো। কিন্তু কাজটা সহজ না। কারণ এখানে বিদ্যুৎ নেই। আবছাভাবে সবকিছু বোঝা গেলেও সূক্ষ্মভাবে কারো চেহারা এই আলোতে বোঝা সম্ভব নয়। আমি আমার হেলমেটের সাথে লাগানো লাইটটা জ্বালালাম।

লোকটার মাথার একটা পাশ গুলি লেগে একদম বিদ্ধস্ত হয়ে গেছে। কপালের পাশে রক্তে ঢাকা একটা বড় গর্ত, ওটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে হলদে মগজ। আর বুকে সিকিউরিটি শটের কারণে, বুকটা একদম ঝাঝড়া হয়ে গেছে। আর বডিটা ডুবে আছে এক পুকুর রক্তের মধ্যে।

আমি ভালো করে দেখার জন্যে ঝুঁকলাম। টমও আমার সাথে যোগ দিল।

"আমার মনে হয় এটাই লাদেন," টম মৃদু স্বরে বললো।

কিন্তু কথাটা সে রেডিওতে বলার সাহস পেলো না। কারণ রেডিওতে কথাটা বলামাত্র তা সরাসরি আমেরিকার প্রেসিডেন্টসহ সবাই শুনতে পাবে। কাজেই একদম নিশ্চিত না হয়ে বলা সম্ভব নয়।

তবে এটাই লাদেন হবার সম্ভবনা শতভাগ। মনে মনে আমি হিসেব মেলাতে লাগলাম।

পড়ে থাকা লোকটা বেশ লম্বা, কমপক্ষে ছয়ফুট চার বা পাঁচ ইঞ্চি হতে পারে।

এটা মেলে।

থার্ড ডেকে সে-ই একমাত্র পুরুষ লোক।

এটাও মেলে।

এই বাড়িতেই তার কুরিয়ার দু'জন ছিলো।

এটাও মেলে।

তারপরে আমি ঝুঁকে তার চেহারাটা দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম তার মাথার একটা পাশ বিদ্ধস্ত হলেও নাকটা একদম ঠিক আছে। আর সেটা আমার দেখা লাদেনের পুরনো ছবির সাথে মিলে যায়। তবে তার চুল বা লম্বা দাড়ি একদম কালো। আমি যেমনটা ধূসর আশা করেছিলাম তেমন নয়। সম্ভবত ওগুলোতে কলপ করা হয়েছে।

"দাঁড়াও, আমি আর ওয়াল্ট মিলে ব্যাপারটা সমলাচ্ছি," টমকে বললাম।

টম সম্মতি জানালো।

আমি ওয়াল্টকে একটা কম্বলের খানিকটা অংশ ভিজিয়ে আনতে বলে কাজে লেগে গেলাম। প্রথমেই ক্যামেরা বের করে মৃতব্যক্তির চেহারাসহ দেহের ছবি তুললাম বেশ কয়েকটা।

এদিকে উইল আরবিতে বিলাপ করতে থাকা মহিলার সাথে কথা বলার চেষ্টা করছে। পরে আমরা জানতে পারি তার নাম আমাল আল ফাতাহ, বিন লাদেনের পঞ্চম স্ত্রী। মহিলা সামান্য আহত হয়েছে। সম্ভবত কোনো বুলেটের ভাঙা অংশ বা এই রকম কিছু একটা দিয়ে গোড়ালিতে আঘাত লেগেছে।

হঠাৎ রেডিও খরখর করে উঠলো, কে যেন বললো, "আমরা সেকেন্ড ডেকে বেশ ভালো পরিমাণে কালেক্টিং ম্যাটেরিয়াল পেয়েছি। কেউ একজন এসে আমাদেরকে সাহায্য করো।"

টম নিচের দিকে রওনা দিল।

ওয়াল্ট কম্বলের ভেজা অংশ নিয়ে ফিরে আসতে আমি মৃতের মুখটা মোছার চেষ্টা করলাম। রক্ত আর ময়লা পরিষ্কার হতেই চেহারাটা আরো ভালোভাবে বোঝা গেল। এটা মনে হচ্ছে বিন লাদেনই। তবে তাকে দেখতে অনেক কম বয়স্ক লাগছে। সম্ভবত চুল-দাড়ি কলপ করার কারণেই এমনটা মনে হচ্ছে।

আমি রেডিওতে বলে উঠলাম, "থার্ড ডেকে সম্ভবত আমাদের টার্গেটকে পাওয়া গেছে,

আমি আবারো বলছি, সম্ভবত।”

এতো বিখ্যাত একটা মুখ এতোটা কাছ থেকে দেখে কেমন যেনো অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো আমার। আমি ভাবতেও পারছিলাম না, যে লোকটার বিরুদ্ধে আমরা প্রায় এক দশক ধরে যুদ্ধ করে আসছি, আমি নিজের হাতে তার মৃতদেহের মুখ পরিস্কার করছি। যাতে কয়েকটা ভালো ছবি তুলতে পারি। যাই হোক আমি ভাবালুতা বাদ দিয়ে কাজে লেগে গেলাম। আমার এখন দারুণ কয়েকটা ছবি দরকার।

কম্বলের ছেড়া অংশটা ফেলে দিয়ে তুলে নিলাম ক্যামেরাটা। এই ক্যামেরাটা দিয়ে আমি এর আগে অসখ্য ছবি তুলেছি। আর এখন আমাকে আবারো এই কাজটাই করতে হবে। টিভিতে সিএসআই মায়ামি, নিউইয়র্ক দেখেছি। এখন আমাকে সিএসআই আফগানিস্তান করতে হবে।

প্রথমে পুরো বড়ির শট নিলাম তারপর নিতে শুরু করলাম মুখের। আমি খেয়াল রাখছি যেন তার নাকটা ভালোভাবে ছবিতে আসে। কারণ ওটাই তার চেহারা সনাক্তকরনে মূল ভূমিকা রাখবে। তার চোখের রঙ চেক করা দরকার। আমি ওয়াল্টকে বললাম চোখটা খুলে ধরতে, তারপর শট নিলাম।

উইল ব্যালকনিতে মহিলা আর বাচ্চাদের সামলাতেই ব্যস্ত। আমাদের নিচের ফ্লোরগুলোতে আমার ফেলো কমান্ডোরা অতি প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্যে সার্চ করছে, হার্ড ডিস্ক, মেমোরি, ল্যাপটপ এসব। বাইরে আলি আর দুয়েকজন চেষ্টা করছে কৌতূহলী প্রতিবেশিদের সামলাতে।

আমি মাইককে রেডিওতে ক্র্যাশ করা চপারের ব্যাপারে কথা বলতে শুনলাম। ও রেডিওতে বলছে, “ডেমোলিশান টিম চপারটাকে উড়িয়ে দাও।”

“রজার দ্যাট,” গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে ওরা জবাব দিলো।

“তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেলো নাকি?” হঠাৎ রেডিওতে একজন চিৎকার করে উঠলো। এটা ইওডি টেক টিমের একজন। “তুমি বাড়ি উড়িয়ে দিতে বলছো কেন?”

“কিসের বাড়ি?” মাইক জবাব দিলো। “বাড়ি না চপারটা।”

“কি?”

“চপার, গাধা। ক্র্যাশ করা চপারটা, আমি ওটাকে উড়িয়ে দিতে বলেছি।’

এখানে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। মাইক রেডিওতে ডেমো টিমকে ক্র্যাশড চপারটাকে উড়িয়ে দিতে বলেছে, আর ইওডি টিম ভেবেছে

মাইক ওদেরকে বলেছে, বাড়িটা উড়িয়ে দিতে। মাইক ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে দিলো।

এ ধরণের ভুল বোঝাবুঝি আজ আরেকবার হয়েছিলো। আমরা নামার সময়ে যখন প্রথম চপারটা ক্র্যাশ করলো, ওয়াশিংটনের কর্তাব্যক্তিরা কিছুই বুঝতে পারছিলেন না আসলে হচ্ছেটা কি। এমনকি ম্যাকর‍্যাভেন ওদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার কথাও ভেবেছিলেন। পরে সব বোঝানোর পরে তারা বুঝতে পারে এবং মিশন এগিয়ে চলে।

ক্র্যাশ হওয়া চপারটার বাইরে ক্রুরা চপার থেকে অতিপ্রয়োজনীয় দুয়েকটা জিনিস যেমন রোপ আর এরকম কিছু জিনিস নামিয়ে রেখে ওটার বাইরের ইন্সট্রুমেন্টগুলো ভেঙে ভেতরে ঢুকিয়ে রাখছে। এমন সময় ওটার দরজায় দেখা দিলো সিনিয়র পাইলট টেডি। সে লাফিয়ে নামতে গিয়ে উচ্চতা দেখে পিছিয়ে গেলো। খামোখা আহত হবার কোনো মানে হয় নেই। সে নিচে নেমে এলো একটা রোপ ধরে।

টেডি নেমে আসতেই ক্রুরা দ্রুত তাদের কাজ গোছানোর সাথে সাথেই অ্যাকটিভ হলো ইওডি আর ডেমো টিম। ওরা যত্নের সাথে চপারটার বিভিন্ন জায়গায় চার্জ সেট করা শুরু করলো। এই চার্জ সেট করার মধ্যেও কারসাজি আছে। বোমাটা সেট করতে হয় এমনভাবে যেনো সবচেয়ে কম চার্জ লাগে, বিস্ফোরণ যেন বাইরের দিকে না ছড়ায় এবং সবকিছু যেনো সুন্দরভাবে ধ্বংস হয়। বাইরের চার্জ সেট করার পর ওরা বাকি চার্জ সেট করতে লাগলো মেইন কেবিনে।

ওদিকে যখন এসব কাজ চলছিলো তখন আমাদের দ্বিতীয় চপার মানে চক-টু আর সি-৪৭ আকাশে চক্কর মারছিলো। ওরা ওখানে অপেক্ষা করছিলো, যাতে আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেলে নেমে আসতে পারে। আমার মন বলছে এখানে ফুয়েল একটা বড় সমস্য হয়ে দেখা দিতে পারে। দিয়ে বলছে। যদিও একটা চপারে রিফুয়েলিংয়ের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সেটা সময়ের ব্যাপার।

"দশ মিনিট," আমি মাইককে রেডিওতে বলতে শুনলাম।

ওদিকে উপরে থার্ড ফ্লোরে হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে আসাতে আমরা আলোর বন্যায় ভেসে গেলাম। বিদ্যুৎটা দারুণ একটা সময়ে এসেছে। আমি আবারো কয়েক সেট ছবি তুলে নিলাম। ওদিকে ওয়াল্ট আরেক দফা ডিএনএ স্যাম্পল কালেক্ট করতে লেগেছে। সে একটা কটনবাড রক্তে, আরেকটা বিন লাদেনের মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে রক্ত আর লালার স্যাম্পল নিলো। তারপর বের করলো একটা স্প্রিং লোডেড সিরিঞ্জ। এটা সিআইএ আমাদেরকে দিয়েছে ঊরুতে পুশ করে হাড়ের ভেতরে থেকে স্যাম্পল নেয়ার জন্যে।

ওয়াল্ট যখন ওটা নিয়ে গলদ ঘর্ম হচ্ছে, সুবিধা করতে পারছে না আমি এগিয়ে গেলাম ওক সাহায্য করার জন্যে। তবুও বেশ ঝামেলা হল কাজটা সারতে। এদিককার যাবতীয় কাজ শেষ হয়ে যাবার পর, আমি আরেকজন নেভি সিলের ক্যামেরা দিয়ে আরো কয়েক দফা ছবি তুললাম।

সবশেষে ছবি তোলা দুটো ক্যামেরা আর ডিএনএ'র যাবতীয় স্যাম্পলগুলো দুভাগ করে দুই দলে নিয়ে নেয়া হল। কোন কারণে যদি নির্দিষ্ট একটা দল ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবে আরেক দলের কাছে বিন লাদেনকে ধরার এভিডেন্স থাকবে।

আমরা এদিককার কাজ করার সময়ে, উইল চেষ্টা করছিলো বিন লাদেনের স্ত্রীর কাছ থেকে মৃতদেহটা লাদেনের কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে। না পেরে সে বিছানায় বসে থাকা আমেলের সামনে এসে দাঁড়ালো।

মহিলা এখনো বসে বসে ফুপিয়ে কাঁদছে। পায়ের গোড়ালিতে আঘাতের কারণে না, বরং সে সম্ভবত পরিস্থিতির চাপে মৃদু কাঁপছিল।

উইল তার সামনে দাঁড়িয়ে মৃতদেহটা দেখিয়ে আরবিতে প্রশ্ন করলো, "এটা কে? নাম কি?"

"শেখ।"

"শেখ কি?" উইল জানতে চাইলো নামের আগে বা পরে কি আছে। কিন্তু মহিলা কথা বলছে না। আর বললেও উল্টাপাল্টা বলছে। উইল বিরক্ত হয়ে ব্যালকনিতে বাচ্চাদের ভেতরে তুলনামূলক বড় একটা মেয়ের কাছে জানতে চাইলো মৃত ব্যাক্তির নাম কি।

"ওসামা বিন লাদেন।"

উইলের মুখে হাসি ফুঁটে উঠলো।

"ঠিক তো, এটা ওসামা বিন লাদেন?"

"হ্যা," মেয়েটা জবাব দিলো।

"ঠিক আছে, ধন্যবাদ," উইল ভেতরে চলে এলো।

উইল হলরুমে ফিরে এসে, ওসামার তুলনামূলক বয়স্ক একজন স্ত্রীর হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে জানতে চাইলো মৃত ব্যক্তি কে।

"ওসামা," মহিলা জবাব দিলো।

"ওসামা কি?"

"ওসামা বিন লাদেন।"

উইল রেডিওতে কথা বলে উঠলো, "আমরা আমাদের টার্গেটকে পেয়ে গেছি। ডাবল কনফার্মেশান করা হয়েছে। বাচ্চাদের একজন, সেই সাথে একজন বয়স্ক মহিলা কনফার্ম করেছে।"

একটু পরে জে আর টম এসে দাঁড়ালো রুমের ভেতরে।

আমি ওদের উইলের কনফার্মেশানের ব্যাপারে জানালাম। ওরা তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললো ঠিকই আছে।

"এটাই লাদেন, ঠিকই আছে," বলে জে রেডিওতে ম্যাকর‍্যাভেনের সাথে কথা বলতে বলতে বাইরে চলে গেলো। আমরা আমাদের কাজে লেগে গেলাম।

"ফর গড অ্যান্ড কান্ট্রি আই পাস জেরোনিমো," জে বললো রেডিওতে। "জেরোনিমো ইকেআইএ।"

ট্রুপনেটে নিচের ফ্লোরের অ্যাসল্টাররা ঘোষণা করলো লাদেনের কম্পিউটার, হার্ডডিস্ক, ল্যাপটপ, সিডি, ডিভিডি, পেনড্রাইভ, মেমোরি কার্ড সবই পাওয়া গেছে একসাথে নিচের ছোট্ট একটা অফিসরুমে।

সিআইএ আমাদেরকে ব্রীফ করেছে, লাদেনের বিশেষ কিছু ভয়েস রেকর্ডারের ব্যাপারে। লাদেন নাকি ওগুলোতে অনেক কিছু রেকর্ড করে রাখে এবং তার অনুসারীদেরকে নির্দেশ দেয়। আমি ওদেরকে এগুলোও খুঁজে দেখতে বললাম।

ফটো আর ডিএনএ নিয়ে আমাদের কাজ শেষ করার পর ওয়াল্ট আর একজন কমান্ডো মিলে লাদেনের মৃতদেহটা ধরে বাইরে নিয়ে এলো। আজও আমার চোখে ওই দৃশ্যটা পরিস্কার ভাসে, আমরা ধরাধরি করে লাদেনের লাশটা বাইরে নিয়ে আসছি। আমার মনে হয় না, কোনো দিন এটা আমি ভুলতে পারবো!!

বডিটা বের করে নিয়ে যাবার পর আমি এদিকটা সার্চ করতে শুরু করলাম। প্রথমেই লাদেনের অফিসটা। বলতে গেলে তেমন কিছুই নেই, শুধু কিছু কাগজ আর কয়েকটা অডিও ক্যাসেট পেয়ে সেগুলো ভরে নিলাম একটা ব্যাগে। তারপর বাথরুমে সার্চ করেও উল্লেখযোগ্য কিছু পেলাম না শুধুমাত্র একটা হেয়ার ডাইয়ের প্যাকেট বাদে। ওটা দিয়েই লাদেন সম্ভবত তার চুল-দাড়ি কালো করেছিলো।

রুমের ভেতরের দিকে সার্চ করতে করতে দেয়ালের ভেতরের দিকে একটা ড্রেস কাবার্ড পেলাম। জিনিসটা খুলে আমি খুবই অবাক হলাম। অত্যন্ত চমৎকার একটা কাবার্ড। আধুনিক রুচিশীল। সব ধরনের কাপড় চোপড়ই আছে এতে, ভাজ করা টি-শার্ট, মোবাইল প্যান্ট থেকে শুরু করে জোব্বা, আর্মি টিউনিক সবকিছু। আমি নিশ্চিত এগুলো কোনো ড্রেস ডিজাইনারের করা।

"আমার যদি এমন একটা কালেকশান থাকতো," মনে মনে ভাবলাম। কয়েক ধরনের কাপড় আমি ব্যাগে ভরে নিলাম। এটা প্রমানস্বরূপ এবং মিডিয়ার সামনে দেখানোর জন্যে কাজে লাগতে পারে। আমি আরেকবার চারপাশে তাকালাম। এটা আসলে শোবার ঘর, তেমন কিছু একটা নেই। তবে সার্চ করতে গিয়ে একটা শেলফের ভেতরের তাকে হোলস্টারে একটা ম্যাকারভ পিস্তল এবং একটা একে৪৭ পেলাম। চেক করতে গিয়ে দেখি দুটোই ফাঁকা। একটাতেও গুলি নেই।

বিন লাদেন আসলে আত্মরক্ষার কোনো চেষ্টাই করে নি।

যে লোকটা সারাজীবন মানুষকে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতে বলেছে, মানুষকে সুইসাইড ভেস্ট পরে গাড়ি বাড়ি উড়িয়ে দিতে বলেছে, সে নিজে একটা অস্ত্রও প্রস্তুত রাখে নি। এটাই হয়, নেতারা সবসময় বড় বড় কথা বলে, নিজেদের লোক দিয়ে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কাজগুলো করিয়ে নেয়, আর ভাব দেখায় তাদের মতো সাহসী আর কেউ নেই। কিন্তু আসলে কার কতটুকু সাহস থাকে, সেটা বোঝা যায় আসল সময় এলে।

বিন লাদেন লোকটার প্রতি আমার শ্রদ্ধা যাও বা ছিল, সেটা আরেক ধাপ কমে গেলো। সে অবশ্যই জানতো আমরা আসছি, কারণ হেলিকপ্টারের আওয়াজ সে পেয়েছে। আর সবার থেকে সে বেশি সময় পেয়েছে আত্মরক্ষা করার জন্য, অথচ সে একটা বন্দুক পর্যন্ত রেডি করে নি। এরচেয়ে বরং আল-কুয়েতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা জাগছে। কারণ লোকটা কিছু পারুক না পারুক, অন্তত একটা বন্দুক হাতে নিজেকে আর নিজের পরিবারকে রক্ষা করতে চেয়েছে। সে জানতো আমাদের সাথে পারবে না কিন্তু চেষ্টা তো করেছে। সে যা বিশ্বাস করে

সেটার স্বপক্ষে একটা বন্দুক হাতে দাঁড়াতে তো পেরেছে। আর এই লোকটা সারাজীবন মানুষকে নিজের বিশ্বাস লালন করে, বন্দুক হাতে তুলে নিতে বলেছে অথচ নিজের সময়ে সেটা পারে নি।

রেডিওতে টিমের সিকিউরিটি আপডেট শুনছিলাম। উত্তর দিকে আলি সহ কয়েকজন অ্যাসল্টার কুকুরটা নিয়ে পাহারায় আছে। মূলত ওরাই সিকউরিটি আপডেট জানাচ্ছে সবাইকে।

এখনো পর্যন্ত তেমন কোন ঝামেলা হয় নি। শুধুমাত্র একবার প্রতিবেশিদের কয়েকজন নিজেদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে এগিয়ে এসেছিলো। আলি পশতুন ভাষায় চিৎকার করে তাদেরকে ফেরৎ যেতে বলেছে। তারা আর এগোয় নি।

কিন্তু এখন সময় কম হয়ে আসছে। সবাই নিরাপত্তাহীন মনে করছে কারণ যতো দ্রুত সম্ভব এখান থেকে এখন সরে পড়া উচিত।

মাইক রেডিওতে জানালো আমরা এই কম্পাউন্ডে ঢুকেছি ত্রিশ মিনিট হয়ে গেছে। কাজেই এখন ফিরতে হবে। একজন সিল চিৎকার করে বললো আর দশ মিনিট দরকার কারণ সবাই সার্চটা ভলো করে চালাতে চাইছে, কেউ চাইছে না প্রয়োজনীয় কিছু রয়ে যাক। কিন্তু মাইক জানালো চপারগুলোর ফুয়েল শেষ হয়ে আসছে তাই দ্রুত যেতে হবে।

"ঠিক আছে, পাঁচ মিনিট দিলাম, এর ভেতরে শেষ করো," মাইক জানালো।

সবাই হাত লাগালো। কারণ এই সময়ে এতো কাজ করা আসলে কঠিন। একটা পুরো বাড়ি সার্চ করা সময়ের ব্যাপার। আমি শেষবারের মতো চারপাশে তাকালাম কিছু একটা ফেলে যাচ্ছি কিনা দেখতে। তেমন কিছু চোখে পড়লো না। ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে আসছি, মাইক রেডিওতে চিৎকার করে উঠলো, "মহিলা আর বাচ্চাদেরকে কম্পাউন্ডের বাইরে যেতে বলো।"

এর কারণ সম্ভবত ক্র্যাশড চপারটা বিস্ফোরণ করার সময় হয়ে গেছে। আর এই ক্ষেত্রে কোনো সিভিলিয়ান কাছে না থাকাই ভালো। বাইরে এসে দেখলাম উইল আর কয়েকজন মিলে বাচ্চা আর মহিলাদের বাইরে বের করার চেষ্টা করছে।

কিন্তু কাজটা সহজ নয়। কারণ বাচ্চারা এদিকে সেদিকে চলে যাচ্ছে, মহিলারা বসে পড়ছে। একবার ভাবলাম ওদেরকে সাহায্য করি, পরমুহূর্তে সে চিন্তা বাদ দিয়ে আমার কাজে লেগে গেলাম। আমরা বিন লাদেনের লাশ একটা ব্যাগে ভরে খালিদের ছবি তুললাম এবং তার ডিএনএ স্যাম্পল কালেক্ট করে ছুটলাম সি-ওয়ানের দিকে। ওখানে পৌছে আল-কুয়েতির ছবি তুলে আমি ওর ডিএনএ'র কাজ করছি এমন সময় রেডিওতে চিৎকার করে উঠলো একজন, "হেই গাইজ, যে যা করছো বাদ দিয়ে সোজা এক্সফিল এইচএলজেডের দিকে চলে এসো এক্ষুনি।"

আমি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সোজা ছুটলাম উদ্দিষ্ট্য লক্ষ্যে।

চক-টু আর সি-৪৭ চপার দুটো নেমে আসছে আমাদেরকে তুলে নেয়ার জন্যে। আমি আল-কুয়েতির পরিবারের দিকে ফিরে তাকালাম, ওরা এখনো খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। চক ওয়ান বিস্ফোরিত হবে যেকোনো সময়। ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলে নিশ্চিত আহত হবে। কারণ বিস্ফোরণটা যথেষ্ঠ বড় মাপেরই হবে। ওদেরকে কম্পাউন্ডের বাইরে নিয়ে যাবার মতো অবস্থাও নেই। আমি ইশারায় ওদেরকে গেস্টহাউসের ভেতরে যাবার নির্দেশ করলাম। ওরা কি বুঝলো কে জানে কিন্তু ওদিকেই এগোল। ওদেরকে ভেতরে রেখে আমি বললাম, এখানেই থাকো। বুঝলো কিনা জানি না। আমি বাইরে বেরিয়ে দরজাটা লাগিয়ে দিলাম। চক-ওয়ানে'র বিস্ফোরণটা বড় মাপের হলেও ওটার আঁচ এখানে পৌছাঁবে বলে মনে হয় না।

বাইরে এসে দেখি টেডি আর দুজন ক্রু মাইকের সাথে দাঁড়িয়ে আছে। টেডিকে দেখাচ্ছে বেশ বিদ্ধস্ত। বেচারা নিজের চপার হারিয়ে দিশেহারা বোধ করছে।

আমি মাইকের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললাম "মহিলা আর বাচ্চাদের সি-ওয়ানে

রেখেছি, ওদেরকে এখান থেকে বের করা সম্ভব না।”

মাইক মাথা নাড়লো। এমন সময় মূল ভবন থেকে কমান্ডোরা বেরোতে লাগলো। লাগলো। ওদেরকে দেখতে লাগছে সান্তা ক্লজের মত। একেকজনের সাথে বিরাট বিরাট পোটলা। ওরা বিল্ডিংটাতে প্রচুর জিনিসপত্র পেয়েছে এবং সেগুলোকেই বহন করে আনছে। ভারি ভারি বোঝা নিয়ে একেজনের চেহারা হয়েছে হাস্যকর। যে যা পেয়েছে তাই ঢুকিয়ে নিয়েছে সব। কারো হাতে জিমব্যাগ, কাপড়ের ব্যাগ, চটের বস্তা, ব্রিফকেস এসবে করেই বহন করে এনেছে সব ধরনের এভিডেন্স।

সবাই জিনিসপত্রগুলো নিয়ে চপার দুটোর দিকে এগোতে লাগলো। জিনিসগুলো ভাগ করে চপার দুটোতে তুলতে হবে। এক এক করে সব তোলা হতে লাগলো দুটো চপারে। চক-টুতে থাকবো আমরা কয়েকজন লাদেনের বডিব্যাগসহ আরো কিছু জিনিসপত্র নিয়ে। আর মনে হয় চক-ওয়ানের ক্রুসহ সবাই যারা আছে, সবার জায়গা একটা চপারে হবে না। দুটো চপারেই ভাগ ভাগ করে উঠতে হবে।

আমরা যখন কাজ করছি দেখলাম আশেপাশের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই লাইট জ্বলে উঠছে। কৌতুহলী লোকজনের মাথা দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রতিটা বাড়ির জানালাতে। আলি পশতুন ভাষায় চিৎকার করে ওদেরকে ভেতরে যেতে বললো।

হঠাৎ খেয়াল করলাম উইল নেই।

“উইল কোথায়?” আমি ওয়াল্টের কাছে জানতে চাইলাম।

“কিছুক্ষন আগে তো দেখলাম মহিলা আর বাচ্চাদেরকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে।

আমি রেডিওতে উইলের খোঁজ করতে লাগলাম। সে এখনো বাইরেই আছে। শেষ মহিলাটাকে গেটের বাইরে বের করে দিয়ে ফিরে আসছে। আমরা লাদেনের বডিব্যাগ নিয়ে সামনে এগোতে লাগলাম। সাথে সাথে রোটরের বাতাসের ধাক্কায় চোখ মুখ বন্ধ হয়ে এলো। বাতাস অগ্রাহ্য করে এগোতে লাগলাম সাবধানে। এই চপারটাই আমাদের ফিরে যাবার শেষ ভরসা।

লাদেনের বডিব্যাগ নিয়ে এগোতে গিয়ে আমাদের জান বেরিয়ে যাচ্ছে। একে তো মৃতদেহের ওজন বেড়ে যায় বেশি, তার উপর ছয়ফিট চার ইঞ্চির বডিটা বহন করতে গিয়ে আমাদের ঘাম ছুটে গেলো। হঠাৎ ওয়াল্টের হাত থেকে ব্যাগের একটা কোনা ছুটে গেলো।

“শিট,” বলে চিৎকার করে উঠলো সে। ও-ই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে খাটো, পাঁচফিট ছয় ইঞ্চি। কিন্তু ওর শারিরীক শক্তির কোনো তুলনা নেই। ও একাই একটা প্রান্ত তুলে ধরলো, তারপর দ্রুত এগোতে লাগলো চপারের দিকে।

চপারের কাছে পৌছে আমি আর ওয়াল্ট মিলে কোনমতে ব্যাগটা ছুড়ে দিয়ে উঠে এলাম ভেতরে। আমার বুক হাপরের মতো ওঠানামা করছে। কিন্তু মাথায় ঘুরছে একটাই চিন্তা যেভাবেই হোক এখান থেকে এখন ভাগতে হবে। কারণ চক-ওয়ান বিস্ফোরিত হতে আর মোটেই দেরি নেই। আমি চিৎকার করে পাইলটকে বললাম, “চলো চলো।”

কিন্তু চপার স্থির, আমি বুঝলাম পাইলট অন্য চপারটার জন্য অপেক্ষা করছে। হেলিকপ্টার সবসময় জোড়ায় জোড়ায় ওড়ে। কিন্তু এখন তো আর সময় নেই। চক-ওয়ানে চার্জ সেট করা হয়েছিলো পাঁচ মিনিটের, আমার ধারণা সেটা পার হতে আর পুরো এক মিনিট সময়ও নেই।

অপারেশনের জন্য আমাদের নির্ধারিত সময়ের চেয়ে আট মিনিট বেশি পার হয়ে গেছে। তার মানে অতিরিক্ত দশ মিনিট পার হতেও বেশি বাকি নেই। আরও বেশি সময় গেলে আমি নিশ্চিত, আমাদেরকে পাকিস্তানি মিলিটারির সাথে একটা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে হতে পারে। অবশেষে যেন অনন্তকাল পর পাইলট চিৎকার করে বললো, “আমরা উপরে উঠছি।”

বিস্ফোরণ ঘটতে আর বাকি আছে এক মিনিটেরও কম সময়। আমরা উঠতে যাবো হঠাৎ দেখলাম জে আর অরেকজন নেভি সিল, যারা ওর সাথে চার্জ সেট করছিলো ওরা এখনো

নিচে। ওরা ওদের কাজ নিয়ে এতোটাই ব্যস্ত ছিলো যে এদিকে খেয়াল করার সময়ই পায় নি। ওদেরকে এখুনি ফিরে আসার জন্যে সতর্ক করে দিতে রেডিওতে আমি রীতিমতো চেঁচাতে লাগলাম।

অন্যদিকে ওয়াল্ট রেডিওতে চিৎকার করে সি-৪৭কে আকাশে উড়তে বলছে কারণ বিস্ফোরণের আগে দুটো চপারই নির্দিষ্ট দূরত্বে যেতে না পারলে ওই বিস্ফোরণের সাথে সাথে এগুলোও বিস্ফোরিত হবে।

ওরা ফিরে আসার সাথে সাথে চপার উপরে উঠতে লাগলো, ওদিকে সি-৪৭ও উঠছে। আমরাও উঠে এলাম আর বলতে গেলে প্রায় সাথে সাথেই নিচে দেখা গেল কমলা রঙের আলোর ঝলকানি। একটু পরেই সেটা উঠে গেল উপরের দিকে। আওয়াজের ধাক্কাটা পেলাম আরো পরে। আমাদের চপার একটা বড় বৃত্তের আকারে ঘুরতে লাগলো। আর বিস্ফোরণের ধাক্কাটা কমে যেতেই সি-৪৭ আবারো নেমে গেল গ্রাউন্ডে, আরো কয়েকজন কমান্ডো বিল্ডিংয়ের ভেতরে রয়ে গিয়েছিলো ওদেরকে তুলে আনতে ওটা নিচে নেমে গেল।

আমি বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে দেয়ালে হেলান দিলাম। কেবিন অন্ধকার, শুধু সামনে পাইলটের ড্যাশবোর্ডের মৃদু আলো দেখা যাচ্ছে। আমি যেখানে বসে আছি সেখান থেকে ফুয়েল গেজটা পরিস্কার দেখা যায়। যখন আমি ভাবছি এবার একটু রিলাক্স হওয়া যায়, ঠিক তখুনি একটা লাল আলোর ঝলক চোখে পড়লো কন্ট্রোল প্যানেলে। আমি পাইলট নই, কিন্তু এটুকু বুঝতে পারলাম এটা মোটেই ভালো কোনো খবর নয়।

আমাদের চপারের ফুয়েল শেষ হয়ে আসছে।

এক্সফিল

ককপিটে বসে আমি বারবার ফুয়েল গেজের ফ্ল্যাশ করতে থাকা রেড লাইটের দিকে দেখছিলাম। ব্রীফিংয়ের সময় শোনা অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছি এটা আর বড়জোর দশ মিনিট টিকতে পারবে। আমি বেশ ভালোভাবেই অনুভব করতে পারছিলাম হেলিকপ্টারটা যেনো ঘুরছে। অনুভূতিটা অনেকটা জলের উপরে সার্কেলিং করতে থাকার মতো। ক্রু চিফ দরজায় দাঁড়িয়ে নিচের গ্রাউন্ডটা চেক করছে। আমি চোখের কোণ দিয়ে আবারো রেড লাইটটা দেখলাম, ওটার পরিধি আরো ছোট হয়ে আসছে।

কেবিনের ভেতরে সবাই ঝিম মেরে বসে আছে। এবার আমার পাশে বসেছে টম। ওয়াল্ট কেবিনের কোণায় রাখা বিন লাদেনের লাশটা আগলে বসেছে। হঠাৎ মনে হলো আমার পায়ে যেনো ঝিঁঝি ধরে গেছে। রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করার জন্যে পাটা নড়াতে লাগলাম। আমি জানি মিশনে আমাদের মূল দায়িত্ব সম্পন্ন হয়েছে। তবুও ফুয়েল থাকতে থাকতেই বর্ডার পার হয়ে নিরাপদ এরিয়াতে না পৌছানো পর্যন্ত আমরা কেউই স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। আমার মাথায় শুধু ফুয়েলের চিন্তাই ঘুরছে।

আসলে সত্যি কথা হল এখানে আমরা যারাই আছি সবাই পারফেকশনে বিশ্বাসী। তা না হলে আজ আমরা এখানে থাকতে পারতাম না। এ কারণেই এখন থেকে আটত্রিশ মিনিট আগে আমার মাথায় একটাই চিন্তা ঘুরছিলো সেটা হলো সঠিকভাবে দড়ি ফেলে দিয়ে নিচে নেমে কম্পাউন্ডটা অ্যাসল্ট করা। আর সে কারণেই এখন আমার মাথায় শুধু একটাই চিন্তা, নিরাপদে ফিরে যাওয়া।

হুভারটা, মানে ফুয়েল ট্যাঙ্কারটা ল্যান্ড করার আগে আমাদের চপার আরেকটা সার্কেল কমপ্লিট করে ফিরে এলো। অবশেষে আমি ওটার কালো অবয়ব দেখতে পেলাম আমাদের চপার থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরত্বে।

অন্যদিকে কয়েকজন সিল আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাদের চপার মাটি ছুঁতেই ওরা কোমর বাঁকা করে এগোতে লাগলো। কয়েকজন মিলে ফুয়েল চপার থেকে হোস পাইপ নিয়ে আমাদের চপারে লাগালো রিফুয়েলিংয়ের জন্যে। বাকিরা পাহারা দিতে লাগলো যাতে পাকিস্তানি ফোর্স এলে সতর্ক করে দিতে পারে।

ট্যাঙ্ক ভরতে থাকার সময় পাইলট চিৎকার করে জানালো ক্ষমতার তুলনায় ওজন বেশি হয়ে গেছে। চার্লিসহ কয়েকজন নেমে গেলো অন্য চপারে করে ফেরার জন্যে।

অন্যদিকে অ্যাবোটাবাদে পাকিস্তানি মিলিটারি অবশেষে এই ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠেছে। পরে জানতে পারি যখন চপারে ফুয়েল ভরছিলাম, তখন ওরা ওদের আকাশে থাকা সবকয়টা এয়ারক্রাফটকে আক্রমনের ভয়ে নামিয়ে আনে। সেই সাথে দুটো এফ-১৬ জঙ্গী বিমান প্রস্তুত করতে থাকে এদিকে রওনা দিতে। ওদের বেশিরভাগ এয়ার মেকানিজম সবসময় প্রস্তুত করা থাকে ইন্ডিয়ার দিকে। তাই ওরা ওগুলোকে ওদিকেই ঘোরাতে থাকে। রেডি হওয়া মাত্র জঙ্গী বিমান দুটো গর্জন করে আকাশে উঠে রওনা দেয় অ্যাবোটাবাদের এই আবাসিক এলাকার উদ্দেশ্যে।

চপারে বসে আমি বার বার ঘড়ি দেখতে লাগলাম, আমার অসহ্য লাগছে। কারণ আমি যথাসম্ভব দ্রুত জালালাবাদে ফিরে যেতে চাই সবাইকে নিয়ে। কিন্তু আমি এও জানি এখন অধৈর্য হলে ক্ষতি ছাড়া ভালো কিছু হবে না। এখন এই রিফুয়েলিংয়ের উপরে অনেক কিছু নির্ভর করছে।

চক-টু থেকে নেমে যওয়া কমান্ডোরা এবং বাইরে যারা ছিলো তারা সবাই সিএইচ-৪৭ চপারের দিকে যাচ্ছে।

আমি দেখলাম কয়েকজন মিলে ফুয়েলের হোস পাইপ গোছাচ্ছে, তার মানে কাজ শেষ। ওরা ধরাধরি করে হোস নিয়ে চপারটাতে তুলে ফেললো, আর সেই সাথে নিচে থাকা

কমান্ডোরাও উঠে পড়লো চপারে। তারপর যেন অনন্ত যুগ পর ঘুরতে শুরু করলো ওটার রোটার। দুটো চপার প্রায় একই সময়ে উঠে এলো আকাশে। তার মানে আর কোন সমস্যা নেই এখন, কোনভাবে বর্ডার পার হতে পারলেই হয়।

আমি আরেকবার ঘড়ি দেখলাম। রিফুয়েলিং করতে আমাদের সময় লেগেছে বিশ মিনিট। এই বিশ মিনিটে অনেক কিছুই হতে পারতো, কপাল ভালো হয়নি। আমি মনের পর্দায় দেখতে পেলাম পাকিস্তানি এয়ারফোর্সের দুটো এফ-১৬ আমাদের ধাওয়া করছে। পরমুহূর্তে ভাবলাম নাহ, এভাবে হবে না। মাথা থেকে চিন্তার এই ঝড় সরাতে না পারলে শান্তি পাবো না। আমি হেলমেট খুলে ভেজা চুলে আঙুল চালিয়ে একটু রিলাক্স হয়ে বসার চেষ্টা করলাম। আমাদের জালালাবাদ যেতে খুব বেশি সময় লাগবে না। এই সময়টা কাটানোই এখন একটা অশান্তির বিষয়। তাই টম যখন আমাকে ডেকে একটা কাজ ধরিয়ে দিল ওর প্রতি রীতিমতো কৃতজ্ঞ বোধ করলাম।

"চলো, বিন লাদেনের বডিটা আরেকবার চেক করি, যদি কিছু মিস করে থাকি আমরা," টম বললো।

আমরা এগোতে ওয়াল্ট একটু সরে দাঁড়ালো। বডি ব্যাগটা খুলে আবারো শরীরটা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে চেক করতে লাগলাম। প্যান্টের পকেট থেকে শুরু করে সব জায়গা দেখছি, যদি কাজের কিছু পাওয়া যায়। যেমন ডায়েরি, ফোন নম্বর বা ঠিকানা লেখা কোন লিস্ট বা কাগজ এসব আর কি।

আমরা যখন বিন লাদেনের বডি সার্চ করছি হঠাৎ দেখলাম ক্রু চিফ এদিকে তাকিয়ে আছে। সে একবার লাদেনর মুখে লাইট মেরে চেহারাটা দেখলো। তার চোখে মুখে ফুটে উঠলো একটা গর্বের ভাব। এই মিশনের অংশ হতে পেরে সেও গর্বিত। এই লোক দুজন যথেষ্ট করেছে। সরাসরি মিশনে না থাকলেও এরা নর্থ ক্যারোলিনায় প্র্যাকটিসে ছিল, আমাদের নিয়ে এসেছে, বিন লাদেনের প্রতিবেশি পাকিস্তানিদের সাথে নেগোশিয়েট করেছে, এখন আবার আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে চলেছে। কাজেই এই আনন্দের ভাগ ওদেরও সমান প্রাপ্য, আমাদের মতো।

আমরা সার্চ করে কিছু না পেয়ে আবারো সিটে গিয়ে বসে পড়লাম। মনে মনে ভাবতে লাগলাম একঘণ্টা আগে কি হতে চলেছিল। আমার মনে হচ্ছিলো, আমি চপার ক্র্যাশেই মারা যাবো। ব্যাপারটা আজ আমার অস্তিত্বকে বিরাট নাড়া দিয়ে গেছে। আমি আমার নিজের ভেতরের সমস্ত নিয়ন্ত্রন যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম।

যাক শুরুতেই এতোবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটার পরেও আমরা মিশনটা ভালোভাবেই শেষ করতে পেরেছি। এটাই বড় প্রাপ্তি। তবে সময় অনেক বেশি লেগেছে। এই ব্যাপারটা মাথায় আসছে এ কারণে যে, আমরা সবাই পারফেকশানিস্ট এবং আমরা নিজেরাই নিজেদের সবচেয়ে বড় সমালোচক।

আমি এইরকমই আকাশ-পাতাল ভাবছি এমন সময় টুমের গলা যেনো কানে মধুবর্ষন করলো।

"আমরা আফগান এলাকায় প্রবেশ করেছি।"

আরো মিনিট পনেরো পর আমি জালালাবাদের আলো দেখতে পেলাম। আমাদের চপার ল্যান্ড করলো হ্যাঙ্গারের বাইরে। এখানে আলোর কোন অভাব নেই। আমাদের জন্যে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। লাদেনের বডি বহন করার জন্যে এসেছে একটা ট্রাক এবং সেই সাথে আর্মি রেঞ্জারদের তিনটে জিপ। ওদের দায়িত্ব বডিটা সাবধানে বহন করে বাগরামে পৌঁছানো।

এই সোলজারদের দায়িত্বে আছে একজন সার্জেন্ট। আমি এখানে ডিউটি দেয়ার সময়ে, আমরা প্রায়ই ক্যান্টিনে বসে আড্ডা মারতাম। আমাদের মধ্যে খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল।

কিন্তু ওরা এগিয়ে এসে বডি ব্যাগটা ধরতেই ওয়াল্ট ধমকে উঠলো। এটা এখনো আমাদের কাজ। আমরা এই মিশনের জন্যে অনেক কষ্ট করেছি। কাজেই এই বডি বহনের সম্মানটুকু আমাদেরই প্রাপ্য।

আমি, টম আর ওয়াল্ট মিলে বডি ব্যাগটা সাবধানে চপার থেকে নামিয়ে ট্রাকের দিকে নিয়ে চললাম। বডি ব্যাগটা রেখে নেমে এসে দেখি দ্বিতীয় চপারটা চলে এসেছে। দুটো চপার থেকেই সবাই নেমে আসছে।

আমার কাঁধ থেকে যেন মস্ত এক বোঝা নেমে গেলো।

যাক সবাই নিরাপদে ফিরে আসতে পেরেছে।

সার্জেন্ট এগিয়ে এসে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো।

"তুমি সারাজীবনের জন্যে আমি এবং আমার ছেলের কাছে হিরোর মর্যাদা পাবে। কংগ্রাচুলেশানস।"

সার্জেন্টের কথাগুলো যেন শরীরে শান্তির পরশ বুলিয়ে দিল। মনে বাজতে লাগলো একটাই কথা :

"আমরা পেরেছি।"

কনফার্মেশান

হ্যাঙ্গারের ভেতরেই আমাদের দেখা হলো অ্যাডমিলার ম্যাকর্যাভেনের সাথে।

দরজার কাছেই উনি পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের বর্ডার ক্রশ করার খবর রেডিওতে শুনেই অপারেশান হেডকোয়ার্টার থেকে রওনা দিয়েছিলেন উনি।

ট্রাকের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। নিশ্চয়ই উনিও লাশটা দেখার জন্যে অস্থির হয়ে আছেন।

"আমি বডিটা দেখতে চাই," বেশ গম্ভীর মুখেই বললেন উনি কথাটা।

"নিশ্চয়ই স্যার," বলে আমি আবার টেইল গেটটা নামিয়ে দিলাম। ট্রাকের উপরে উঠে ব্যাগটা টেনে নিচে নামিয়ে আনলাম আমি। তারপর হাটু গেড়ে বসে টেনে দিলাম ব্যাগের মুখের দিককার চেইনটা।

বিন লাদেনের লাশ এর মধ্যেই রঙ হারাতে শুরু করেছে। মুখটা দেখাচ্ছে একদম ধূসর ফ্যাকাশে। ব্যাগের নিচের অংশে চটচটে রক্তের পুকুর।

"বিন লাদেন," আমি মৃদু স্বরে বললাম।

ম্যাক র্যাভেন তার ইউনিফর্মের দুটো বোতাম খুলে গলাটা আলগা করে নিলেন। অত্যন্ত মনোযোগের সাথে উনি দেখছেন লাশটা। আমি বিন লাদেনের মুখটা ধরে দুইপাশে ঘুরিয়ে দেখালাম যাতে সবাই ভালোভাবে দেখতে পারে।

"আমি নিশ্চিত সে তার চুল আর দাড়ি রঙ করেছিলো। আমি তার বাথরুমে কলপের প্যাকেটও দেখেছি। এই কারণে আমরা যা আশা করেছি, তার থেকে তাকে অনেক কম বয়স্ক লাগছে।" আমি তার

অনেকেই এসে ভিড় করেছে চারপাশে। হ্যাঙ্গারের লোকজন তো আছেই আমাদের অপারেশনের অনেক অ্যাসল্টারারও তাকে এখনো দেখে নি। অনেকেই হাটু গেড়ে বসে দেখছে।

"হুঁ..ম। তার উচ্চতা ছয় ফিট চার ইঞ্চি," ম্যাকর্যাভেন বডিটা জরিপ করতে করতে বললেন। তারপর লম্বা একজন নেভি সিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই তুমি, তোমার হাইট কত?"

"ছয় ফিট চার," লোকটা জবাব দিলো।

"তুমি একটু কষ্ট করে লাশটার পাশে লম্বা হয়ে শোবে, প্লিজ।"

"অবশ্যই, স্যার।"

লোকটা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো।

ম্যাকর্যাভেন সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা নাড়লো। "ওকে, প্লিজ উঠে দাঁড়াও। ধন্যবাদ।"

এই মাপ দেয়া ব্যাপারটা আসলে অনেকটা দুষ্টোমির মতোই। তবে আমি বেশ ভালোই বুঝতে পারছিলাম ম্যাকরাভেনের মাথায় কি চলছে। আমি যখন প্রথমবার লাদেনের বডি থার্ড ডেকে দেখেছিলাম, আমারও একই অনুভূতি হয়েছিলো। কারণ লাদেনকে আমরা যেমনটা আশা করেছিলাম তার থেকে খানিকটা ভিন্ন দেখাচ্ছিলো। সেটা কলপের কারণে বা অন্য যেকোনো কারণেই হোক।

হঠাৎ হ্যাঙ্গারের দরজায় আমার চোখ পড়লো জেনের দিকে। ও লাইটের ঠিক নিচেই দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে লাগছে ফ্যাকাশে আর ক্লান্ত। আলিও ওকে দেখেছে এবং দেখতে পেয়ে ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে এগিয়ে গেল। আমি খুবই অবাক হয়ে দেখলাম ও আলিকে ধরে ভেঙে পড়লো কান্নায়। দুজন সিল ওকে ধরে লাশের কাছে নিয়ে এল।

এবারও আমার অবাক হবার পালা কারণ দুদিন আগে ক্যান্টিনে জেন আমাকে বলেছিলো ও বিন লাদেনের লাশ দেখতে চায় না। ও আমাকে ওইদিন বলেছিল, "আমার বিন লাদেনকে দেখার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। এটা আমার জব ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে পড়ে না।"

আমি অবাক হয়ে দামি ড্রেসআপ আর হাই হিল পরা জেনের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কারণ ও যে মানুষটাকে ট্র্যাক ডাউন করতে পাঁচটা বছর ব্যায় করেছে, তাকে ও দেখতে চায় না। এটা কিভাবে হয়? পরে বুঝলাম আসলে এটা ওর কাজ না। ওর সাথে লাদেনের সরাসরি কোন যুদ্ধ নেই। লাদেনের সাথে ওর যুদ্ধ ইন্টেলেকচুয়াল লেভেলে।

তবুও সেদিন ওকে আমি বলেছিলাম, "যদি আমরা তাকে ধরতে বা মারতে পারি তবে তোমার তাকে দেখা উচিত।"

এখন হ্যাঙ্গারে লাদেনের লাশের পাশে বসে কান্নারত জেনকে দেখতে দেখতে আমার সেই সব কথোপকথন মনে পড়ে গেল।

জেন কাছে এলো না। ও দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। ওর গাল বেয়ে গড়িয়ে নামছে অশ্রু। এই অশ্রু কিসের আমি জানি না। তবে জেনের অনুভূতিটা আমি বুঝতে পারি। আমাদের জন্যে ব্যাপারটা সহজ। কারণ আমরা মরা, লাশ, হত্যা এসব নিয়েই কাজ করি। কিন্তু জেন এসবে অভ্যস্ত নয়, ওর কাজ ইন্টেলেকচুয়াল লেভেলে। আর এই মানুষটাকে ও গত প্রায় অর্ধ দশক ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর এখন এই লোকটার লাশ এখানে। কাজেই ওর এই অশ্রু একধরনের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এটা হতে পারে স্বস্তির, রাগের, বেদনার, বা যেকোনো কিছুর।

আমি হাতের গ্লাভস জোড়া খুলে প্যান্টের পকেটে রেখে উঠে দাঁড়ালাম। রাইফেলটা হেলান দিয়ে রাখলাম একপাশে। এখন পুরো হ্যাঙ্গারে ভিড়। চারপাশ থেকে আরো অনেকেই আসছে বিন লাদেনকে দেখার জন্যে।

টেডি সবারশেষে হ্যাঙ্গারে ঢুকলো। সবার ভেতরে ওর মনই সবচেয়ে খারাপ। হয়তো ওর একটু অস্বস্তিও লাগছে, কারণ ওর চপারটাই ক্র্যাশ করেছে।

আমি ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে শক্ত করে ওকে জড়িয়ে ধরলাম

"টেডি, তুমি দারুণ কাজ করেছো।"

"হুমম, তাই নাকি?"

"আরে, মন খারাপ করো না।"

আসলে সত্যি কথা হল, আমি এখন যাই বলি না কেন টেডির মন মানবে না। তবে আমি কথাটা মন থেকেই বলছি। কারণ আমি জানি টেডি

আসলেই ভালো কাজ দেখিয়েছে। একটা সাধারন চপারকে ল্যান্ড করানোর চেয়ে একটা ক্র্যাশিং চপারকে ল্যান্ড করানো অনেক বেশি কঠিন। আর টেডি সেই কাজটাই করেছে। আমাদের কাউকে আহত না করে, ও চপারটাকে নামিয়ে এনেছে। এক হিসেবে বলতে গেলে টেডি আমাদের সবার জীবন বাঁচিয়েছে।

"কঠিন একটা কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু আমরা পেরেছি," কথাটা বলে ওয়াল্ট আমাকে জড়িয়ে ধরলো। এর পরের কয়েক মিনিট আমরা সবাই একে অপরকে অভিনন্দন জানালাম, জড়িয়ে ধরলাম। মিশনের বাইরে অনেকেই আমাদেরকে অভিনন্দন জানালো। এরপর শুরু হল ছবি তোলা। এককথায় বলতে গেলে ছবি তোলার বন্যা বয়ে গেল।

এসব আনন্দ শেষ হবার পর আমরা আবার কাজে ফিরে গেলাম। আমাদেরকে বাগরাম যেতে হবে, ওখানে একটা পুরো ইন্টেলিজেন্স প্রসেসিং সম্পন্ন হবে।

রেঞ্জাররা আবার বডি প্যাক করে ওদের মতো করে রওনা দিল। আর আমরা রওনা দিলাম প্লেনে করে। প্লেনটা ছোট। আমাদের জিনিসপত্র সব রাখার পর ওটাতে জায়গা খুব কমই আছে।

আমি প্লেনের সামনের দিকে একটা জায়গা পেয়ে বসে গেলাম। দেখি আমার কাছেই জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে জেন।

আমি খানিকটা এগিয়ে ওর পাশে বসলাম। আন্তরিক ভঙ্গিতে একটা হাত রাখলাম ওর কাঁধে।

"কি? কেমন লাগছে এখন?" এঞ্জিনের গর্জনের কারণে, কথাটা জিজ্ঞেস করতে

রীতিমতো চিৎকার করতে হল।

ও চুপচাপ মাথা নাড়লো শুধু। আবারো দেখি ওর গাল বেয়ে নেমে আসছে অশ্রুধারা। আমি আর কিছু না বলে সান্ত্বনার ভঙ্গিতে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম।

অল্প কিছুক্ষন পরেই বাগরাম ঘাঁটির লাইট দেখা গেলো। এক ঘণ্টারও কম একটা জার্নি, আমি ঘুমাতে না পারলেও রেস্ট নিলাম। কারণ আমাদের সামনে আরো অনেক কাজ বাকি।

প্লেন আমাদেরকে নিয়ে একদম হ্যাঙ্গারের ভেতরে চলে এলো। প্লেন থেকে হ্যাঙ্গারে নামতে আমাদেরকে ওয়েলকাম করলো এফবিআই এবং সিআইএ এক্সপার্টদের ছোট দুটো দল। আমরা বিন লাদেনের বাড়ি থেকে পাওয়া সবকিছু জমা দিলাম ওদের কাছে। ওরা গম্ভীর মুখে জিনিসগুলো নিয়ে চেক করা শুরু করলো।

হ্যাঙ্গারের এক কোনায় দেখলাম খাবার-দাবারের এলাহি আয়োজন, সেইসাথে মেশিনভর্তি সুস্বাদু কফি। আমরা শেষবার খেয়েছি প্রায় সাত ঘণ্টা হয়ে গেছে, কিন্তু কেউই খাবারের দিকে এগোল না। অনেক কাজ বাকি।

প্রথমেই আমরা আমাদের গিয়ারগুলো খুলতে লাগলাম। আমি ভেস্টটা নামিয়ে পাউচটা খুলতে যেতেই কাঁধের পেছন দিকে একটা ব্যাথা অনুভব করলাম। শার্ট খুলে ব্যাথার জায়গাটা দেখার চেষ্টা করেও পারলাম না। ওয়াল্টের কাছে জানতে চাইলাম, "এই যে ওয়াল্ট, দেখো তো, এখানে কি হয়েছে?"

ওয়াল্টও নিজের গিয়ার খুলছিলো। ও দেখতে দেখতে বললো, "তেমন কিছু না, মনে হয় কোনো গুলির টুকরো এসে লেগেছিল। তবে সেলাই লাগবে না। ওষুধ লাগালেই ঠিক হয়ে যাবে,"

আমারও তাই মনে হলো। আল-কুয়েতি যখন গুলি করছিলো তখন একবার কোথায় যেন ব্যাথা লেগেছিলো সামান্য। উত্তেজনার চোটে পরে আর খেয়াল করি নি। এটাই হবে হয়তো। ভাগ্যিস গলা বা ঘাড়ে ঢোকে নি।

প্রথমেই আমরা আমাদের সব ধরনের গিয়ার খুলে গিয়ার ডিপার্মেন্টের একজনের দায়িত্বে দিয়ে দিলাম। সে নাম মিলিয়ে মিলিয়ে নিয়ে গেলো। তারপর আমরা লাদেনের বাড়ি থেকে যে যা কালেক্ট করেছি তা সামনে নিয়ে একটা টেবিলের বসলাম। আমাদের সাথে বসলো সিআইএ আর এফবিআই এক্সপার্টরা। আমি আমার কালেক্ট করা ছোট কালেকশানটা বের করলাম। ক্যাসেট, কাগজ আর ড্রেসার থেকে নেয়া ড্রেস আর র‍্যাক শেলফ থেকে নেয়া অস্ত্র রাখলাম টেবিলে।

তারপর হোয়াইট বোর্ডে ডায়াগ্রাম এঁকে আমরা বুঝিয়ে দিতে লাগলাম লাদেনের বাড়ির ভেতরের সমস্ত কন্ডিশান এবং আমরা কোথায় কিভাবে গোটা অপারেশনটা চালিয়েছি।

সবার শেষে আমি আর সেই নেভি সিল দুজনার ক্যামেরা বের করে ছবি দেখাতে লাগলাম। যেহেতু লাদেনের লাশটা ঠিকভাবে এসে পৌছেছে, কাজেই এই ছবিগুলোর আর তেমন একটা গুরুত্ব নেই। তবুও যেহেতু তুলেছি সেটাকে প্রদর্শন করাই নিয়ম। আমি ছবি দেখাতে দেখাতে একজনের কাছে জানতে চাইলাম, "কেমন উঠেছে ছবিগুলো?"

"পরিস্কার এসেছে সেটাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট," একজন প্রফেশনালের প্রফেশনাল জবাব।

আমি জানি না এই ছবিগুলো কোনোদিন জনসাধারণের কাছে পৌছাবে কিনা। আসলে সে ব্যাপারে আমার কোনো চিন্তাও নেই। আর ওটা আমার চিন্তার ক্ষেত্রও নয়।

আমি আমার পাশেই একজন টিমমেটের কথা শুনতে পেলাম। সে সিআইএ অপারেটিভকে বলছে, "সরি বাডি.. ওখানে আরো অনেক কিছুই ছিলো, কিন্তু আমরা সময়ের অভাবে আনতে পারি নি।"

সিআইএ অ্যানালিস্ট আমার টিমমেটের কথা শুনে হেসে ফেললো।

"কোনো চিন্তা নেই। আপনারা যা এনেছেন তা নিয়ে গবেষণা করতেই আমাদের জান বেরিয়ে যাবে। আর কত? এই লোকটা আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে আমরা এর মধ্যেই দশ

বছরেরও বেশি সময় কাটিয়ে দিয়েছি।”

আরেকদিকে তাকিয়ে দেখলাম এক্সপার্টরা আমাদের জমা দেয়া ডিএনএ স্যাম্পলের সাথে সাথে বিন লাদেনের বড়ি থেকেও ডিএনএ স্যাম্পল কালেক্ট করছে।

আমি আমার অস্ত্রশস্ত্র খুলে জমা দিতে লাগলাম। হেকলার অ্যান্ড কচ থেকে শুরু করে সব বুঝিয়ে দিলাম। ওগুলো বয়ে বেড়ানোর কোনো মানে হয় না।

আমি কাজ শেষ করতে করতে আলি আর জেন চলে এলো। এগিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো জেন।

ও কিছুক্ষণের মধ্যেই আমেরিকায় রওনা হচ্ছে, তাই বিদায় জানাতে এসেছে।

“আমি জানি না আবার কবে কোথায়, তোমাদের সবার সাথে দেখা হবে, ভালো থেকো।” বলে ও বিদায় নিয়ে চলে গেলো।

বেচারি কয়েক বছর ধরে তো বটেই, এই কেসটা নিয়ে সে গত কয়েক মাস ধরে টানা কাজ করে গেছে। তাই তার ক্লান্তির পরিমাণটা, আমাদের কারো চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। আমি নিশ্চিত সে আমেরিকা পৌছেই লম্বা একটা ছুটি নেবে।

গিয়ার প্যাক হওয়া মাত্রই আমরা খাবার টেবিলের দিকে এগোলাম। খাওয়া সবে মাত্র শুরু করেছি, এমন সময় হ্যাঙ্গারের কোণায় রাখা বড় টিভিটা আমাদের দিকে ফেরানো হলো। প্রেসিডেন্ট ওবামা টিভিতে ভাষণ দেবেন। এই ব্যাপারটা ঘোষণা করবেন আর কি। নির্দ্বিধায় একটা বিরাট সম্মানের ব্যাপার কিন্তু আমার মাথায় একটা টেনশন কাজ করলো। আমরা সবাই জানি এই অপারেশনের কোনো কিছুই গোপন থাকবে না। সবই ধীরে ধীরে বের হবে। তবে আমরা এর আগে একটু সময় পেলে ভালো হতো।

ঠিক ৯:৪৫ ইস্টার্ন টাইমে হোয়াইট হাউস ঘোষণা করলো, যে প্রেসিডেন্ট ওমাবা জনগনের উদ্দেশ্যে কথা বলবেন। কিন্তু খবর ফাঁস হয়ে গেলো এর ভেতরেই। দশটার কিছু সময় পরেই ১০:৩০-এর দিকে নেভির একজন ইন্টেলিজেন্স অফিসার কিথ আরবান টুইটারে সারা দুনিয়ার কাছে ফাঁস করে দিলেন ওসামা বিন লাদেন নিহত হয়েছে। এরপর ১১:৩৫-এ প্রেসিডেন্ট ওবামা টিভিতে এলেন। উনি প্রথমে লম্বা হলওয়ে ধরে হেটে এসে ডায়াসের পেছনে দাঁড়িয়ে শুরু করলেন, “গুড ইভনিং টুনাইট। আমি আমেরিকার নাগরিকসহ সারা বিশ্বের মানুষদেরকে বলতে চাই আলকায়েদা নামক সন্ত্রাসী সংঠনের নেতা এবং অসংখ্য নিরীহ মানুষের হত্যাকারী ওসামা বিন লাদেন এক অপারেশনে নিহত হয়েছে।”

আমরা সবাই চুপচাপ শুনে গেলাম।

ওবামা মিলিটারিদের ধন্যবাদ দিলেন এই অপারেশন সুন্দরভাবে পরিচালনার মাধ্যমে আমেরিকার নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে।

“আমরা সন্ত্রাসী হামলা প্রতিহত করার জন্যে আমাদের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি নিশ্চিত করেছি। পতন ঘটিয়েছি আফগানিস্তানে আল-কায়েদার মদদপুষ্ট তালেবান বাহিনীর সরকারের। সারা বিশ্বব্যাপী আল-কায়েদার সন্ত্রাসী কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট, বিশেষ করে ৯/১১ হামলার সাথে সংযুক্ত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার এবং শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করেছি।

ওবামা বলে চলেছেন।

তারপর উনি সংক্ষিপ্তভাবে বললেন কিভাবে বিন লাদেনকে ট্র্যাকডাউন করা হয়েছে লিওন প্যানেট্টার বাহিনীর নেতৃত্বে। সেই সাথে বললেন, “অবশেষে আজকে আমার নির্দেশে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে লুকিয়ে থাকা লাদেনের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করা হয়। এতে কোন আমেরিকান নাগরিক বা কোন সাধারন মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হয় নি। অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে অভিযান পরিচালনা করে আমাদের কমান্ডোরা বিন লাদেনকে হত্যা করে, তার বডি নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে আসে।”

আমরা এখানে যারা আছি, কেউই সত্যিকার অর্থে সেইভাবে ওবামার ভক্ত নই। তবে তাকে আমরা পছন্দ করি এবং আমাদের এই অভিযানের অনুমতি দেয়ার জন্য, তার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞও।

“শালা তো ব্যাপক সিস্টেমে কথা বলছে, দেখেছো, ” ওয়াল্ট বললো। আমি হেসে বললাম, “তুমি তার জায়গায় হলে কি করতে? উনি যা করছেন ঠিকই আছে।”

আসলেও তাই, আমরা খেলার ইন্সট্রুমেন্ট মাত্র, আসল খোলোয়াড় তো তারাই। কাজেই খেলাটা তারা যেভাবে খেলবেন আমাদেরকেও সেটাই মেনে নিতে হবে। আমরা আমাদের কাজ করেছি বাকিটা তাদের দায়িত্ব।

ওবামা আমাদের মিশনটাকে বললেন, “আজকের দিনটি আমাদের জাতির জন্যে আল-কায়েদাকে পরাজিত করার একটি দিন।” বলে অপারেশন ফোর্সকে তাদের আত্মত্যাগের জন্যে ধন্যবাদ জানালেন।

আমি ওয়াল্টকে বললাম, “দেখো, ম্যাকর‍্যাভেন খুব দ্রুতই প্রমোশন পেয়ে যাবে। বলা যায় না একদিন সিইও হয়ে যেতে পারে।”

ওবামা আমাদের কথা এভাবে বললেন “আমেরিকান জনগণ এইসব সাহসী কমান্ডোদের কাজ সরাসরি দেখে নি, বা তাদের নামও জানে না। কিন্তু এরা আছে বলেই আমেরিকা আজ নিরাপদ এবং গর্বিত।”

যাক ভালোই হল, প্রেসিডেন্ট সরাসরি আমাদের নাম বলেন নি। আমাদের নাম যতো পরে ফাঁস হয় ততোই ভালো।

“যথেষ্ট শুনেছি, চলো কিছু খাই তারপর একটা দারুণ শাওয়ার নিতে হবে,” আমি ওয়াল্টকে কথাটা বলে ঘুরে দাঁড়ালাম। "

আমার ব্যাকপ্যাকটা খুঁজে পেয়ে চেক করে নিলাম, ওতে সিভিলিয়ান পোশাকগুলো আছে কিনা। তারপর বাসে করে জেএসওসি কম্পাউন্ডে ফেরার জন্যে রওনা দিলাম।একে একে সবাই আসতে লাগলো। কয়েক ঘণ্টা পর ভার্জিনিয়া বিচে ফেরার আগে সবাই খেয়ে দেয়ে শাওয়ার নিয়ে ফ্রেশ হতে চাইছে।

জেএসওসি কম্পাউন্ডে ডেভগ্রু’র ছোট একটা অংশ আছে। আমরা আমাদের কাজ সারার জন্যে রওনা দিলাম ওখানে। আমাদের জিনিসপত্র

সব আগেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বাড়ি ফেরার জন্যে আমাদের ফ্লাইট কয়েক ঘণ্টা ডিলে করলো। তাই আমরা আমাদের মতো করে সময় কাটাতে লাগলাম। ওখানে ডেভগ্রু’র ওয়ার্কশপের একপাশে ওরা জায়গা বের করে ব্রিক পিজ্জা অ্যাভন আর গ্যাস গ্রিলের ব্যবস্থা করেছে। আমরা ওদিকে এগোতে ওখানকার সিলেরা আমাদের রীতিমতো দু'হাত বাড়িয়ে ওয়েলকাম করলো। আমরাও বেশ রিলাক্স মুডে লাউঞ্জটাতে গিয়ে বসলাম। আমাদের জন্যে ওখানকার এনআরএ এক বাক্স দামি সিগার পাঠিয়েছে। অত্যন্ত সম্মানের সাথে নিলাম ওগুলো।

আমাদের সাথে সবাই আছে শুধু জে, মাইক আর টম বাদে। ওরা এখনো অ্যাডমিরালা ম্যাকর‍্যাভেনের সাথে মিটিং করছে।

ওখানে আমাদের সময়টা খেয়ে দেয়ে দামি সিগার ফুঁকে বেশ ভালোই কাটলো। ওরা আমাদেরকে স্টেক আর লবস্টার গ্রিল করে খাওয়ালো।

এমন সময় কে যেনো একজন এসে ঘোষণা করলো ব্যাপারটা লিক হয়ে গেছে। এরমধ্যেই মিডিয়াতে এসে গেছে, যে এই অপারেশন চালিয়েছে নেভি সিলেরা। তারপর জানা গেল যে ডিটেইল সবই মানুষের জানা হয়ে গেছে। এমনকি ভার্জিনিয়া বিচের সিলেরা এই মিশন চালিয়েছে এটাও এখন সবাই জানে।

তারপর নিউজে আমরা সবই দেখতে পেলাম। এত কষ্ট করে চাপা রাখা খবরটা কত সহজেই না বেরিয়ে গেল। টিভি ফুটেজে দেখা গেলো গ্রাউন্ড জিরো, হোয়াইট হাউস, পেন্টাগনের সামনে সাধারণ মানুষের ভিড়। ফিলাডেলফিয়া বেসবল লিগের ওরা মিছিল বের করেছে। ছোটো ছোটো বাচ্চারা যারা ৯/১১-এর আগে জন্মায় নি ওরাও মিছিলে অংশ গ্রহন করছে।

এতোসবের মাঝে আমি ভাবছিলাম আমার বাড়ির লোকেরা এই নিউজ দেখে কি ভাববে।

ওরা এমনকি জানেও না আমি আফগানিস্তানে। আমি বাড়িতে শুধু বলেছি ট্রেনিংয়ের জন্যে শহরের বাইরে যাচ্ছি, আমার সেলফোন বন্ধ থাকবে। আমি নিশ্চিত ওরা এখন সমানে আমার মোবাইলে ট্রাই করছে।

প্লেন এলো আরো কিছুক্ষন পর। আমরা ওখানে বসেই সময় কাটিয়ে দিলাম। আমার মাথায় ঘুম বাদে আর কোন শব্দই খেলছে না। প্লেন আসার পর প্রথমে আমাদের জিনিসপত্র উঠলো, তারপর ধীরে ধীরে আমরা উঠে গেলাম।

কয়েকজন ক্রু বাদে পুরো প্লেনই ফাঁকা।

আমরা ওঠার পর প্লেন টেকঅফ করার সাথে সাথে, চিফ ক্রু'র গলা শোনা গেলো মাইকে।

"শোনো, আমরা জার্মানিতে থামছি না, একটা এয়ারবোর্ন থেকে অনরুটেই আমরা রিফুয়েলিং করে নেবো। কাজেই তোমরা নিশ্চিন্তে ঘুমাও।"

ওরা আসলে বুঝতে পেরেছে আমরা কতোটা ক্লান্ত তাই এই ব্যবস্থা করেছে। জার্মানিতে না থামলে আমরা সরাসরি আমেরিকাতে ফিরতে পারবো। বেশ লম্বা ভ্রমণ। এখন শুধু একটাই চিন্তা ঘুমাতে হবে।

প্লেন সোজা রওনা দিলো পশ্চিম দিকে।

আমার মাথায় আর কিছুই খেলছে না। মিডিয়া, রাজনীতি, পরিবার, সবকিছু মাথা থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করে দিয়ে আমি দুটো অ্যামবিয়েন খেলাম তারপর প্লেন আফগান বর্ডার পার হবার আগেই নিশ্চিন্তে ডুবে গেলাম গভীর ঘুমে।

জাদুর স্পর্শ

আমার ফোনটা ঘরঘর শব্দে ভাইব্রেট করছে, বিপ্ করছে প্রচুর ইনকামিং মেসেজের জানান দিয়ে।

আমাদের বিমানটি ভার্জিনিয়া বিচে ল্যান্ড করার পর পরই প্রত্যেকে তাদের মোবাইলফোন অন করে নেয়। আর তারপর থেকেই শুরু হয় বিরামহীন রিং আর বিপের শব্দ। আমি আমার ফোনটা পাশেই রেখেছিলাম, ওটা যেনো গরম কড়াইয়ের উপর ফুটতে থাকা পপকর্নের মতো লাফাতে শুরু করে।

আমরা যখন উড়োজাহাজে করে আটলান্টিক পাড়ি দিচ্ছিলাম তখনই সারা বিশ্বের টিভি আর ওয়েবে আমাদের অভিযানের খবরটি প্রচারিত হতে শুরু করে। ভার্জিনিয়া বিচে রিপোর্টারের দল হুমড়ি খেয়ে পড়ে সত্যিকারের নেভি সিলদের ইন্টারভিউ নেবার জন্য। ওয়াশিংটনের ক্যাপিটল হিল আর পেন্টাগনের অনেকেই খবরটা ছড়িয়ে দিতে শুরু করেছে ততোক্ষণে। এমন কি, কারো কাছে হয়তো সামান্য একটু খবর ছিলো সেটাও তারা প্রকাশ করে দেয়।

অবশেষে আমার ফোনটা যখন ভাইব্রেট করা থামালো, আমি স্ক্রল করে মেসেজগুলো দেখে নিলাম। কেউ জানে না আমি এই অভিযানে অংশ নিয়েছি। কিন্তু যারা জানে আমি একজন সিল, তারা প্রায় সবাই আমার সাথে যোগাযোগ করে ঘটনা সম্পর্কে জানার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলো। আমি আমার পরিবার আর বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে মেসেজ পাচ্ছিলাম।

তাদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলো যাদের আমার সাথে দীর্ঘদিন ধরে কোনো যোগাযোগই ছিলো না। সবার মেসেজে একটাই বক্তব্য :

"ঘটনা কি? খবর দেখলাম। তুমি এখন কোথায়?"

এই অভিযানটি এতোটাই টপ সিক্রেট ছিলো যে আমরা এমনকি নিজেদের ইউনিটের লোকজনকেও কিছু বলি নি। কিন্তু এখন, আমার একাউন্টে একশ' ই-মেইল, পঞ্চাশটি ভয়েস মেইল আর তিন ডজন টেক্সট মেসেজ আমাকে জিজ্ঞেস করছে আমি কি এ মুহূর্তে পাকিস্তানে আছি? কিংবা ঐ ঘটনা সম্পর্কে কি জানি।

আমার পরিবার শুধু জানতে চেয়েছিলো আমি নিরাপদে আছি কিনা। আমাদের প্লেনটা থামতে না থামতেই স্কোয়াডের পুরনো কমান্ডার ক্রু ডোরটা খুলে উঠে পড়লেন। ডেভগ্রু'র কমান্ড নেবার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন তিনি।

এই মিশনের জন্যে কমান্ড বদল করার সময়টা একটু পিছিয়ে দেয়া হয়েছিলো, তাই আমাদের সঙ্গে তিনি আফগানিস্তানে থাকতে পারেন নি। আমি যাদের অধীনে কাজ করেছি তার মধ্যে তিনি ছিলেন সবচাইতে সেরা লিডার। সব ছেলেরাই তাকে ভীষণ ভালোবাসতো। তিনিও আমাদের প্রতি ছিলেন যথেষ্ট সহমর্মি।

আমরা যখন আমাদের ব্যাকপ্যাক তুলে নিতে যাচ্ছি, তখন তিনি নিজ থেকে এগিয়ে এসে সবার সাথে হাত মেলান। সবার আগে আমাদেরকে স্বাগত জানাতে চাইছিলেন তিনি। আমরা তখনও অ্যাম্বিয়েনের প্রভাবে ঢুলুঢুলু করছি। সুতরাং তার ছিপছিপে লম্বা দেহ আর মাথার টাক দেখে আমাদের কাছে বাস্তব বলে মনে হয় নি। মনে হচ্ছিলো আমরা বুঝি পরাবাস্তব কোনো জগতে আছি। দেশে আমাদেরকে কতোটা বিপুলভাবে স্বাগত জানানো হবে এটা ছিলো তার প্রথম ইঙ্গিত।

প্লেন থেকে নামার পর ওটার এঞ্জিনের শব্দে অন্য কিছু কানে এলো না। বাইরে তখন ঘন অন্ধকার। আলোকিত কেবিন থেকে এরকম অন্ধকারে আসার ফলে চোখে তেমন কিছু দেখছিলাম না। কয়েক সেকেন্ড পুর দু'চোখে যখন অন্ধকার সয়ে এলো, তখন দেখতে পেলাম আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে আমার

দশ' টিমমেট।। পঞ্চাশ গজ দূরেই ছিলো বাসগুলো কিন্তু সেখানে যেতেই কমপক্ষে একশ' জনের সাথে হাত মেলাতে হলো আমাকে। তারা প্রত্যেকেই যেনো আমাদেরকে ঈর্ষা করছে। এরকম অভিযানে অংশ নিতে না পারার আক্ষেপও হয়তো ছিলো তাদের মাঝে। নিজেকে আমার খুব সৌভাগ্যবান মনে হলো।

বাসের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় আমি খুব বেশি কথা বলতে পারলাম না। তাদের অভ্যর্থনার জবাবে ধন্যবাদ জানানো কিংবা হাইহ্যালো করাও হলো না। বাসে ওঠার পর যারপরনাই ক্লান্ত বোধ করলাম আমরা, সেই সাথে উচ্ছ্বসিতও বটেও।

কপাল ভালো যে, বাসের মধ্যে ঠাণ্ডা বিয়ার আর গরম গরম পিৎজ্জা ছিলো। আমি চুপচাপ নিজের সিটে বসে, ব্যাকপ্যাকটা দু'পায়ের ফাঁকে আটকে রেখে বিয়ার আর পিজ্জা খেলাম। বাসের ভেতরে তাকালাম। প্রায় সবাই ফোনের মেসেজ চেক করে দেখেছে। আনুমাণিক চব্বিশ ঘণ্টা আগে প্রেসিডেন্ট ওবামা জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন আমাদের এই অভিযানটি নিয়ে।

এই প্রথমবার ব্যাপারটা পুরোপুরি বোধগম্য হলো আমার। দারুণ একটি অভিযান ছিলো। শৈশবে আলাস্কায় থাকাকালীন মিশনের যেসব গল্প পড়াতাম এটা ছিলো ঠিক সেরকমই একটি মিশন। ঐতিহাসিক একটি ব্যাপার। কিন্তু চিন্তাটা আমার মথায় আসতেই ঝেটিয়ে বিদায় করে দিলাম। যখনই নিজের কাজ নিয়ে এরকম উচ্ছ্বসিত হবে তখনই বুঝবে তুমি শেষ।

কমান্ডে ফিরে গিয়ে আমি এমনকি ভেতরেও যাই নি। আমাদের গিয়ার আর অস্ত্রশস্ত্র আমাদের স্টোরেজ বে'তে লক করে রেখে দিলাম। সবকিছু আনলোড করার কোনো দরকার ছিলো না। ফিরে আসার পর আমাদের সবাইকে বেশ ক'দিনের জন্য কাজ থেকে ছুটি দেয়া হয়। আমি আমার সিভিলিয়ান ব্যাকপ্যাকটা নিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে এলাম বাড়িতে। বাইরে গিয়ে হৈহুল্লোড় করা কিংবা বারে গিয়ে মদ খেয়ে উদযাপন করতে চাই নি আমি। শুধু চেয়েছিলাম একটু নিরিবিলিতে থাকতে। যে অভ্যর্থনা পেয়েছি সেটা যথেষ্ট প্রেরণাদায়ক ছিলো।

নিজের ঘরে ফিরে এসে স্নান করে নিলাম। একটানা ঊনিশ ঘণ্টা ঘুমিয়েছিলাম আমি। তাই কেমন জানি ঢুলু ঢুলু লাগছিলো। টিভিতে তখনও আমাদের মিশন নিয়ে সংবাদ প্রচারিত হচ্ছিলো, প্রায় সব চ্যানেলেই। তবে এগুলোর বেশিরভাগই অনুমাণ নির্ভর।

তারা বলছে চল্লিশ মিনিট ধরে নাকি গোলাগুলি হয়েছে।

এরপর জানতে পারলাম কম্পাউন্ডের বাইরে নাকি আমাদের উপর গুলি করা হয়েছিলো।

আরো আছে। বিন লাদেনকে গুলি করার আগে তার কাছে নাকি একটা অস্ত্র ছিলো, আর সেই অস্ত্রটা দিয়ে মৃত্যুর আগে সে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করেছে।

তারচেয়েও বড় কথা, রিপোর্ট বলছে গুলি খেয়ে মারা যাবার সময় বিন লাদেন আমাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েছিলো। বুঝতে পেরেছিলো আমেরিকানরা তাকে হত্যা করছে।

আমাদের অভিযানটাকে এমনভাবে চিত্রিত করা হচ্ছে যেনো সেটা কোনো বাজে অ্যাকশন সিনেমা। প্রথম দিকে এটা খুবই হাস্যকর বলে মনে হয়েছিলো কারণ এসব একদম ভুল।

এরপরই কম্পাউন্ডের বেশ কয়েকটি ছবি পর্দায় দেখা গেলো। কয়েক সপ্তাহ ধরে এই ছবিগুলো ছিলো টপ সিক্রেট আর এখন এগুলো সারাবিশ্বের সংবাদ মাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে। হেলিকপ্টারের ধ্বংসাবশেষটাও দেখতে পেলাম। যদিও বোমা মেরে ওটা উড়িয়ে দেয়া হয়েছে তারপরও ওটার রোটর আর কিছু অংশ টিকে আছে। বিস্ফোরণের চোটে লেজটা ছিটকে গিয়ে পড়ে দেয়ালের বাইরে।

এমনকি সংবাদ সংস্থা রয়টার্স কম্পাউন্ডে নিহত অনেকের লাশের ছবিও প্রকাশ করলো। পর্দায় দেখতে পেলাম আল-কুয়েতির ভাই আর আবরারকে, যাদেরকে আমি আর উইল

গেস্টহাউসের দরজা দিয়ে গুলি করেছিলাম। বিন লাদেনের লাশটা যেখানে পড়েছিলো সে জায়গার ছবিও তারা দেখালো। চাক চাক রক্ত পড়ে আছে মেঝের কার্পেটে।

মাথা থেকে ওসব দৃশ্য দূর করতে কিছুটা বেগ পেতে হলো আমাকে।

প্রাইম-টাইম টেলিভিশনে এসব ছবি দেখাটা সুখকর ছিলো না। এটা আমাকে বার বার মনে করিয়ে দিতে লাগলো, আমি এসবের সাথে জড়িত ছিলাম। বাড়ি আর কর্মক্ষেত্রের মধ্যে আমার কোন বাধা থাকলো না এখন। দেশের বাইরে গিয়ে যেসব কাজ করতাম, সেগুলো মাথা থেকে খুব সহজেই দূর করতে পারতাম আমি। বাড়িতে ফিরে এলে ওসব নিয়ে একটুও ভাবতাম না। ওগুলো আমার মাথায় আসতোই না। কিন্তু এবার পরিস্থিতি একেবারেই ভিন্ন। নিজের ঘরে বসে এসব ছবি দেখাটা আমার জন্য সুখকর ছিলো না।

সে রাতে আমি ঘুমাতে পারছিলাম না। বেশ কয়েকটি অ্যাম্বিয়েন নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিলাম। ওগুলো ছাড়া আমার পক্ষে সে রাতে ঘুমানো অসম্ভব ছিলো।

পরের দু'দিন আমি পরিবার-পরিজন আর বন্ধুবান্ধবদের ফোন কলগুলো এড়িয়ে গেলাম। আমার ফোন বেজেই চললো। পরিবারের লোকজন জানতে চাইলো আমি ওই মিশনে ছিলাম কিনা। আমার বাবা-মা জানতেন আমি দেশের বাইরে ছিলাম, কিন্তু কোথায় ছিলাম সেটা জানতেন না।

বাড়ি থেকে চলে আসার সময় আমি তাদেরকে ফোন করে জানিয়েছিলাম, যে আমি আবার বেসে চলে যাচ্ছি একটা ট্রেনিং নিতে, সেখানে কোনো ফোন ব্যবহার করা যাবে না। আমি সব সময় তাদের কাছ থেকে এসব জিনিস লুকিয়ে রাখতাম। অভিযানে যাবার আগে আমার বোনদের ফোনে বেশ কয়েকটি টেক্সট মেসেজ পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলাম, তাদেরকে আমি অনেক ভালোবাসি। সে সময় তারা কিছুই বুঝতে পারে নি। কিন্তু পত্রপত্রিকা আর টিভিতে সংবাদগুলো প্রচারিত হবার পর তারা বুঝে যায় যে, আমি ওই অভিযানে ছিলাম।

বাড়ি ফিরে আসার পরদিন, আমি কিছু ময়লা-আবর্জনা পলিথিনে ভরে বাইরের ট্র্যাশবিনে ফেলতে গেলাম। আমার বাড়ির উল্টোদিকে যে বাড়িটা আছে, সেখানকার এক প্রতিবেশী মহিলা আমাকে দেখতে পেয়ে আমার কাছে চলে আসে। সে জানতো আমি নেভি সিল-এ আছি। এটাও জানতো বেশ কয়েকদিন ধরে আমি বাসায় ছিলাম না। মহিলা আমাকে জড়িয়ে ধরে শুভেচ্ছা জানালো।

"তুমি আসলেই জানো না তোমার প্রতিবেশীরা জীবিকার জন্যে কি করে, জানো কি?" হেসে বলেছিলো মহিলা, তারপরই চলে যায় নিজের ঘরে।

আমার টিমমেটদের একজন নিজের বাড়িতে ফিরতে না ফিরতেই বাচ্চার ডায়াপার বদলানোর কাজে নেমে পড়েছিল।

আমি বাড়িতে ঢুকতেই, আমার বউ আমার হাতে বাচ্চাটাকে তুলে দিলো," বেসে ফিরে আসার পর গল্প করতে করতে বলেছিলো সে। "আমরা সবেমাত্র ইউবিএল'কে হত্যা করে এসেছি। ভাবো, কোথায় একটু আরাম করে বসে বসে বিয়ার খাবো, তা না। বাচ্চার ডায়পার বদলে দিতো হলো।"

আরেকজনের কপালে জুটলো বাড়ির বাইরে লনের লম্বা লম্বা ঘাস কাটার কাজ। মিডিয়াতে হয়তো আমাদের কাজ নিয়ে ব্যাপক উচ্ছ্বাস আর উন্মাদনা চলছিলো কিন্তু নিজ বাড়িতে আমরা শুধুই অনেকদিন পর ফিরে আসা স্বামী কিংবা সন্তান। বেসে যোগ দেবার দু'দিন পর জে আমাদেরকে কনফারেন্স রুমে ডাকলেন। ঠিক এখানেই আমরা এই মিশনের ব্যাপারে প্রথম জানতে পেরেছিলাম। কমান্ডিং অফিসাররা আমাদের অভিযানের ব্যাপারে যে সমস্ত গোপন খবর প্রকাশ হয়ে পড়ছিলো সেসব নিয়ে দারুণ চিন্তিত ছিলো।

"সবাইকে মিডিয়া থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে," বললেন জে। "আমরা সবাই যেনো একটু লো প্রোফাইলে থাকি সেটা নিশ্চিত করতে হবে।"

আমি হতবাক। কয়েক সপ্তাহ ধরে আমরা এ ব্যাপারটা পুরোপুরি গোপন রেখে অভিযান

শেষ করেছি। আমাদের পক্ষ থেকে কোনো রকম বিচ্যুতি ঘটে নি। আর এখন ওয়াশিংটন সবকিছু ফাঁস করে দিয়ে আমাদেরকে এরকম লেকচার দিচ্ছে! মনে হচ্ছিলো আমাদের কারো কারোর নাম বুঝি খুব জলদিই সংবাদমাধ্যমে প্রচার হতে যাচ্ছে। এ বিশ্বের এক নাম্বার সন্ত্রাসীকে আমরা হত্যা করেছি। আমাদের কারোর নাম এর সঙ্গে যুক্ত থাকুক, আমাদের অংশগ্রহণের কথা জানাজানি হোক সেটা আমরা কোনোভাবেই চাই না। এসব প্রচারণা থেকে দূরে থেকে পুরো বিষয়টি ভুলে গিয়ে আবার কাজে ফিরে যেতে চাইছিলাম আমরা।

"এজন্যে আমরা ঠিক করেছি," বললেন জে, "তোমাদের সবাইকে এক সপ্তাহের ছুটি দেয়া হবে। এই যে তোমাদের শিডিউল।

"কিন্তু এটা তো সত্যিকারের কোনো ছুটি নয়, তাই তাই না?" বললো ওয়াল্ট।

বাকিদের ফিসফিসানি আমার কানে গেলো। "আসল শো'টা কখন শুরু হবে?" বললাম আমি।

"ডিফেন্স সেক্রেটারি খুব শিগগিরই এখানে আসবেন। কনফার্ম হলেই তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে। আপাতত ছুটিটা উপভোগ করতে থাকো।"

এবার আমি হেসে ফেললাম।

"আরে, সবাই চাইছে এই ম্যাজিকটা স্পর্শ করতে," কনফারেন্স রুম থেকে বের হতেই টম বললো।

মিশনটা খুব জটিল কিংবা কঠিন ছিলো না।

এই মিশনটার কয়েক সপ্তাহ পর আমাদের অভিযান নিয়ে এতো বিস্তারিত সব খবর প্রকাশ হতে লাগলো যে, নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে উঠলাম। আমাদের বেশিরভাগই হোম সিকিউরিটি সিস্টেম প্রবর্তন করলো। জোরদার করলো নিজেদের নিরাপত্তা।

সাপ্তাহিক মিটিংগুলোতে জে আর মাইকের কাছে আমাদের অনেকেই নিজেদের আশংকার কথা জানালো।

"আমাদের নাম যদি মিডিয়াতে প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে কি হবে?" বললাম আমি।

এবিসি নিউজের ক্রিস কুমো নামের এক রিপোর্টার হাস্যকর রকমের একটি সংবাদ পরিবেশন করলো। যে সিল সদস্য ওসামা বিন লাদেনকে গুলি করেছে তার সন্ধান নাকি তারা করতে পেরেছে। ঐ সিল সদস্য একজন শ্বেতাঙ্গ, বয়স ত্রিশের কোঠায়। দাড়ি আর লম্বা চুল আছে তার। এরপর কুমোর দেখাদেখি বাকিরাও একই ধরণের সংবাদ পরিবেশন করতে শুরু করে। তারা সিল সদস্যদের পিছু নিলো। এক্ষেত্রে ডেভগ্রু'র প্রতিষ্ঠাতা রিচার্ড মারচিঙ্কোকে পেয়ে গেলো তারা।

"তাদের পা দুটো খুবই ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন, দেহের উর্ধ্বাংশ অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তিশালী আর মানসিক দিক থেকে তাদের একটাই মন্ত্র 'আমি কোনোভাবেই ব্যর্থ হবো না," কুমোকে বলেছিলেন মারচিঙ্কো।

যে হাতে আমরা গুলি করি সেগুলো নাকি অনুভূতিশূন্য, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য ক্ষতের দাগ রয়েছে, ওগুলো তৈরি হয়েছে, আগের অভিযানের সময় শার্পনেইল লেগে। আমাদের অহংবোধ খুবই প্রকট—এইসব আলতু ফালতু কথা আর কি।

মারচিঙ্কো অনেক দিন ধরে সিলের সাথে জড়িত নন। তিনি আমাদের বর্তমান অবস্থা আর ট্রেনিংয়ের ব্যাপারগুলো সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানেন না।

"তারা আসলে এক একজন 'ইগোম্যানিয়াক,' একসঙ্গে তারা সঙ্গীত রচনা করে। তারা একে অন্যের উপর নির্ভরশীল হবার শিক্ষা পেয়ে থাকে।

তারা যখন একঘেয়েমিতে আক্রান্ত হয়, তখন একে অন্যের সাথে খুনসুটি করে সময় কাটায়। তা না হলে বিরাট সমস্যায় পড়ে যায় তারা," এবিসি'কে এসব আষাঢ়ের গল্প শুনিয়েছেন মারচিঙ্কো।

এসব শুনে হাসতে হাসতে আমাদের অবস্থা কাহিল হবার জোগাড় হলো। আমি জানি

ডেভগ্রু'র প্রতিষ্ঠাতা তিনি। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সাথে তার কোনো যোগাযোগ নেই। আমাদের ফোর্সের আধুনিকায়নের সাথে তিনি একদম অপরিচিত। যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন সেটা কোনো সিলের সাথেই খাপ খায় না। ইগোম্যানিয়াক' হওয়া থেকে অনেক আগেই আমরা বেরিয়ে এসেছি। শুধু সিল কেন, তার বর্ণনার সাথে কোনো সৈনিক, নাবিক, বিমানবাহিনীর সদস্য থেকে শুরু করে স্পেশাল ফোর্সের কারোর কেনো মিলই নেই। আমরা হলাম এমন একটি দল যারা সব সময় চেষ্টা করে সঠিক কাজটি সঠিক সময়ে করতে।

তবে এসব চাউর হওয়া তথ্য, আর নিরাপত্তা বিষয়ক উদ্বিগ্নতার জন্য আমাদেরকে মিটিংয়ে ডাকা হয় নি।

"এসব নিয়ে ভাবার কোনোই দরকার নেই, কারণ এটা কেউ জানে না," বললেন জে। "আগামীকাল কেন্টাকিতে তোমাদের সাথে প্রেসিডেন্ট দেখা করবেন।"

সব কিছু যেভাবে হচ্ছে তাতে করে এই ব্যাপারটা যে খুব শীঘ্রই ঘটবে তা আমরা জানতাম।

"আমরা সাদা পোশাকে প্লেনে উঠবো তারপর ওখানে গিয়ে ইউনিফর্ম পরে প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাত করবো," জে বললেন।

মিটিং শেষ হলে আমরা চলে এলাম। ট্রাকে করে যাবার সময় আমার ফোনটা বেজে উঠলো। আমার বোন মেসেজ পাঠিয়েছে

"শুনলাম আগামীকাল নাকি তোমরা প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করবে," বললো সে। "ভুলেও শর্ট পরে যেয়ো না। তাহলে ওরা তোমার ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন পা দুটো দেখে ফেলবে। তোমার বোঝা উচিত তুমি একজন সিল।"

এই হলো সিকিউরিটি! এই হলো গোপনীয়তা!

পরদিন সকালে আমাদেরকে সি-৩০ মডেলের পুরনো একটি বিমানে তোলা হলো। এরকম পুরনো বিমানে আমি জীবনেও চড়ি নি। বাইরের বডি সদ্য রঙ করা হয়েছে, উদ্দেশ্য এর আসল বয়স লুকানো। কিন্তু ভেতরে ঢুকেই সব স্পষ্ট হয়ে গেলো। ভেতরের সব কিছুই বিবর্ণ আর মলিন।

আমাদের মন খারাপ হয়ে গেলো। অন্তত সি-১৩০ কিংবা সি-১৭ মডেলের কোনো বিমান হলেও না হয় কথা ছিলো।

"আমাদের সদ্য পাওয়া রকস্টার স্ট্যাটাসের জন্যে একটু বেশিই হয়ে গেলো না?" নিজের সিটে বসতে বসতে বললো চার্লি। "মনে হয় আমাদের পনেরো মিনিটের খ্যাতিটা ফুরিয়ে গেছে।"

কিন্তু দরজার পাশে একটি প্লেক থেকে আসল গল্পটা জানতে পারলাম। এই প্লেনটা অপারেশন ঈগল ক্ল'তে ব্যবহৃত তিনটি এমসি-১৩০ই বিমানের একটি।

পুরনো বিমানের গুদামঘর থেকে এটাকে খুঁজে বের করে এক ক্রু চিফ। তারপর এয়ার ফোর্সের এক জেনারেলের নির্দেশে বিমানটি মেরামত করে চালানোর উপযোগী করা হয়। কেন্টাকিতে গিয়ে প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করার জন্য আমাদেরকে এই বিমানটি দেয়ার কারণ খুবই সঙ্গত বলে মনে হলো তখন। অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী এই বিমানটি। আরো একটি ইতিহাসের অংশ হতে চলেছে।

বিমান থেকে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় স্পেশাল অপারেশন্স এভিয়েশন রেজিমেন্ট-এর হেডকোয়ার্টারে। প্রেসিডেন্ট ওবামা আমাদের সাথে মিটিং করার পর ১০১তম এয়ারবোর্ন ডিভিশনের কয়েক হাজার সেনার উপস্থিতিতে বক্তৃতা দেবেন বলে ঠিক করা হয়েছে।

আমাদেরকে তারা কনফারেন্স রুমে নিয়ে গেলো। ঘরের এককোণে টেবিলের উপর বিভিন্ন ধরণের মুখরোচক খাবার রাখা।

"আমাদেরকে তো দেখি অন্য একটা জগতে নিয়ে আসা হলো," বললাম আমি। "ঠাণ্ডা চিকেন ফ্রাইয়ের চেয়ে ভালো কিছু পাবো বলে মনে হচ্ছে। এসব খাবারের জন্যে আমাদেরকে আবার বিল দিতে হবে না তো?"

দরজার কাছে একটি টেবিলের উপর ফ্রেমে বন্দী জাতীয় পতাকা দেখতে পেলাম। আমরা এই পতাকাটা নিয়েই মিশনে গিয়েছিলাম। এটাতে আমাদের সবার সাইন সংগ্রহ করে প্রেসিডেন্টকে উপহার দেয়া হবে।

"আমাকে সাইন করতে হবে কেন?" টমকে বললাম।

"অভিযানে যারা অংশ নিয়েছিলো তাদের সবাইকে সাইন করতে হবে," বললেন তিনি

"কেন?" আমি কারণটা জানতে চাইলাম।

"এটা প্রেসিডেন্টকে উপহার দেয়া হবে, " আমার প্রশ্নবাণে বিরক্ত হয়ে বললেন টম।

"ঐ দেয়ালে ওটা ঝুলিয়ে রাখার আগে কতোজন লোকের হাত ঘুরে এসেছে?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে। "হোয়াইট হাউস থেকে কি ঘুরিয়ে নিয়ে আসা হবে ওটা?"

অবশ্য আমাদের নামগুলো নাকি গোপন রাখা হবে।

আমি আমার দলের ছেলেদের সাথে যোগ দিলাম।

"সবাই কি ওটাতে সাইন করবে নাকি?"

ততোক্ষণে বেশিরভাগ ছেলেই সাইন করে ফেলেছে।

"আরে একটা কিছু হিজিবিজি সাইন করে দাও, যে কোনো নামে, বুঝলে? কোনো সমস্যা নেই," চার্লি বললো। "আমি তো সেটাই করেছি।" কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমাদের সবাইকে একটি সভাঘরে নিয়ে যাওয়া হয় প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করানোর জন্য।

সবাইকে সিক্রেট সার্ভিসের মেটাল ডিটেক্টর অতিক্রম করতে হয়েছিলো। আমি যখন ওটা পার হবো তখন বিপ করে উঠলো। আমার পকেট নাইফটা বের করে দিতে হলো ওদের কাছে।

সভাঘরে একটি ছোট্ট মঞ্চের সামনে সারি সারি চেয়ার বাসানো ছিলো। ওয়াল্ট বসলো আমার পাশে।

"এখানে বসে থাকার চেয়ে ট্রেনিংয়ে থাকাটাই বেশি ভালো ছিলো," সে বললো আমাকে।

কালো রঙের সুট আর হালকা নীল রঙের টাই পরে হাজির হলেন বারাক ওবামা। নীল শার্ট আর লাল রঙের টাই পরে তার পাশে ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। মঞ্চে দাঁড়ি কয়েক মিনিট বক্তৃতা করলেন প্রেসিডেন্ট। অভিযানের সফলতার জন্যে তিনি আমাদের ইউনিটকে প্রেসিডেন্সিয়াল ইউনিট সিটেশন প্রদান করলেন। কোনো ইউনিটকে দেয়া এটা হলো সর্বোচ্চ সম্মান।

তার বক্তৃতার খুব বেশি কিছু আমার মনে নেই। ওটা ছিলো বক্তৃতা লেখকদের তৈরি করা একটি আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।

"তোমরা আমেরিকার শ্রেষ্ঠ নাগরিক।"

"তোমাদের জন্যে আমেরিকা আজ গর্বিত।"

"আমেরিকান জনগণের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

"দারুণ কাজ করেছো।"

এরকম কিছু আর কি।

তার বক্তৃতা শেষ হলে আমরা কিছু ছবি তুললাম। জো বাইডেন এ সময় কিছু জোক করলেন, কিন্তু আমাদের কেউই সেটা পুরোপুরি বুঝতে পারলো না। মনে হয় লোক হিসেবে তিনি খুবই ভালো কিন্তু তাকে দেখে আমার মনে হয়েছিলো তিনি যেনো ক্রিসমাসের ডিনারের সময় বন্ধুবান্ধবদের মাতাল হয়ে যাওয়া কোনো আঙ্কেল। আনুষ্ঠানিকতা শেষে ওবামা আমাদেরকে তার রেসিডেন্টে এসে বিয়ার খাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন।

"ওনার রেসিডেন্ট মানে?" জানতে চাইলাম আমি।

"জানি না," ওয়াল্ট বললো। "মনে হয় হোয়াইট হাউসের কথা বলছেন।"

"দারুণ ব্যাপার হবে তো," বললাম তাকে। "তার রেসিডেন্টে যেতে পারলে আমি অবশ্য মনে কিছু করবো না।" বাঁকা হাসি হালো ওয়াল্ট।

আমাদেরকে বাসে করে যখন এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো তখন প্রেসিডেন্ট ওবামা

হ্যাঙ্গারের ভেতর কয়েক হাজার সৈনিকের উপস্থিতিতে বক্তৃতা করছিলেন।

"শেষ পর্যন্ত "আমরা তাদের মাথা কেটে ফেলেছি," আমরা তাদেরকে পরাজিত করবোই...অবশেষে ওসামা বিন লাদেনকে তার প্রাপ্য শাস্তি দেয়া হয়েছে।"

ঐ ট্রিপের পর থেকে সব কিছু আবার স্বাভাবিক হতে শুরু করে। আমরা আমাদের নিত্যদিনের রুটিনে ফিরে যাই। কয়েক সপ্তাহের জন্যে যার যার বাড়িতেও ছুটি কাটিয়ে আসি। তারপর আবার সেই আগের মতো সবকিছু।

হোয়াইট হাউসে বিয়ার খাওয়ার জন্যে আমাদেরকে কখনই ডাকা হয় নি। আমার মনে আছে কয়েক মাস পর ওয়াল্টের কাছে প্রসঙ্গটা তুলেছিলাম।

"বন্ধু, তুমি বিয়ার খাওয়ার নিমন্ত্রণের কথা কখনও শুনেছো?"

ওয়াল্ট আবারো বাঁকা হাসি হাসলো। "তুমি ওসব ফালতু কথাবার্তায় বিশ্বাস করে বসে আছো দেখছি," বললো সে। "আমি বাজি ধরে বলতে পারি তোমার মতো বোকাও পরিবর্তনের জন্যে ভোট দিয়েছিলে।"

বিন লাদেন মিশনের বছরখানেক পর আমি আমার কর্মজীবনের সমাপ্তি ঘটাই।

এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আমি আমার দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে কাজ করে গেছি। এই স্বপ্নটা বাঁচিয়ে রাখার জন্য সব কিছু ত্যাগ করেছিলাম আমি। পরিবার আর বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে দীর্ঘদিন দূরে দূরে ছিলাম। সর্বোচ্চ চেষ্ট করেছি আমেরিকাকে সেবা করার জন্য। যাদের সাথে কাজ করেছি তারা আমার আজীবনের বন্ধু হয়ে গেছে। তারা আমার আপন ভায়ের মতোই। একজন সিল হিসেবে ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর থেকেই এ রকম একটি মিশনের স্বপ্ন দেখেছিলাম। অবশেষে ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। এখন সময় এসেছে নতুনদের জন্যে জায়গা ছেড়ে দেয়ার।

আমি আমার দীর্ঘ সিল ক্যারিয়ারে কখনও নন-অপারেশনাল কাজ করি নি। একজন সিল হিসেবে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সত্যিকার অর্থে আমি কোনো ছুটি পাই নি। সব সময়ই মিশন থেকে মিশনে ঘুরেছি। আর ট্রেনিংয়ের ব্যাপারটা তো ছিলো আমাদের জন্য নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এ বছরের শুরুতে টিম লিডার হিসেবে আমি আমার মেয়াদ পূর্ণ করি। আমাকে আমার স্কোয়াড্রন ছেড়ে হয় গ্রীন টিমের একজন ইন্সট্রাক্টর, নয়তো কামান্ডের অধীনে নন-অপারেশনাল কোনো কাজ বেছে নিতে হতো। এইসব কাজ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহু দূরে বসে করা হয়। বলতে কি, দীর্ঘ কমব্যাট জীবনে এরকম একটি পদ আমার দরকারও ছিলো। এটা হতো আমর জন্যে একটু ফুরসত পাওয়া। কিন্তু আমি জানতাম অল্প কিছুদিন পরেই আমার মধ্যে একটা খচখচানির সৃষ্টি হতো যুদ্ধের ময়দানে ফিরে যাওয়ার জন্য। কমান্ডের অন্য সবার মতো বিরামহীন ডিপ্লয়মেন্টের কারণে, আমার ব্যক্তিগত জীবনে অনেক মূল্য চোকাতে হয়েছে। সময় এসেছে নিজের জীবনটাকে প্রাধান্য দেয়ার। কমান্ড ছেড়ে দিতে যতোই খারাপ লাগুক সত্যি হলো, আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমার সিল ক্যারিয়ার সমাপ্ত করার সময় চলে এসেছে।

চলে আসার আগে আমি আমার কমান্ডারের সাথে দেখা করি। বর্তমানে তিনি ডেভগ্রু'র ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার। আমি ভালো করেই জানতাম একজন শ্রদ্ধেয় কমান্ডিং অফিসার হিসেবে তিনি আমাদের মানসিক চাপের ব্যাপারটা বুঝবেন। কমান্ড থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে চলে আসার কয়েক দিন আগে তার অফিসে গিয়ে দেখা করি।

"তোমাকে এখানে রাখতে হলে আমাদেরকে কি করতে হবে বলো?" কমান্ডার বললেন।

উনি যে আমাকে রেখে দিতে চান সেটা জানার পর খুব সম্মানিত বোধ করলাম। কিন্তু আমি সরাসরি তার চোখের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলালাম। "অবসর নেবার সময় হয়ে গেছে," বলেছিলাম তাকে।

যদিও ভাই, বন্ধুদের ছেড়ে আসতে খুব খারাপ লাগছিলো, একটা অপরাধবোধে আক্রান্ত হচ্ছিলাম, তারপরও নিজের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমি ছিলাম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এটা আমাকে এক ধরণের প্রশান্তি দিচ্ছিলো। গ্রীন টিমে অনেক নতুন ছেলেপেলে ঢুকেছে, তারাই আগামী দিনে দেশের সেবা করার জন্য প্রস্তত। আমি বড্ড ক্লান্ড হয়ে পড়েছিলাম, অন্য কিছু করতে চাইছিলাম। ওয়াল্ট, চার্লি, স্টিভ আর টমদের মতো বন্ধুদের ছেড়ে আসাটা মোটেও সহজ কাজ ছিলো না। আমরা এখনও আগের মতোই বন্ধু আছি, আর তারা এখনও কমান্ডে বহাল তবিয়তে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের নিরাপত্তার স্বার্থেই আমি বলবো না, এ মুহূর্তে তারা কোনো পদে কি কাজ করছে। এ দেশের মঙ্গলের জন্যে তারা এখনও নিজেদের জীবন আর মূল্যবান সময় বিকিয়ে দিচ্ছে অকাতরে।

ফিল তার পায়ে গুলি লাগার পর দ্রুত সেরে ওঠে। আগের মতোই সে ঠাট্টা-তামাশা করে বেড়ায়। আমাদের মধ্যে এখনো ভালো বন্ধুত্ব অটুট আছে। তবে আমার মতো সেও নেভি থেকে অবসর নিয়েছে।

সিল থেকে অবসর নেবার পর প্রথম যে কাজটি করেছি সেটা হলো এই বইটি লেখা। এরকম একটি কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়াটা খুব একটা সহজ ছিলো না। কমান্ডের কেউ বিন লাদেনের বাড়িতে অভিযানের ব্যাপারটা নিয়ে উচ্চবাচ্য করতে চায় না। প্রথম প্রথম আমরা এটাকে খুবই চমকপ্রদ ব্যাপার বলে মনে করতাম কিন্তু খুব দ্রুতই বুঝতে পেরেছিলাম এ সংক্রান্ত যতো তথ্য প্রকাশ পাবে আমাদের জন্যে ততোই বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। আমরা সব সময়ই আড়ালে কাজ করতে অভ্যস্ত। আমাদের পেশাটাই এমন। কিন্তু বিন লাদেনের বাড়িতে অভিযান নিয়ে যতো খবর প্রচারিত হয়েছে ততোই মনে হয়েছে সত্যিকারের ঘটনাটি সবার জানা উচিত। যা ঘটেছে তা যেনো ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকে।

আজ পর্যন্ত বিন লাদেনের নিধন নিয়ে যতো রিপোর্ট বের হয়েছে তার সবটাই ভুল। এমন কি যেসব রিপোর্ট দাবি করে তারা ইনসাইড স্টোরি দিতে পেরেছে সেগুলোও অসত্য। আমার কাছে মনে হয়েছে কারোর না কারোর সত্য গল্পটা বলা উচিত। আমার কাছে মনে হয়েছে গল্পটা ঐ অভিযানের চেয়েও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। কমান্ডে যেসব সেনা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই কাজটা করতে রাজি হয়েছিলো তাদের বিষয়টা যেনো অপাংক্তেয়। যেনো তারা একেবারেই গৌণ, নাটকের কোনো পার্শ্বচরিত্র। আসল গল্পটা বলার দাবি রাখে, আর যতোটা সম্ভব নির্ভুলভাবে।

২০১১ সালের মে মাসের পর প্রেসিডেন্ট ওবামা থেকে শুরু করে অ্যাডমিরাল ম্যাকর্যাভেন পর্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের লোকজন এই অভিযানের ব্যাপারে অনেক ইন্টারভিউ দিয়েছেন। আমার কমান্ডার .. ইন চিফ যদি নিঃসংকোচে এ বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারেন, তাহলে আমিও সেটা করতে পারি।

অবশ্য এটাও সত্য, আমাদের দেশে দুটো রাজনৈতিক দল হোয়াইট হাউসের গদি দখলের লড়াইয়ে এই অপারেশনটাকে ব্যবহার করে আসছে। অভিযানটি চব্বিশজন লোকের হেলিকপ্টারে করে রাতের অন্ধকারে নিছক কোনো হামলা চালানোর ব্যাপার ছিলো না। রাজনীতি হলো ওয়াশিংটন ডিসি'র জন্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যারা, তাদের জন্য। তারা অভিযানের ঘটনাস্থল থেকে হাজার মাইল দূরে, নিরাপদে বসে থেকে ভিডিও'তে দেখে।

জালালাবাদ থেকে যখন আমরা হেলিকপ্টারের উঠি তখন আমাদের মাথায় রাজনীতির কোনো চিন্তা ছিলো না। আমাকে ভুল বুঝবেন না। মনে করবেন না আমরা রাজনীতি বিমুখ অসচেতন লোকজন। আমরা ভালো করেই জানতাম এরকমটিই হবে। অভিযানের অর্ডারটা কে দিয়েছিলো? ডেমোক্র্যাটরা? নাকি রিপাবলিকানরা? তাতে কিছু আসে যায় না। আমি নিজে কোন দলকে ভোট দেবো তাতেও কিছু যায় আসে না।

আমাকে পরিস্কার করে একটা কথা বলতে দিন, এটাকে আমি একান্ত নিজের গল্প বলেও মনে করি না। শুরু থেকেই আমার একটা উদ্দেশ্য ছিলো, এই অভিযানের ব্যাপারে সত্যিকারের গল্পটা জানানো, সিল'রা যে আত্মত্যাগ করেছে সেটা বলা। আমি নিজের কথায় এটা বলেছি তার কারণ আমি এসবের অংশ ছিলাম। আমার দৃষ্টিতে পুরো ঘটনাটি বর্ণনা করার মধ্যে আর কোনো কারণ নেই। আমি বিশেষ কেউ নই। অসাধারণ তো নই-ই। আমার একটাই আশা, আমার অভিজ্ঞতাগুলো যেনো আমার টিমের বাকি সবার অভিজ্ঞতা হিসেবেই দেখা হয়। যেসব লোকজনের সাথে আমি কাজ করেছি, যাদের সংস্পর্শে এসেছি, যাদের দিক নির্দেশনা পেয়ে কাজ করেছি তারা সবাই এ বিশ্বের সেরাদেরও সেরা। এ দেশের জন্য তারা যা করেছে সেটা আর কারোর সাথেই তুলনীয় হতে পারে না।

যেসব সিল আর কোনোদিন বাড়ি ফিরে যেতে পারে নি, তাদের আত্মত্যাগ বৃথা যেতে পারে না। তাদের কেউ ইরাক কিংবা আফগানিস্তানে প্রাণ হারিয়েছে, কিংবা চিরকালের জন্য নিখোঁজ হয়ে গেছে। অনেকেই মারা গেছে ট্রেনিং করতে গিয়ে। তাদের সবার প্রতি আমি সশ্রদ্ধ সম্মান জানাচ্ছি। আমাদের হৃদয়ে চিরজাগরুক থাকবে তারা। জীবনের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও এরা দেশের জন্যে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছে।

আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, এই বইটি যারা পড়বেন তারা কেউই এদের চেয়ে বেশি

আত্মত্যাগ করেন নি। আমাকে একটা প্রশ্ন করা হয় “আমি তো একজন সিল নই, চেষ্টা করলেও আমি ওদের মতো কিছু করতে পারবো না, তাহলে আমি কিভাবে সাহায্য করবো?”

আমার মনে দুটো জবাব উঁকি দেয়।

শুধু শুধু বেঁচে থাকবেন না, বেঁচে থাকুন নিজের চেয়েও বড় কোনো উদ্দেশ্যের জন্য। পরিবার, সমাজ আর দেশের জন্য একটি সম্পদ হয়ে উঠুন।

দ্বিতীয় জবাবটি হলো, আপনি আপনার সময় এবং অর্থ এসব সেনাসংস্থায় কিংবা যুদ্ধাহত সেনাদের কল্যাণে দান করতে পারেন। এইসব নারী-পুরুষেরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছে, এখন তাদের দরকার আপনাদের সাহায্য আর সহযোগীতা।

এই বই থেকে যা আয় হবে তার বেশিরভাগই দান করা হবে। যেসব সংস্থায় দান করা হবে তাদের তালিকা দেয়া হলো :

All In All The Time Foundation (Allinallthetime.org)
The Navy SEAL Foundation (Navysealfoundation.org)
Tip of the Spear Foundation (Tipofthespearfoundation.org)
All three charities help support the families of fallen Navy SEALS. I challenge you to do a fraction of what these men have sacrificed and help me raise millions of dollars for these organizations.

এছাড়াও ২০০১ সালে ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনায় যারা নিহত হয়েছেন তাদের সম্মানেও এর একটি অংশ দান করা হবে।

My primary weapons: a Heckler & Koch MP7 with suppressor (top); a highly modified M79 40mm grenade launcher, a.k.a the “pirate gun ” (middle); and a Heckler & Koch 416 assault rifle with a ten inch barrel and

suppressor (bottom)

My assault kit organized during an Afghanistan deployment. Visible are my pistols, assault rifles, helmet with NVGs, and my sixty-pound (27Kg) vest including ballistic plates.
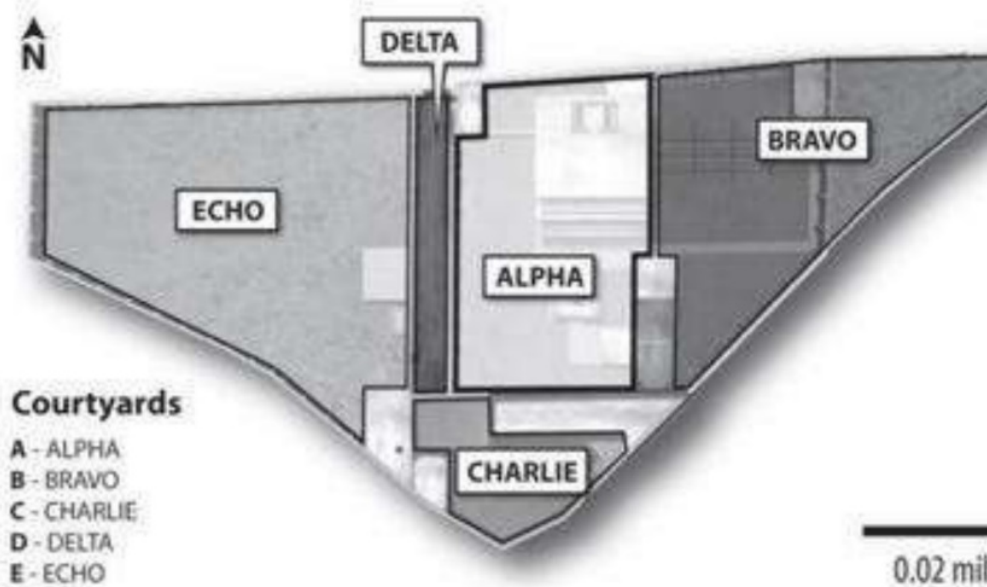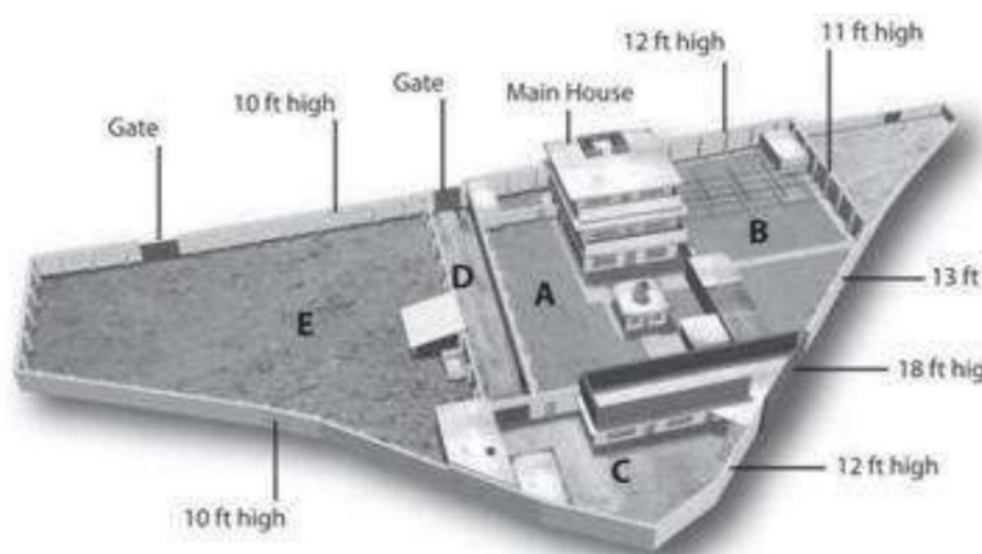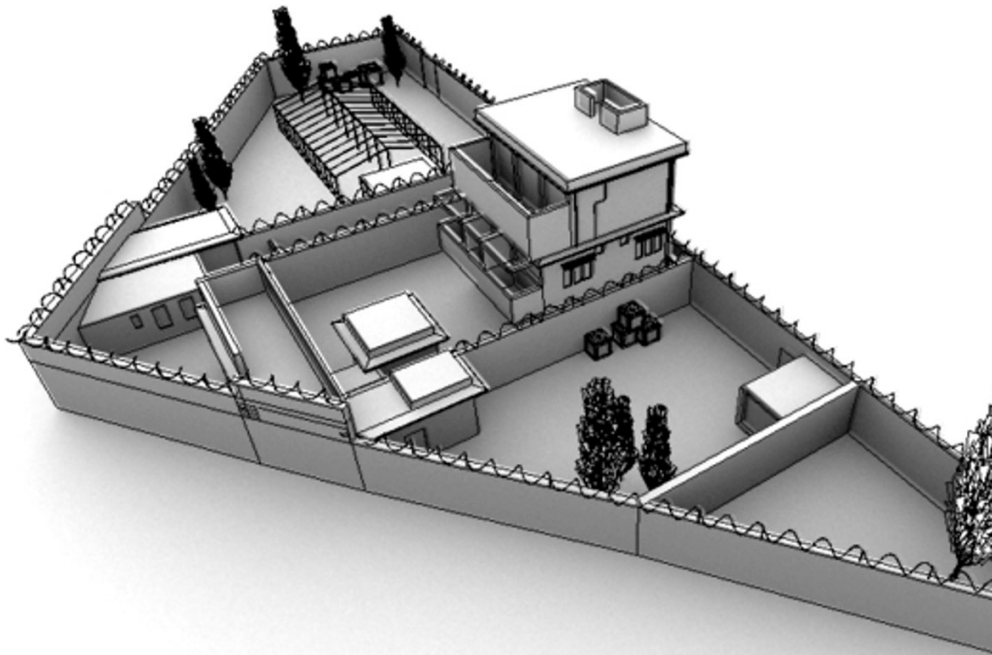
আবেটাবাদে বিন লাদেনের কম্পাউন্ড

Inside the Main House
Bathroom
Office
Office
Wife
Bathroom
Bin Laden
Wife
Bedroom
Balcony
THIRD LEVEL
Bin Laden was shot by the point man just as the SEALs reached the third-floor landing.
Khalid
SECOND LEVEL
The point man killed Khalid on the landing between the second and third floor, before leading the final team up to the third floor.
Media Center
Media Center
Media Center
stairwell gate breached
closed metal gate
Balcony
Kitchen
FIRST LEVEL
After breaching the North door, the SEALs climbed up the spiral staircase, clearing each floor along the way.
Abrar
Bushra
N
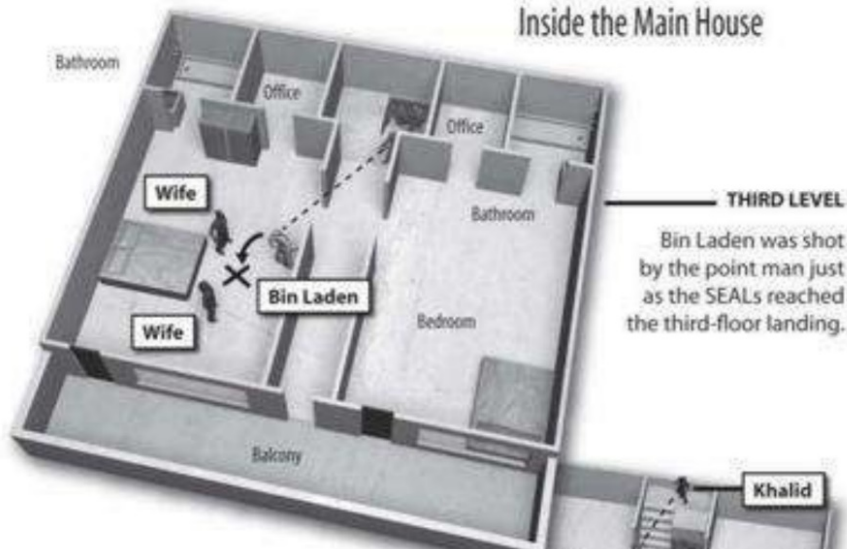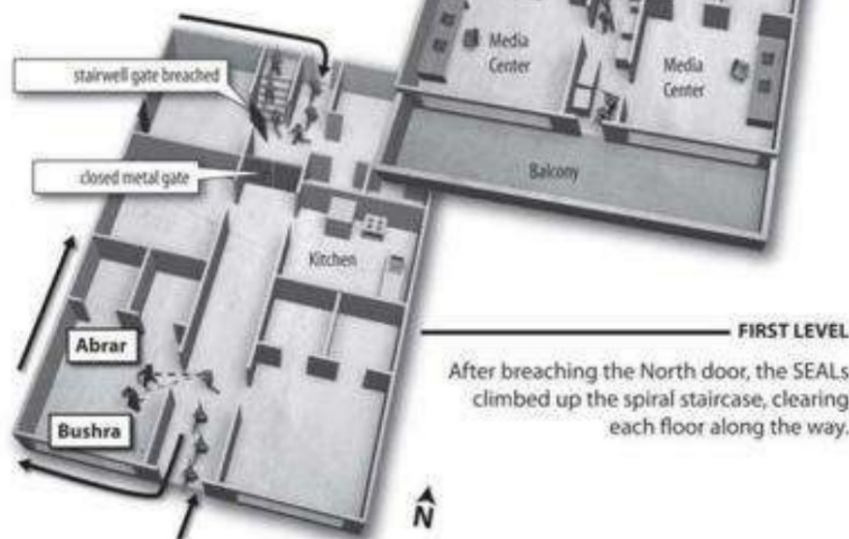
Operation Neptune Spear: Exfil

① The SEALs move Bin Laden's body out of the compound.

② Chalk One moves through the field and boards the Black Hawk helicopter.

③ With only seconds to spare the CH-47 was told to conduct an immediate go-around to the South to avoid flying debris from the explosive charges set on the downed Black Hawk.

④ Helicopter explodes.

⑤ Chalk Two and the downed Black Hawk helicopter crew board the CH-47 carrying the quick reaction force.
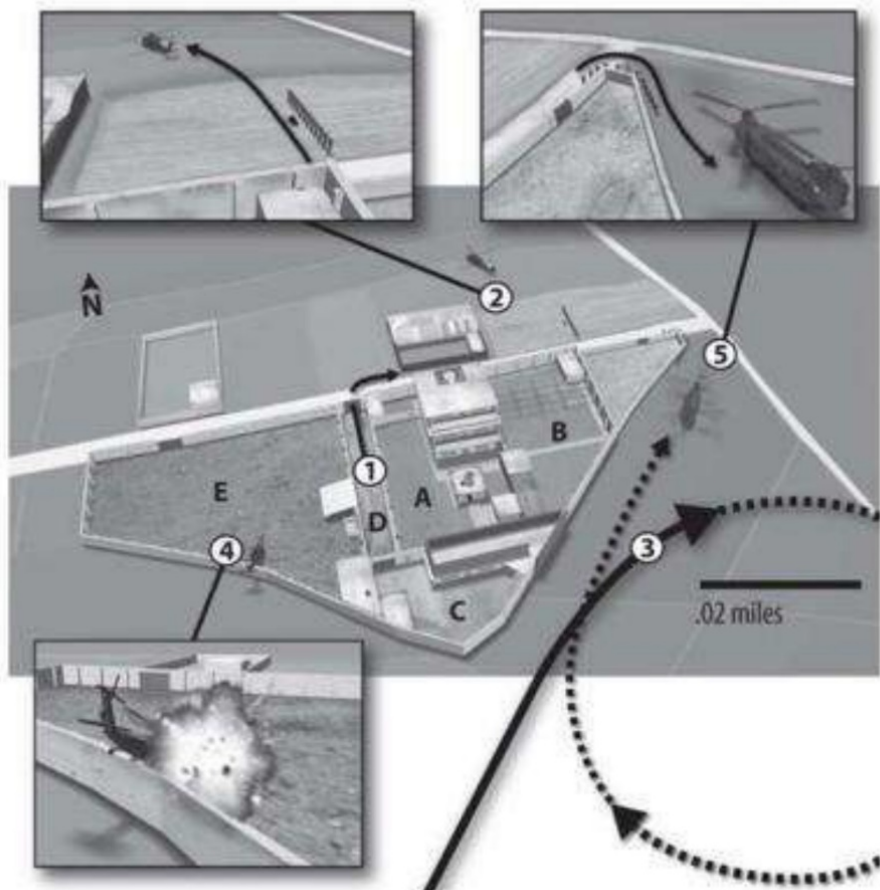
Operation Neptune Spear: Infil

① Chalk One attempted to hover over "A" courtyard but was unable to hold station and crash landed.

② Chalk Two landed and inserted the external security team consisting of four SEALs, an interpreter, and the combat assault dog.

③ The pilots flying Chalk One were able to crash the helicopter in "E" courtyard, west of the main house.

④ Chalk Two saw Chalk One crashing, and the pilot immediately made the safer decision of landing outside the gate instead of attempting the fast rope insert onto the top of the main building.
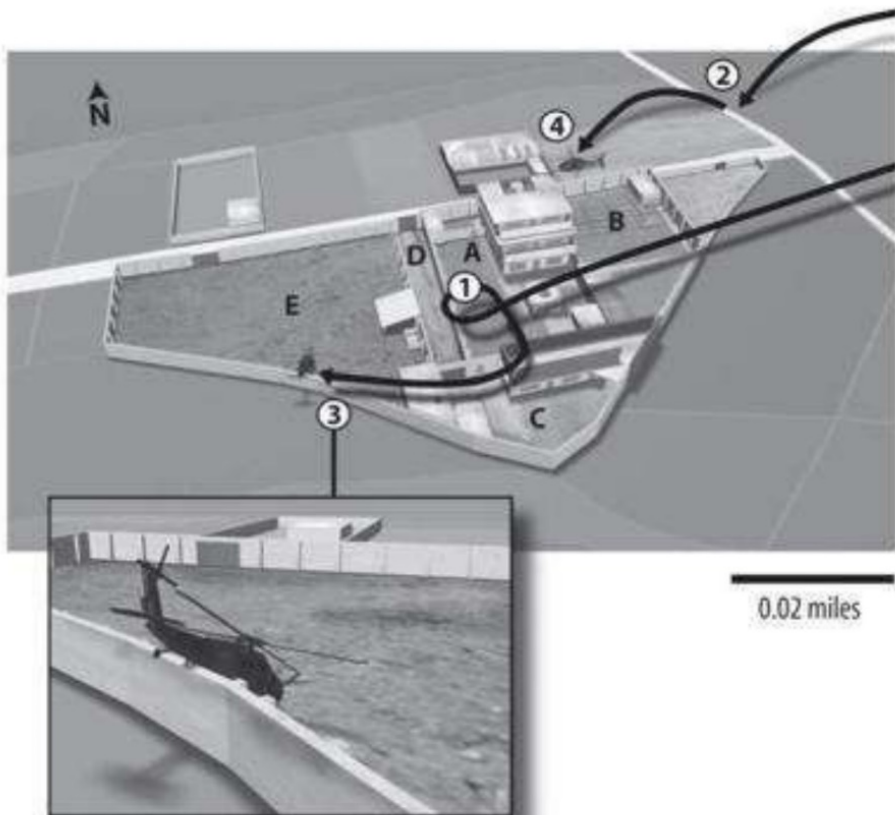
Operation Neptune Spear: Exfil

① One CH-47 picks up the SEALs at the compound and flies direclty back to Jalalabad.

② Black Hawk flies north, landing at the FARP (Forward Air Refueling Point) site.

③ Black Hawk and CH-47 fly directly back to Jalalabad.

④ C-130 flies assault element from Jalalabad to Bagram.